নায়কের বিবর্তন : বাংলা উপন্যাসে

ডঃ শ্যামল সেনগুপ্ত

পরিবেশক
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীমতী শ্যামলী ভট্টাচার্য, এম.এ.
সাহিত্য বিহার
১বি মহেন্দ্র শ্রীমানী স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রকাশ : ১৯৮৬

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই, বি. এস্-সি.
ভাস্কর প্রিন্টার্স
৮৩/বি বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

আমার শিক্ষাগুরু

শ্রীঅরুণকুমার বসু এম-এ, পি, আর-এস, পিএইচ-ডি

যাঁর সস্নেহ প্রযত্ন, সঠিক নির্দেশনা,

সহৃদয় সাহিত্যবোধ ও আন্তরিক

প্রীতি ছাড়া আমি এই পর্যায়ে

পৌঁছোতেই পারতাম না।

পূর্বমুখ

বাংলা উপন্যাসের বয়স প্রায় সোয়াশোয় পৌঁছে গেছে। এই কালসীমার মধ্যে বহু বাঙালী কথাসাহিত্যিক এই বিশেষ সাহিত্যধারাটির প্রতি আত্মনিয়োগ করে এর বিপুল বিস্তার ও বহুমুখী বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। ফলে, এটি বিশ্বসাহিত্যের পংক্তিভুক্ত হওয়ার মর্যাদা পেয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা, সাফল্য ও ব্যর্থতার বিচার-বিশ্লেষণে বাঙালী মনীষা কম কৃতিত্ব দেখাননি। বহু সুধী ও মনস্বী সমালোচক এই প্রসঙ্গে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে সেই বিপুল ও মনীষাদীপ্ত মূল্যায়নের পাশে আরো একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস সংযোজিত হলোমাত্র। বলা বাহুল্য, কোনো তথ্যের আবিষ্ক্রিয়া বা তত্ত্বের প্রতিপাদন এই গ্রন্থের উদ্দিষ্ট নয়। এতে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলা উপন্যাসের পুনর্বিচারের প্রয়াস করা হয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গীটি ইতঃপূর্বে অপরীক্ষিত বলেই কিছুটা অভিনব এবং গ্রন্থের স্বকীয়তা সেইটুকুই।

এই রচনাটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ-ডি উপাধির জন্য মনোনীত হয়েছে বলেই বিশ্বাস করতে ভালো লাগে যে, আলোচনাটি একেবারে নিরর্থক হয়নি। তবুও শ্রদ্ধেয় ও বিদগ্ধ পরীক্ষকরা আলোচনাটির দুটি-একটি অসম্পূর্ণতার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। এখানে সে সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছু সুযোগ পাওয়া গেল। এরিস্টটল ও জগদীশ গুপ্ত সম্পর্কে স্বল্প আলোচনা করেছি এজন্যই যে, এঁদের কথা এখানে এসেছে নিতান্ত প্রাসঙ্গিক ভাবে। এছাড়া, এরিস্টটল সম্পর্কিত প্রসঙ্গটি আমি প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক নিকলের আলোচনা থেকেই নিয়েছি, তাই স্বতন্ত্রভাবে এরিস্টটলের আলোচনা করিনি। অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, নিকলের যে বইটি আমি আলোচনায় গ্রহণ করেছি, স্বয়ং গ্রন্থকার সেটিকে অপ্রচলিত করে দিয়েছেন। তবে, যে বিশেষ অংশটির সাহায্য আমি নিয়েছি, তা নিকল বাতিল করেননি বলেই আমার বিশ্বাস, কেননা তাঁর মত বদলেছে বিশেষভাবেই আধুনিক নাটকপ্রসঙ্গে। তবে গ্রন্থের শেষ অধ্যায়টির অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পাঠকের সঙ্গে লেখকের মনেও যথেষ্ট সংশয় রয়ে গেল। আমি মনে করি, এটি একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থের বিষয় হতে পারে ; আমি এর একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এঁকেছি মাত্র।

এই গ্রন্থরচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করি আমার গবেষণা-নির্দেশক ডঃ ক্ষেত্রগুপ্তের কথা। আমার যথেচ্ছ রচনাকে তিনি যেভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর উদার সাহিত্যবোধই নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে। আমার

পরমপ্রিয় ও সাহিত্যরসিক সুধীদম্পতি শ্রী শচীন দাস ও শ্রীমতী কৃষ্ণা দাসকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, যাঁদের সক্রিয় সাহায্য ব্যতীত এটি লিখিত বা প্রকাশিত হতে পারতো না।

গ্রন্থপ্রকাশের নানামুখী কাজে আমি নানাজনের নিঃস্বার্থ সহায়তা পেয়ে ধন্য হয়েছি। তাঁদের মধ্যে আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রী ভোলানাথ সেনগুপ্ত, ভাই স্বপন সেনগুপ্ত, সাগর সেনগুপ্ত ও বোন কৃষ্ণা সেনগুপ্তের নাম প্রথমেই উল্লেখ করি। প্রুফ দেখার কাজে সাহায্য করেছেন সহকর্মী ডঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সমরেশ ঘোষ, ডঃ প্রজ্ঞা মৈত্র, ছাত্রী চৈতালি চক্রবর্তী, কেয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, পুতুল সরকার। বন্ধুবর ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, অধ্যাপক সন্তোষ চক্রবর্তী, অধ্যাপক মনোরঞ্জন আদক, অধ্যাপক সুশান্ত চক্রবর্তী, অগ্রজপ্রতিম শ্রী মানসরঞ্জন রায়চৌধুরী, শ্রী জ্যোতি দাসগুপ্ত, শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থ সম্পর্কে নিরন্তর কৌতূহল প্রকাশ করে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। আন্দুল প্রভু জগদ্বন্ধু-কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রী বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহকারী শ্রী সুভাষ খাঁড়া বইপত্রের ব্যাপারে আমার অশেষ জ্বালাতন হাসিমুখে সহ্য করেছেন। অধ্যাপক শ্রী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'দত্ত ব্রাদার্সের' ঝণ্টুবাবু প্রেসের কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন। দূরে থেকেও ডঃ পবিত্র সরকার আমাকে সর্বদা প্রেরণা দিয়েছেন। নির্ঘণ্ট প্রস্তুত ও প্রচ্ছদপট অঙ্কন করেছেন যথাক্রমে অধ্যাপিকা বীথিকা ঘোষ ও শ্রী অজয় গুপ্ত। এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক এতই ঘনিষ্ঠ যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এই সম্পর্ককে খাটো করতে চাই না।

পরিশেষে যে তিনজনের নাম করবো, তারা না হলে এ গ্রন্থ লিখিত কিংবা প্রকাশিত—কিছুই হতো না। এঁদের একজন আমার পরমবন্ধু ডঃ নির্মল দাশ, আমার মতো অলসকে দিয়ে যে এই কাজটুকু করিয়ে নিয়েছে। দ্বিতীয়জন আমার পরম স্নেহাস্পদা লিপিকা দত্ত (নচিকেতা)। রচনা থেকে প্রকাশের প্রতিটি পর্যায়ে যার সক্রিয় সাহায্য ছাড়া আমার মতো ক্ষীণদৃষ্টি মানুষের পক্ষে, কিছুই করা সম্ভব হতো না।

এছাড়া কৃতজ্ঞতা জানাই 'ভাস্কর প্রিণ্টার্সে'র কালিঝুলি মাখা অচেনা কর্মীদের, যাঁদের শ্রমে আমি সার্থক। আমার শিক্ষাগুরু শ্রীঅরুণকুমার বসুকে বইটি উৎসর্গ করতে পেরে গুরুকৃত্য করার আনন্দ অনুভব করছি। গ্রন্থটি সুধীমহলে পাঠযোগ্য বিবেচিত হলেই শ্রম সার্থক হবে।

শ্যামলকুমার সেনগুপ্ত

বিষয়সূচী

বিষয়-বিন্যাস

॥ ১ ॥

বাংলা উপন্যাসে নায়ক-চরিত্রের বিবর্তন—এই বিষয়টি একই সঙ্গে দুটি আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রথমত, বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারা-পথটির একটি সুস্পষ্ট পরিচয় গ্রহণ করা ও উপন্যাসে নায়ক-চরিত্রের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া। দ্বিতীয়ত, বাংলা উপন্যাসের ধারাপথটির এমনই একটি রূপরেখা নির্মাণ করে নেওয়া দরকার, যাতে যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় ঔপন্যাসিকদের পরিচয় নিলেই বাংলা উপন্যাসের বিবর্তন-ধারার পরিচয়টি স্পষ্ট ও বোধ্য হয়ে উঠতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। উনিশ শতকীয় জীবন-পরিবেশ, আধুনিক মনোভঙ্গি, গদ্যরীতির প্রসার প্রভৃতি বিবিধ কারণের সন্নিপাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে Novel বা উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছে। উপন্যাসের উদ্ভবতত্ত্বটি গবেষক ও ঐতিহাসিকদের নানা বিতর্কিত প্রশ্নে ও প্রসঙ্গে কণ্টকিত। প্রথম বাংলা উপন্যাস কোন্‌টি এ সম্পর্কে কোন সর্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে পারেনি, নতুন নতুন গ্রন্থের আবিষ্কার ও সম্পাদনা এই প্রশ্নকে আরও জটিল করে তুলেছে। এ তর্ককণ্টকিত প্রসঙ্গে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই, আমরা ইতিহাসের কোন তথ্যের আবিষ্কার বা পুনর্বিবেচনায়ও প্রবৃত্ত হতে চাই না। মোটামুটিভাবে স্বীকৃত প্রথম বাংলা উপন্যাস হিসাবে "আলালের ঘরের দুলাল" কেই আমরা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে সূচনা পর্বের গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব। মতিলালই তাই আমাদের আলোচনার প্রথম নায়ক, কেননা সমালোচকদের মতে নাটকে নায়কই 'expresses the aim and spirit',[১] লেখকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও অভিপ্রায় তার মাধ্যমেই চরিতার্থ হতে চেয়েছে।

মতিলাল থেকে যাত্রা সুরু করে অতঃপর আমরা প্রায় একশো বছরের বাংলা উপন্যাস-পরিক্রমায় প্রবৃত্ত হব। কিন্তু এই একশো বছরের বাংলা উপন্যাসে আত্মনিয়োজিত সমস্ত লেখকই আমাদের পরিক্রমার অন্তর্ভুক্ত হবেন না। এ কাজ বিশাল ও বিপুলভাবে তথ্যবহুল। আলোচনার সীমা ও আলোচকের ক্ষমতা উভয়কেই তা সুদূরভাবে অতিক্রম করে যেতে পারে। এই

সম্ভাবনার কথা মনে রেখেই এই বিরাট কালসীমার উপন্যাস-সৃষ্টিকে কয়েকজন প্রতিনিধিস্থানীয়ের সীমায় বেঁধে রাখতে সচেষ্ট হয়েছি। প্যারীচাঁদের যাত্রারম্ভের পর বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই উপন্যাসের যথার্থ শিল্পসৃষ্টি, নায়ক পরিকল্পনার পূর্ণতর রূপায়ণ এবং উপন্যাস ও মানবজীবনের ঘনিষ্ঠতর সংযোগ স্থাপনের মধ্যদিয়ে বাংলা উপন্যাস তার যথার্থ যাত্রাপথ ও লক্ষ্য সুনির্দিষ্টরূপে চিনে নিতে পেরেছে। বঙ্কিম-সমসাময়িক ও বঙ্কিম-অনুসারী বহু ঔপন্যাসিকই উপন্যাস রচনায় আত্মনিয়োগ করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, বিশেষতঃ রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিরা আপন স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল রূপেই আবির্ভূত হয়েছিলেন। তবুও যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত প্রতিভাবান পুরুষ, যুগন্ধর ক্ষমতার অধিকারী, নিরীক্ষা ও নির্ণয়ে সফল, এঁরা ঠিক ততখানি নয়। এই ঔপন্যাসিকদের বঙ্কিমী-কক্ষপথের উপগ্রহগুলীরূপেই বিবেচনা করা সঙ্গত। এঁদের সকলের আলোকই—বঙ্কিমী উৎস থেকে প্রজ্বলিত, এরা বঙ্কিমী আদর্শকেই গ্রহণ ও স্বীকার করে নিয়ে বঙ্কিমী-ভাববৃত্তের পরিধি-সীমাতেই পরিক্রমা করেছেন। তাই কেবলমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ধারাবাহিক বিবর্তনের পরিচয় গ্রহণকালেই গোটা বঙ্কিমী যুগেরই পরিচয় গ্রহণ করা হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমাদের গৃহীত দ্বিতীয় ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমী কক্ষপথে তাঁর পরিক্রমা সুরু হলেও অচিরেই তিনি আপন স্বতন্ত্র কক্ষপথ খুঁজে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। উপন্যাসের সমাজ-পরিবেশ, নায়ক-নিরীক্ষা, জীবনদৃষ্টি ও শিল্পশৈলীর ক্ষেত্রে তিনি বাংলা উপন্যাসের যাত্রাপথের বিবর্তন রেখাটিকে সঠিকভাবে ভবিষ্যৎমুখী করে দিতে পেরেছেন। সাহিত্যের সবশাখায় পারঙ্গম এই মহৎ প্রতিভাধর লেখক একাই একটি যুগের বিশালতা ও ব্যাপ্তি নিয়ে বাংলা সাহিত্যের এক সুবৃহৎ কালসীমায় অবস্থান করছেন। তাঁর দীর্ঘায়ত জীবৎকালেই বাংলা উপন্যাস তার পরিবর্তনের পথগুলির সন্ধান লাভ করেছে এবং প্রতিটি বাঁকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তিনি নেতৃত্ব ও পথনির্দেশ দিয়েছেন। উপন্যাসের বহির্বাস্তবতা থেকে তাকে তিনি অন্তর্বাস্তবতার জগতে নিয়ে গেছেন এবং ইতিহাসবিশ্রুত রাজকীয় ব্যক্তি বা জমিদার-বংশীয়দের নায়ক-পরিকল্পনার স্থানে মধ্যবিত্ত মানবমানবীকেই প্রধান কুশীলব হিসাবে নির্বাচন ও গ্রহণ করে নায়ক-পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক সুদূর-প্রসারী পথনির্দেশ করেছেন।

রবীন্দ্রযুগেই শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। তিনি রবীন্দ্র-নির্দেশিত পথে যাত্রা সুরু করে অল্পসময়ের মধ্যেই নিজস্ব পথটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তাঁর হাতে বাংলা উপন্যাস তার ইপ্সিত লক্ষ্যপথে ধাবমান হয়েছে। তার রচনায় জীবন-পরিবেশ, নায়কচেতনা ও বাস্তবতাবোধ একটি নতুনতর তাৎপর্য লাভ করে উপন্যাসকে রবীন্দ্রকক্ষপথ থেকে স্বতন্ত্র কক্ষপথে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সমকালে আরো কয়েকজন প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, বিশেষতঃ শরৎচন্দ্রের নিকটতম পূর্ববর্তী লেখক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কথাসাহিত্যে জনপ্রিয়তায় একটি কিংবদন্তী পুরুষ হয়েছিলেন। এ ছাড়া ছিলেন 'ভারতী' গোষ্ঠীর লেখকেরা; কিন্তু বাংলা উপন্যাসে তারা কেউই প্রতিভার স্বকীয়তায় বা সৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যে শরৎচন্দ্রের পাশে কোন পৃথক উপন্যাসাদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। একারণে এই পর্বের প্রতিনিধিপুরুষ হিসাবে শরৎচন্দ্রকেই আমরা নির্বাচিত করেছি এবং তার চিহ্নিত নায়কের মধ্যস্থতায় আমরা অনায়াসে পৌঁছে যেতে পেরেছি কাম্য গন্তব্যে। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রপথেই তার নায়কদের অতি সাধারণ গৃহস্থজীবন থেকে নির্বাচন করেছেন এবং শ্রেণী, বর্ণ ও অর্থের সবপ্রকার কৌলীন্য ঘুচিয়ে কেবলমাত্র মানুষকেই গ্রহণ করার অভিমুখিতা গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করেছেন।

রবীন্দ্রজীবনের অপরাহ্নকালে, শরৎপ্রতিভার মধ্যাহ্নসময়েই বাংলা সাহিত্যে এক বিক্ষুব্ধ জীবনাবেগ সাহিত্যের নবপথ অন্বেষণে ব্রতী হতে উদ্যোগী হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকের শেষে বিশ্বব্যাপী দ্রুত পরিবর্তনের পটভূমিকায় মানুষের ভাবজগতে একটা আনুপূর্বিক বিপর্যয় ও ভাঙ্গাগড়ার পালা সুরু হয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সাফল্য, নিপীড়িত মানুষের আত্মঘোষণার উদাত্ত উচ্চারণ, নানাধরণের বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া, ইয়োরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়, গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের অসম্পূর্ণতা, সমস্ত মিলিয়ে বাঙালী তরুণ ও বুদ্ধিজীবী মহলে এক অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। এই ভাবপরিবর্তন ও যুগচেতনার প্রতিনিধিত্ব করেছিল কতকগুলি সাহিত্য-পত্র। সবুজপত্র, বিচিত্রা, প্রবাসী, কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি প্রভৃতি নানান পত্র-পত্রিকায় এ যুগের মানসিকতা প্রকাশিত হ'লেও কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির মধ্যেই এই বিশেষ জীবন-চেতনা বিশিষ্টভাবে অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সময়টিকে কেউ 'কল্লোল যুগ', কেউ বা "কল্লোলের কাল" নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।[২] এই পর্বের বিশিষ্ট

মানসিকতার প্রতিনিধিস্থানীয় লেখক হিসাবে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমরা মনে করি যে, শরৎচন্দ্রের পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি ও বিশিষ্টতার স্বরূপলক্ষণ এই ত্রয়ী ঔপন্যাসিকের রচনাতেই সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। এই পর্বের সমাজচিন্তা, জীবনপরিবেশ, বাস্তবতাবোধ ও নায়ক-পরিকল্পনার মূল ভাবনাগুলি এঁদের রচনার প্রতিনিধিত্বেই গোটা যুগটিকে আভাসিত করতে সমর্থ হবে। এই যুগের অস্থিরতা ও আদর্শবোধ, জটিলতা ও উদার মুক্তিচেতনা, সমাজচিন্তা ও ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে অবগাহন—সব কিছুর পরিচয়ই এই তিন লেখকের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনার স্বাদগ্রহণে তৃপ্ত ও চরিতার্থ হতে পারবে।

৯ বাংলা উপন্যাস একটি জীবন্ত ও প্রবহমান সাহিত্যধারা। প্যারীচাঁদের হাতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা সুরু করে অদ্যাবধি তা প্রবাহিত হয়ে চলেছে আগামী ভবিষ্যতের পথে। এই নিরবধিকালের অনন্ত সৃষ্টিধারাকে তাই আমরা আমাদের আলোচনায় একটি নির্দিষ্ট কালসীমার মধ্যে সুনির্দিষ্ট করে নিতে প্রয়াসী হয়েছি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই আলোচনার সূচনাপূর্ব নির্দিষ্ট করে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের লগ্নে এসে আমাদের আলোচনার যাত্রা শেষ করেছি। এজন্যই আমরা শরৎপরবর্তী ঔপন্যাসিকদের সেই সমস্ত উপন্যাসকেই নির্বাচন করেছি, যাদের প্রকাশকাল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালে। আশ্বাসের কথা এই যে ত্রয়ী ঔপন্যাসিকের প্রতিনিধিস্থানীয় রচনা, যা তাদের নায়ক-পরিকল্পনা ও রূপায়ণের পক্ষে সার্থক, তা এই পর্বকালের মধ্যেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় তাই, প্যারীচাঁদ হয়ে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে ছাড়িয়ে ত্রয়ীর সৃষ্টিতে সীমিত থেকেছে।

॥ ২ ॥

আমরা আগেই দেখেছি যে, আখ্যানে নায়কের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব ও তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা আখ্যানে নায়কই 'expresses the aim and idea' অর্থাৎ লেখক তাঁর অন্বিষ্টকে খুঁজে পান নায়কের মধ্যস্থতায়। আখ্যানে নায়কই প্রধান, মনিয়েব উইলিয়ামস্‌এর অভিধানেও 'নায়ক' শব্দের এই অর্থই দেওয়া হয়েছে।[৩] এরিষ্টটল থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সাহিত্যের প্রতিটি বোদ্ধা ও সমালোচক নায়ক ও তার তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিয়ে বিস্তর

পর্যালোচনা করেছেন। প্রাচীনকালে প্রধানত মহাকাব্য ও নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গেই নায়কসম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। উপন্যাস আধুনিককালের সৃষ্টি, তাই তার নায়কসম্পর্কিত ভাবনাও এই প্রাচীন চিন্তার আলোকেই চিনে নিতে হবে। তাছাড়া, একালের কোন কোন বিশিষ্ট সমালোচকও আধুনিক উপন্যাসকে প্রাচীন মহাকাব্যের বংশধর হিসাবে দেখতে চেয়েছেন।[৪] তাঁদের মতে এককালে গোটা যুগ, সমাজ ও জাতীয় ভাবনার পটে মানুষের চিন্তাক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ যেমন করে মহাকাব্যের অবয়বে সংস্থাপিত হতো, একালে সীমিত ও ক্ষুদ্র পরিসর হলেও, উপন্যাসে তারই উপস্থাপনা করা হয়। তাই মহাকাব্যের নায়কের মতো উপন্যাসের নায়কও সমগ্র উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি, যার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রবর্তনা ব্যতীত ঘটনার গতি কিংবা অন্যান্য চরিত্রের বিকাশধারা একপদও অগ্রসর হতে অপারগ। বাস্তবের পটভূমিতে, পরিচিত জীবনপরিবেশে ঔপন্যাসিক যে উপন্যাস রচনা করেন, তার মধ্য দিয়ে জীবনের একটি বিশিষ্ট উত্তরণপর্বই তিনি রূপায়িত করেন, আর নায়ক চরিত্রই হয় এই উত্তরণকার্যে তাঁর প্রধান অবলম্বন। সমাজসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার নিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানবজীবনের সীমাবদ্ধ গণ্ডী থেকে উত্তরণ না ঘটাতে পারলে উপন্যাসসৃষ্টি নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। এই কারণে নায়ক-চরিত্র ঔপন্যাসিকের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অবলম্বন। নায়কের মাধ্যমেই তিনি একদিকে যেমন তাঁর জীবনবোধ ব্যক্ত করেন অন্যদিকে তেমনি নায়ক চরিত্রের রূপায়ণ-বৈশিষ্ট্যটাই তাঁর উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে থাকে। নায়ক যেখানে সক্রিয়, কর্মচঞ্চল ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণবন্ত সম্পর্কে সংযুক্ত, সেখানে সে গোটা ঘটনা-পরিধির নিয়ামক কেন্দ্রবিন্দু। এ ক্ষেত্রে গঠনরীতি দৃঢ়বদ্ধ, ঐক্যকেন্দ্রিক, পারিভাষিক অর্থে organic; আবার নায়ক যেখানে নিষ্ক্রিয়, ভাবনাবিলাসী, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শিথিল-সংযুক্ত, দ্রষ্টামাত্র, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই সে কাহিনীর কেন্দ্রীয়-পুরুষ হয়েও ঘটনাপরিধির সংহত কেন্দ্রবিন্দু নয়, আর তারই ফলে রচনার গঠনরীতিতেও ঐক্যের, দৃঢ়বদ্ধতার অভাব, পারিভাষিক অর্থে তার স্বভাব তখন loose.

উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তার রূপ ও রীতির বিবর্তন ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটটি তাই নায়কচরিত্রের বিবর্তন ও পরিবর্তনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে সম্পর্কিত। শুধু বাংলা উপন্যাসেই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সাহিত্যেও দেখা যায় যে, উপন্যাসের যাত্রারম্ভের সক্রিয় নায়ক কালের

পথে চলতে চলতে কখন নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে ও কেন্দ্রীয় নায়কের ঐক্যকেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনে নায়কের তথাকথিত মৃত্যু ঘটেছে, এবং উপন্যাস ক্রমশঃ গল্পরসের বৈচিত্র-সম্পাদন, সমাজতত্ত্বের জটিল জিজ্ঞাসা কিম্বা মনোবিকলনের গবেষণাগারে পরিণত হয়ে গেছে। 'Novel today are concerned with almost everything but human character···Human personality, however has disappeared from the contemporary novel, with it the "Hero".[৫] এর অতি স্বাভাবিক ফল হিসাবেই উপন্যাসের আঙ্গিকে দেখা দিয়েছে সুপ্রচুর বৈচিত্র্য। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসে গঠনরীতির যে দৃঢবদ্ধতা সহজাত কবচকুণ্ডলের মতোই অঙ্গীভূত ছিল, বিংশ শতাব্দীতে তাতে পরিবর্তন এসেছে। শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নয় কিংবা বৈচিত্র্য সম্পাদনের কারণেই নয়, উপন্যাসের অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্যে, ঔপন্যাসিকের নায়কচিন্তার আনুকূল্যেই উপন্যাসের গঠনরীতি বা আঙ্গিকে লক্ষণীয় পরিবর্তন সংসাধিত হয়েছে। তাই ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ ও উপন্যাসের আঙ্গিকরীতি, উভয়ের নির্বাচন, উপস্থাপন ও নির্ধারণের ক্ষেত্রে নায়ক-চরিত্র ভাবনা ও পরিকল্পনার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক। আমাদের আলোচনায় তাই চিন্তাভাবনা ও বিশ্লেষণের কেন্দ্রবিন্দু এই নায়ক চরিত্র। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র মতিলাল থেকে আমাদের বীক্ষণপর্বের সূচনা। আর তারাশঙ্করের 'ধাত্রীদেবতা'র শিবনাথে পৌছে তার সমাপ্তি। মধ্যপথে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তার বিস্তৃত ও বিচিত্র পথপরিক্রমা।

উৎস-নির্দেশ

১। A Nicoll—The Theory of Drama.

২। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—কল্লোলযুগ। জীবেন্দ্রসিংহ রায়—কল্লোলের কাল।

৩। নায়ক—'A guide, leader, chief, lord, principal, the lover or hero, The central gem in a necklace, etc'

৪। Ian Watt—The Rise of the Novel (The Epic Theory of Novel.)

৫। Ralph Fox—The Novel and the People

প্যারীচাঁদ মিত্রঃ আলালের ঘরের দুলাল

॥ ১ ॥

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে "টেকচাঁদ ঠাকুর" ছদ্মনামে প্যারীচাঁদ মিত্রের—'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সূচনায় বাংলা ও ইংরাজীতে লেখক যে ভূমিকা সংযোজন করেছেন তাতে গ্রন্থটিকে উপন্যাস এবং প্রথম বাংলা উপন্যাসরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। বাংলা ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—

"অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময়ক্ষেপন করিতে রত নহে সে স্থলে উক্তপ্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক। এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি রচিত হইল।"[১]

ইংরাজী ভূমিকা Preface এ লেখক জানিয়েছেন :—

"The above original Novel in Bengali being the first work of the kind is now submitted to the public with considerable diffidence"।[২]

স্বয়ং লেখক গ্রন্থটিকে বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাস হিসাবে অভিহিত করেছেন। শুধু লেখক নিজেই নন, সমসাময়িক অনেক সমালোচক ও রসিক বোদ্ধাই গ্রন্থটিকে বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে Bengali literature প্রবন্ধে বলেছেন,—

"His (Pyarichand Mitra) best work is the 'Alaler ghare-Dulal which may be the first novel in the Bengali Language"

শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন—

"আলালের ঘরের দুলাল" একখানি উপন্যাস, কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার প্রণীত 'বিজয় বসন্ত' ও টেকচাঁদ ঠাকুরের—'আলালের ঘরের দুলাল' বাংলার প্রথম উপন্যাস।"

গ্রন্থকারের নিজস্ব দাবী ও সমকালীন দুই বিদগ্ধ সমালোচকের মতানুসারে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' কেই বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। এ সম্পর্কে নিঃসংশয় হতে গেলে দুটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনার দরকার। প্রথমতঃ বাংলা উপন্যাসের উদ্ভবতত্ত্ব বিশ্লেষণ ও দ্বিতীয়তঃ সমকালে রচিত ও উপন্যাসপদবাচ্য অন্যান্য রচনাগুলির সঙ্গে তুলনায় 'আলালের' উপন্যাসত্ব প্রতিষ্ঠিত করা।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে নীলমণি বসাক "Arabian Night Tales' এর বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে কথাসাহিত্যের নামান্তর হিসাবে 'উপন্যাস' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন 'আরব্য উপন্যাস' নামকরণের মাধ্যমে, পরে তিনি 'Persian Tales'-এর বাংলা করেন 'পারস্য উপন্যাস'। পরে প্যারীচাঁদ Novel অর্থে 'উপন্যাস' শব্দটি তাঁর 'আলালের' ভূমিকায় ব্যবহার করেন। এই 'নভেল' বা উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে ঐতিহাসিকের অভিমত এই রকম,—

> 'Novel' অর্থাৎ উপন্যাসের আবির্ভাব সাহিত্যের ইতিহাসে আধুনিক ঘটনা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সভ্য মানুষের মন জীবন সম্বন্ধে কৌতূহলী হইয়া না ওঠে, ততদিন উপন্যাসের সম্ভাবনা থাকে না। পাশ্চাত্য দেশে যখন ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি জাগ্রত হইল—অর্থাৎ মানুষ আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাস ছাড়িয়া ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরায় অথবা প্রত্যক্ষ ও আন্বীক্ষিক জ্ঞানে লব্ধ আধিলৌকিক কার্যকারণের উপর আস্থাবান হইল—তখনই জগৎ ও জীবনের সম্পর্কে তাহার কৌতূহলের উদ্ভব হইল। তদনুযায়ী সাহিত্যসৃষ্টিও নূতন রূপ লইল নভেলে। দেবদেবী যক্ষরক্ষ রাজারানী ছাড়িয়া সাধারণ মানুষের প্রতিদিনের জীবনের বর্ণহীন কাহিনীতে উৎসাহ জন্মিল, 'টাইপ' বা অতিব্যক্তিত্ব এবং 'হীরো' বা অতিমানবের স্থান লইল সাধারণ লোক, যে লোক বিশেষ কোন সংস্কারের অথবা শ্রেণীর মুখপাত্র নয়, সে নিজেরই প্রতিনিধি।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে ইংরেজ সংস্পর্শে এসে বাঙালীর মনোজগতে যে নতুন ভাবোদয় হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা বিপুলভাবে আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠলো ; তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরে কোন 'নভেল' বা উপন্যাস বাংলায় রচিত হতে পারেনি। এর কারণ হিসাবে সাহিত্যের ঐতিহাসিক বলেছেন,—

> উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি না হইবার কারণ প্রধানত তিনটি—(১) গদ্যরীতি তখনও পরিণত রসবাহী রূপ পায় নাই, (২) ইংরাজী নভেলের সঙ্গে পরিচয় তখনও গাঢ় হয় নাই এবং (৩) পূর্বরাগ অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে অনূঢ়ার প্রেম এবং অনুরাগ অর্থাৎ বিবাহিতা (বিধবা) যুবতীর প্রেম তখনও সমাজ-চেতনায় ধাতস্থ হয় নাই। বিবাহিতার প্রেম সম্ভব হইল বিধবা বিবাহ আইন পাশ হইবার পর হইতে"।[৪]

বাস্তবজীবন ও জীবনপরিবেশ সম্পর্কে জাগ্রত কৌতূহল, জীবনের তুচ্ছতম বাস্তবতাকেও প্রকাশ করার উপযোগী গদ্য নির্মাণ, ইংরাজী নভেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অতিনিরূপিত সম্পর্কের বাইরে নরনারীর স্বাধীন প্রেমাকাঙ্ক্ষার অকপট প্রকাশ, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অনুকূল এই লক্ষণগুলি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই স্পষ্টতর রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থে এর শেষেরটি ছাড়া আর সব কটি প্রবণতাই স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বাস্তব জীবন ও জীবন-পরিবেশ সম্পর্কে প্যারীচাঁদ যে কতখানি সমুৎসুক ছিলেন, তার পরিচয়স্বরূপ ভূমিকায় বলেছেন,—

> "It (Alal) chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up with remarks on the existing system of education, on self formation and religious culture and is illustrative of the condition of Hindu Society, manners, customs and partly of the state of things of moffussils".

এর গদ্যভাষাও উপন্যাসোপযোগী সর্বভারবহন ক্ষমতার অধিকারী। প্যারীচাঁদ সে সম্পর্কে বলেছেন,—

> "The work has been written in a simple style······
> and acquaintance with Hindu domestic life······"

তাছাড়া এটিকে তিনি প্রথম Bengali Noval বলে দাবী করায় পরোক্ষভাবে ইংরেজি নভেলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের চিহ্নই আভাসিত হয়েছে। শুধুমাত্র নরনারীর স্বাধীন প্রণয়বৃত্তির প্রসঙ্গই এতে অনুপস্থিত। এটি নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির একটি অসম্পূর্ণতা ; কিন্তু তবুও মনে রাখা দরকার, যে বিশেষ জীবনবোধ ও সমাজচেতনার প্রেরণায় এটি রচিত, তাতে নরনারীর প্রণয়-ঘটনার অবকাশ একেবারেই নেই। তাই এই অসম্পূর্ণতাকে ত্রুটি হিসাবে গ্রহণ না করাই সঙ্গত হবে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিকরূপে আবির্ভাবের পূর্বকালে "আলালের" মধ্যেই বাংলা উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন সন্ধানকরা অযৌক্তিক হবে না। যদিও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী'কেই প্রথম শিল্পসার্থক বাংলা উপন্যাসরূপে সকলেই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন, তবুও আলালের মধ্যে তার প্রথম আত্মপ্রকাশকে স্বীকার করে নেওয়ায় কোনো বাধা নেই বলেই আমাদের মনে হয়।

স্বয়ং লেখক, বঙ্কিমচন্দ্র, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীদের সাক্ষ্যে প্রথম উপন্যাস

হিসাবে 'আলালে'র ভূমিকা স্বীকৃত হলেও সমসাময়িক অন্যান্য উপন্যাসপদবাচ্য রচনার প্রতিতুলনায় তার বিশিষ্টতাটিও নিরূপণ করে নেওয়া আবশ্যক। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস', হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়-বসন্ত', মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'—এই গ্রন্থগুলি সম্পর্কে অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করেছেন এবং এদের কোন একটার অস্তিত্বের সূত্রে প্রথম উপন্যাস হিসাবে "আলালের" দাবিকে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছেন।

ভবানীচরণের "নববাবুবিলাসে" ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তি আখ্যান রচনার পথপ্রদর্শক হলেও, এটিকে নভেল বা উপন্যাসের মর্যাদা দেওয়া যায়না। সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা ও সমালোচকরা এটির মধ্যে ইয়ং বেঙ্গল ও ওল্ড বেঙ্গলদের যথার্থ চিত্র দেখেছেন, কিংবা রচনাটিকে highly satirical বলে অভিহিত করেছেন কিন্তু নভেলরূপে কেউই অভিহিত করেননি। ১৮৮০ শকের চৈত্র সংখ্যা "বিবিধার্থসংগ্রহের" নূতন গ্রন্থের সমালোচনা বিভাগে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'আলালের' আলোচনায় ভবানীচরণের রচনাবলীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন,—

> 'স্যাটায়ার ধর্মী এই সমস্ত রচনা নীতিশিক্ষা এবং সামাজিক চৈতন্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে লিখিত বলিয়া গল্প বা উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করিতে পারে নাই; উপন্যাস বা গল্পের কাঠামোতে রচিত হইলেও এগুলি সূত্রাকারে গ্রন্থিত বিচ্ছিন্ন চিত্রমাত্র। "আলালের ঘরের দুলাল" মূলতঃ এই সকল রচনার পর্যায়ে পড়িলেও ইহাতে যথার্থ উপন্যাসের ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ "আলালের ঘরের দুলাল'ই বাংলাভাষায় সর্ব্বপ্রথম সামাজিক উপন্যাস"।

রাজেন্দ্রলালের সাক্ষ্যেই 'নববাবুবিলাসের' দাবী সহজে অগ্রাহ্য হয়ে যায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী বাংলাভাষার প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'আলালের' সঙ্গে হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়-বসন্তে'র নাম উল্লেখ করেছেন, অতএব 'বিজয় বসন্তে'র উপন্যাসত্বও বিবেচনা করে দেখা দরকার। এ সম্পর্কে লেখকের ভূমিকার বক্তব্য উদ্ধার করলেই আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হবে বলে মনে করি। ভূমিকায় লেখক বলেছেন,—

> "বালকগণ পদার্থ বিদ্যা ভূগোলাদি সর্বদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। এজন্য Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন, চাহার-দরবেশ

প্রভৃতি যে সমুদায় ব্যাপক ইতিহাস প্রচলিত আছে, সে সমুদায়ই অশ্লীলভাষা ও ভাবে পরিপূর্ণ।...এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি 'বিজয়-বসন্ত' নামে এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই।"

বালকগণের ক্লান্তি অপনোদনের উদ্দেশ্যে প্রণীত এই গ্রন্থখানিতে লেখক Novel শব্দটি ব্যবহার করলেও তার স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে যে অবহিত ছিলেন না, তা বলাই বাহুল্য। এ ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমী-প্রতিভার কথা বলতে গিয়ে 'বিজয়বসন্ত' 'গোলে-বকাওলির' যুগ থেকে উত্তরণের যে কথা বলেছিলেন, তাতেও গ্রন্থটির স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। এটিকে তাই কোনমতেই উপন্যাসপদবাচ্য করা যায় না।

হান্না ক্যাথারীন মুলেন্সের 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' গ্রন্থের নামপত্রে ইংরাজী ও বাংলায় রচনাটি সম্পর্কে যথাক্রমে বলা হয়েছে —

(ক) The History of Phulmani and Karuna A Book for native christian women.

(খ) ফুলমণি ও করুণার বিবরণ, স্ত্রীলোকদের শিক্ষার্থে বিরচিত।

সমসাময়িক J. Long-এর মতে গল্পচ্ছলে খ্রীষ্টধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব বর্ণনার উদ্দেশ্যেই এটি রচিত হয়েছিল। গ্রন্থের প্রকাশকও এটিকে একটি বহুপঠিত খ্রীষ্টবিষয়ক গ্রন্থহিসাবে মনে করেছেন। লেখিকার ভগিনীও বলেছেন যে অখ্রীষ্টানদের উপরে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব প্রচারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি পরিকল্পিত ও রচিত। এইদিকে লক্ষ্য রেখেই J Long তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থপঞ্জীতে বইটিকে Ethics & Moral Tales-এর পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এই সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য কখনও উপন্যাসের বিষয় হতে পারে না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর Bengali Literature প্রবন্ধে রচনাটিকে Historical Tales বলে চিহ্নিত করেছেন, Historical Novel বলে নয়; অথচ এই একই প্রবন্ধে তিনি 'আলাল'কে 'may be the first novel in the Bengali Language' বলে অভিহিত করেছেন।

সমসাময়িক অন্যান্য দাবিদারদের তুলনায় অতঃপর আমরা 'আলালে'র দাবীকে যৌক্তিক ও প্রতিষ্ঠাযোগ্য বলে গ্রহণ করতে নিশ্চয়ই আর দ্বিধা করবো না। আমরা আগেই দেখেছি যে একমাত্র নরনারীর স্বাধীন প্রেমলীলার চিত্রায়ণ ব্যতীত সার্থক উপন্যাসের সব কটি লক্ষণই 'আলালে' বিদ্যমান।

প্রণয়চিত্রের অভাবের কারণটি আমরা অন্য একটি গ্রন্থের সাক্ষ্যে পরোক্ষভাবে নির্ধারণ করতে পারি। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর সমসাময়িক বাংলার পটভূমিতে ইংরেজিতে লেখা উপন্যাস 'Govinda Samanta' (১৮৭০)-এর ভূমিকায় বলেছেন,—

"You are not to expect love-scenes. The English reader will be surprised to hear this. In his opinion there can be no Novel without love-scenes A novel without love to him the play of Hamlet with Hamlet's part left out. I can not help it"

বিষয়বিন্যাসের নিজস্ব তাগিদেই লালবিহারীর রচনায় প্রণয়দৃশ্যের অভাব ঘটেছিল। বরং উল্টো করে বলা যায় যে, প্রণয়দৃশ্যের উপস্থাপনা করলেই উপন্যাসের অভিপ্রায় ও বাস্তবতার মহিমা ক্ষুণ্ণ হতো। 'আলালের' উদ্দিষ্টও ছিল, 'the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up' এর বাস্তবনিষ্ঠ জীবনালেখ্য রচনা করা। তাই প্রণয়দৃশ্যের অভাব এখানে স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

॥ ২ ॥

"বৈদ্যবাটীর বাবুরাম বাবু বড় বৈষয়িক ছিলেন।…একে কর্মে পটু তাতে তোষামোদ ও কৃতাঞ্জলি দ্বারা সাহেবসুবোদিগকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এজন্য অল্পদিনের মধ্যেই প্রচুর ধন উপার্জন করিলেন। এদেশে ধন অথবা পদ বাড়িলেই মান বাড়ে, বিদ্যা ও চরিত্রে তাদৃক গৌরব হয় না।…যেমন মেঠাইওয়ালার দোকানে মিষ্ট থাকিলেই তাহা মক্ষিকায় পরিপূর্ণ হয়, তেমন ধনের আমদানি হইলেই লোকের আমদানি হয়। বাবুরামবাবুর বাটীতে যখন যাও তাঁহার নিকট লোক ছাড়া নাই—কি বড় কি ছোট, সকলেই চারিদিকে বসিয়া তুষ্টিজনক নানা কথা বলিতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত, আর এলোমেলো লোকেরা একেবারেই জল উঁচু নীচু বলিত।…তাঁহার এক পুত্র ও দুই কন্যা ছিল।…পুত্র মতিলাল বাল্যকাল অবধি আদর পাইয়া সর্বদাই বাইনা করিত—কখনো বলিত আমি চাঁদ ধরিব—কখনো বলিত আমি তোপ খাব…বালকটি পিতামাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না।"

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসে লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র এইভাবেই তাঁর গ্রন্থের নায়ক মতিলাল ও তার পারিপার্শ্বিকের বর্ণনা দিয়েছেন। অতঃপর

তার শিক্ষারম্ভের বর্ণনায় লেখক দেখিয়েছেন কি করে অযোগ্য পাঠশালার গুরু ও গণ্ডমূর্খ পূজারী ব্রাহ্মণের হাতে তার শিক্ষা সুরু হলো। এই সময়ে মতিলালের ভাবনাটি লেখক চমৎকার ব্যক্ত করেছেন এইভাবে—

> "আমি বাপমার আদরের ছেলে—লিখি বা না লিখি, তাঁহারা আমায় কিছুই বলিবেন না—লেখাপড়াশেখা কেবল টাকার জন্য—আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখাপড়ার কাজটি কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইবে। আর যদি লেখাপড়া শিখি তবে আমার এয়ারবক্সিদের দশা কি হইবে? আমোদ করিবার এই সময়—এখন কি লেখাপড়ার যন্ত্রণা ভালো লাগে?"

সমগ্র গ্রন্থটিতে মতিলাল-চরিত্র এই ভাবনার বৃত্তেই বারংবার ঘুরেছে। প্রথমে মৌলবীর দাড়িতে জ্বলন্ত টিকে ফেলে দিয়ে তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়েছে। তারপর কলকাতার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে ইয়ারবক্সীদের সঙ্গে মিলে আমোদ-ফূর্তি আর নষ্টামি করে বেড়িয়েছে। লেখক এ প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"সঙ্গ দোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই।...মতিলাল যে সকল সঙ্গী পাইল, তাহাতে তাহার সুস্বভাব হওয়া দূরে থাকুক, কুস্বভাব ও কুমতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল।" ফলে বালক বয়সেই হলধর, গদাধর, রামগোবিন্দ, দোলগোবিন্দ প্রভৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হলো ও স্কুলজীবনেই সে সর্বপ্রথম ধৃত হয়ে পুলিশ কর্তৃক হাজতে নীত হলো।

মতিলালের এই কুশিক্ষা ও সঙ্গদোষের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন,—

> "এতদ্দেশীয় শিশুদিগের এরূপ শিক্ষা হওয়া বড় কঠিন,—প্রথমতঃ ভালো শিক্ষক নাই—দ্বিতীয়তঃ ভালো বহি নাই—এমন ২ বহি চাই যাহা পড়িলে মনে সদ্ভাব ও সুবিবেচনা জন্মিয়া ক্রমে ২ দৃঢ়তর হয়।...তৃতীয়তঃ কিছু কিছু উপায় দ্বারা মনের মধ্যে সদ্ভাব জন্মে তাহা অতি অল্পলোকের বোধ আছে।"

এই সূত্রেই উপন্যাসে বরদাবাবুর প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি নিজে সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও সৎস্বভাব, তাঁর উপর শিক্ষক হিসাবেও তিনি সুযোগ্য; তাই মতিলালের ছোট ভাই রামলালকে তাঁর কাছে সুশিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। এ বিষয়ে বেণীবাবুর ভাবনা এই রকম,—

"...বাবুরামবাবুর কনিষ্ঠপুত্র রামলাল যদ্যপি মতিলালের মত হয়, তবে বাবুরামের বংশ ত্বরায় নির্বংশ হইবে, কিন্তু এই ছেলেটি ভালো হইতে পারে,

তাহার উত্তম সুযোগ হইয়াছে। এই সকল বিবেচনা করিয়া রামলালকে সঙ্গে করিয়া উক্ত বিশ্বাসবাবুর নিকটে গিয়াছিলাম, ছেলেটির সেই পর্য্যন্ত বিশ্বাস-বাবুর প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি হওয়াতে তাহার নিকটেই সর্বদা পড়িয়া আছে, আপন বাটীতে বড থাকেনা, তাঁহাকে পিতার তুল্য দেখে।"

এইভাবে লেখক নায়ক মতিলালের বিপরীতস্বভাব রামলাল চরিত্রের অবতারণা করেছেন। মতিলাল যখন অসৎসঙ্গে পড়ে ঠকচাচা প্রমুখ কুচক্রীদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে, মাতা ও ভগিনীদের সর্বপ্রকার হিতৈষণা অগ্রাহ্য করে ধাপে ধাপে অধঃপতনের অতলে তলিয়ে যেতে বসেছে, রামলাল তখন বরদাবাবুর সুযোগ্য নির্দেশে, উত্তম গ্রন্থ পাঠ করে ও দেশভ্রমণ করে চরিত্রশক্তিতে উন্নতির এক একটি ধাপ অতিক্র[illegible] চলেছে। কবিরাজের নিগ্রহ, যুবতীর শ্লীলতাহানির অপচেষ্টা, গদি প্রাপ্তির পর মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার, মাতা, ভগিনী ও ভ্রাতাকে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, ঠকচাচার কুপরামর্শে ফৌজদারী করা, ইত্যাদি নানা অপকর্মের ধারাবাহিকতার পর অবশেষে মতিলালের চৈতন্যোদয় ঘটেছে। তার সর্বনাশের মন্ত্রী ঠকচাচা ও বাহুল্য শেষ পর্য্যন্ত দ্বীপান্তরের সাজা পেল। বারাণসীতে মতিলালের নবজন্ম লাভ ঘটলো। আত্মগ্লানি ও বিবেকদংশনের জ্বালায় যন্ত্রণাগ্রস্ত মতিলাল এক প্রাচীন সাধুব্যক্তির সান্নিধ্যে ও সদুপদেশে চৈতন্যলাভ করলো। এই সময়কার কথা প্রসঙ্গে মতিলালের আত্মচিন্তার কথা লেখক বর্ণনা করেছেন,—

> "মনের একপ্রকার গতি হওয়াতে তাঁহার আপনার প্রতি ধিক্কার জন্মিল এবং এই ধিক্কারে অত্যন্ত সন্তাপ হইতে লাগিল, তখন আপনাকে সর্বদা এই জিজ্ঞাসা করিতেন—আমার পরিত্রাণ কিরূপে হইতে পারে—আমি যে কুকর্ম করিয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় দাবানলের ন্যায় জ্বলিয়া ওঠে।"

এই সন্তাপিত আত্মবিক্ষুব্ধ মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মতিলাল চরিত্রে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন হয়েছে। শারীরিক ও মানসিক নিগ্রহ শেষে সে শান্তির আধার গড়ে তুলেছে ও প্রায়শ্চিত্তান্তে মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা ও বরদাবাবুকে ফিরে পেয়েছে। অত্যধিক প্রশ্রয়, অপরিমিত ঐশ্বর্য, কুশিক্ষা ও কুসঙ্গের প্রভাবে যে মতিলাল অধঃপতনের শেষ ধাপটিতে নেমে গিয়েছিল, আত্মগ্লানির বিবেকদংশন, গুরুর সদুপদেশ ও শুভবুদ্ধির উন্মেষে সে আবার তার মানবিকতার উচ্চভূমিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। চরিত্রের এই উত্তরণেই তার নায়কসত্তা চরিতার্থ হয়েছে এবং লেখকের উপন্যাস রচনাও সফল হয়েছে।

মতিলাল সীতারাম কিংবা গোরা নয়। কিন্তু আত্মিক সংকট ও তার উত্তরণের সাধর্ম্যে এরা তিনজনেই অভিন্ন। মোহ থেকে আত্মনাশের গীতোক্ত ভাবনার প্রেক্ষাপটে সীতারাম চরিত্রের চিত্রায়ণ, তার বিশাল ব্যক্তিত্বের ধাপে ধাপে অধঃপতনের শেষ ধাপটিতে পৌঁছে তার চৈতন্যোদয় হয়েছে ও জীবনের অন্তিমপর্বে লেখক তাঁর উত্তর দেখিয়েছেন ব্যক্তিত্বের সমতলভূমিতে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে। 'গোরাতে' অবশ্য স্বতন্ত্র চিত্র, কিন্তু তবু ধর্মদর্শনের গোলোকধাঁধায় পথ হারিয়ে যখন গোরা হিন্দুধর্মের আচার-সর্বস্বতার চোরাবালিতে নিমজ্জমান, তখন অকস্মাৎ ঘটনাক্রমে তার চৈতন্যের বিপুল উত্তরণ সংসাধিত হয়েছে। সংকীর্ণ জাতিগত ক্ষেত্র থেকে সে বিশাল মানবতাবোধে উত্তীর্ণ হয়েছে। মতিলালের স্রষ্টাও তার সীমিত ক্ষমতা নিয়ে ও সীমাবদ্ধ বিষয় নিয়ে এই উত্তরণেই পৌঁছোতে চেয়েছেন। তাই অসম্পূর্ণ হলেও মতিলাল বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক আর প্যারীচাঁদের হাতেই বাংলা উপন্যাসের নায়কচিন্তার বিবর্তনযাত্রার শুভারম্ভ।

অবশ্য এ কথাও সত্য যে, যাত্রারম্ভ করলেও, প্যারীচাঁদের হাতে বাংলা উপন্যাস ও তার নায়ক, কোনোটারই পূর্ণরূপের আভাস পাওয়া সম্ভবপর নয়, কেননা যে সংকীর্ণ উদ্দেশ্য ও মানসিকতা নিয়ে তিনি 'আলালে'র পরিকল্পনা করেছিলেন, তাতে উপন্যাসের মানবভৌম জীবননিষ্ঠার পূর্ণ ছায়াপাত কোনমতেই সম্ভবপর ছিল না। আর তার নায়ক মতিলালও ছিল তাঁর এই সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য-প্রতিপাদনেরই অবলম্বন মাত্র। সেখানেও জীবনের সর্বাঙ্গীণ ছবি প্রত্যাশা করা যায় না। তবুও প্যারীচাঁদের মতিলালে, অস্পষ্টভাবে হলেও একটি যাত্রার সূচনাপর্ব চিনে নিতে আমাদের ভুল হয় না, যার পূর্ণরূপ দেখবার জন্য আমাদের আরও ছ-সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে, যতদিন না ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে 'দুর্গেশনন্দিনী' ও তার নায়ক জগৎসিংহ আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে।

উৎস-নির্দেশ

১। ভূমিকা-আলালের ঘরের দুলাল।

২। ঐ।

৩। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)।

৪। ঐ।

বঙ্কিমচন্দ্র

॥ ১ ॥

"...দুর্গেশনন্দিনী আমাদের উপন্যাস সাহিত্যে একটি নূতন অধ্যায় খুলিয়া দিয়াছে। যে পথ দিয়া উহার অশ্বারোহী পুরুষটি অশ্বচালনা করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমান্সের রাজপথ এবং বঙ্গ উপন্যাসে প্রথম বঙ্কিমচন্দ্রই এই রাজপথের রেখাপাত করিয়াছিলেন।" [১] রসিক সমালোচকের এই অভিমত নানা তাৎপর্য বহন করে। প্রথমতঃ তিনি বঙ্কিম-পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসকল্প রচনা 'আলালের ঘরের দুলালের' তুলনায় 'দুর্গেশনন্দিনীতে' যে যথার্থ উপন্যাসের লক্ষণগুলি অধিকতর পরিণত ও সার্থকভাবে বিদ্যমান, তা বলতে চেয়েছেন। প্যারীচাঁদের রচনায় সমাজচিত্রের নকশাজাতীয় প্রতিলিপি পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উপন্যাসের সমগ্রতা অপ্রাপণীয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় নভেলের যে একটি স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা আছে এবং রোমান্স-ধর্মী রচনা যে আদিযুগের উপন্যাস বা নভেলের একটি বিশিষ্ট অংশ ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তা ভালোভাবেই জানতেন। স্কটের 'আইভ্যানহোর' সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর কাকতালীয় সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ না করেও একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে রোমান্সধর্মেই বাংলা উপন্যাস তার আত্মপ্রকাশের প্রথম উৎসমুখটি খুঁজে পেয়েছিল। আলাল সম্পূর্ণভাবে রোমান্সধর্ম-বিবর্জিত বলেই তার মধ্যে উপন্যাসের পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়েনি। তাছাড়া, সমালোচকের মন্তব্যের একটি দ্বিতীয় তাৎপর্যও এই যে, অশ্বচালনার ও অশ্বারোহী পুরুষটির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের যথার্থ কেন্দ্রীয় চরিত্রেরও আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। দুর্গেশনন্দিনী'র জগৎসিংহ, যিনি গ্রন্থারম্ভে উল্লিখিত অশ্বারোহী পুরুষ, তিনিই তার সমস্ত ভুল-ত্রুটি-অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে বাংলা উপন্যাসের প্রথম কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাকে সাহিত্যিক পরিভাষায় আখ্যানের Hero বা নায়ক বলা চলে। যদিও আলালের ঘরের দুলালেও ধনীপুত্র মতিলাল একহিসাবে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করেছে, তবুও যে গুণে বা বৈশিষ্ট্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র নায়ক পদবাচ্য হতে পারে, মতিলাল কোনদিক দিয়েই তার অধিকারী ছিল না। প্যারীচাঁদের নীতিনিয়ন্ত্রিত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি জীবনের গোটা চেহারাটাকে ধরতে অক্ষম ছিল এবং তাঁর রচনায়ও তাই জীবনের অসম্পূর্ণ ও আংশিক রূপটাই ধরা পড়েছিল। ব্যক্তিগত ও সামাজিক অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ এই উভয় সত্তার টানা পোড়েনে যে

মানবচরিত্র ক্রমশ বিকশিত ও বিবর্তিত হয়ে ওঠে, প্যারীচাঁদ তার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাঁর টাইপধর্মী-চরিত্রায়ণ তাই যথার্থ নায়ক পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া উপন্যাসের সমস্ত ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে নায়ক-চরিত্রের যে ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মতিলাল তার সম্পূর্ণ অনধিকারী। তাই শুধু প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস বলেই নয়, প্রথম সার্থক নায়ক চরিত্রের রচয়িতা হিসাবেও বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে অগ্রণীপুরুষ।

॥ ২ ॥

"নায়ক বলবো কাকে? যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া কাহিনী অচল হয়ে পড়ে, অবশ্যই সে নায়ক'। [২] অত্যন্ত সহজ কথায় সমালোচক কোন নাটক বা উপন্যাসে নায়কের বৈশিষ্ট্যটি এখানে ব্যক্ত করেছেন। নায়ককে বলা যেতে পারে একটি আখ্যানের মেরুদণ্ড। মেরুদণ্ড যেমন প্রাণীদেহকে ঋজু ও সচল করে রাখতে পারে, সর্বাঙ্গীণ শিথিলতা থেকে মুক্ত রাখতে পারে, নায়ক চরিত্রের অস্তিত্বও তেমনিভাবে কোন একটি আখ্যানের প্লটটিকে যথার্থভাবে গড়ে তুলতে পারে। তাছাড়া উপন্যাসে বা নাটকে লেখকের যে বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি প্রকাশ পায়, তাও প্রধানত নায়ক চরিত্রকে অবলম্বন করেই প্রকাশিত হয়। যে বিপুল জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাসে সন্ধান করেছিলেন, তাঁর সৃষ্ট নায়কচরিত্রগুলিই মুখ্যত সে অনুসন্ধানে তাঁর প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণপুরুষ যুগন্ধর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিপুল মনীষা ও অনিঃশেষ গ্রহণশক্তি দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যসমুদ্র মন্থন করে তাঁর সারস্বত চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। একদিকে প্রাচ্য সাহিত্যের বিপুল উত্তরাধিকার, অন্যদিকে প্রতীচীয় সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্র—উনিশ শতকীয় নবজাগ্রত অন্যান্য বুদ্ধিজীবীর মতো বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিরাটভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য-নাটক ও নবাস্বাদিত ইউরোপীয় কাব্য-নাটক ও আখ্যান বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টি ক্ষমতাকে নানা দিক থেকে উত্তেজিত করেছিল। প্রথার অনুসরণে স্বল্পকালীন কাব্যসাধনা করলেও শেষপর্যন্ত বঙ্কিমপ্রতিভা তার প্রকাশের যথার্থ উৎসক্ষেত্রটি খুঁজে পেয়েছিল উপন্যাস রচনায়। এই উপন্যাস রচনায় তাঁর চৈতন্য ইউরোপীয় নভেল ও শেক্সপীয়রীয় নাটক উভয়ের দ্বারাই গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কচরিত্রের আলোচনা

কালে সাধারণভাবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবনায় কাব্যে ও নাটকে নায়কের ধ্যানরূপটির পরিচয় গ্রহণ অনাবশ্যক বা অবান্তর বলে বিবেচিত হবে না।

প্রাচ্য আলংকারিক চিন্তায় মহাকাব্যের প্রসঙ্গেই নায়কের বিষয়টি বিবেচিত হয়েছে। সর্গবন্ধ মহাকাব্য যে চরিত্রটির বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন ঘটনাকে অবলম্বন করে রচিত হবে তাকেই তাঁরা নায়কপদবাচ্য করেছেন। এই নায়কের যে লক্ষণ তাঁরা বর্ণনা করেছেন, তা একান্তভাবেই বহিরঙ্গমূলক। তাঁরা যে নায়কের কথা বলেছেন, সে হয় দেবতা অথবা সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হবে এবং তার চরিত্রলক্ষণ হিসাবে তাঁরা ধীরোদাত্ত বিশেষণটি প্রয়োগ করেছেন। এছাড়া নায়ক চরিত্রের আন্তরিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁরা বিশেষ কিছুই উচ্চারণ করেননি। পাশ্চাত্ত্য ভাবনাতেই Tragedy প্রসঙ্গে মনীষী এরিস্টটল সর্বপ্রথম Hero চরিত্র সম্পর্কে বিস্তৃত ও বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করেন। তাঁর এই আলোচনাসূত্র থেকে ভাবনা গ্রহণ করে পরবর্তীকালে সাহিত্যচিন্তায়, বিশেষত নাটকের আলোচনায় Hero সম্পর্কে একটি সর্বজন-গ্রাহ্য মতবাদ গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক Nicoll তাঁর 'The theory of drama' গ্রন্থে Tragedy প্রসঙ্গে আলোচনাকালে Hero সম্পর্কে যে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন, তার মধ্যেই নাটকে নায়ক চরিত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

নায়কের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, কমেডি অপেক্ষা ট্র্যাজেডিতেই নায়ক চরিত্রের সম্ভাবনা সমধিক, কেননা, কমেডিতে যে ঘটনা বিবৃত হয়, তাতে কোনও একটি বা দুটি চরিত্র প্রাধান্য পায় না। অথচ ট্র্যাজেডিতে সাধারণত একটি বা দুটি চরিত্রই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। 'হ্যামলেটে'—একক হ্যামলেট, 'রাজা লীয়ার' এ লীয়ার ও কর্ডেলিয়া, 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবেথ দম্পতি, অথবা 'ওথেলোতে' ওথেলো ও ইয়াগো। ট্র্যাজেডিতে নায়ক এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে সে 'expresses both aim and spirit' ও "It is the Hero who gives significance and tone to a Tragedy" ৩

এই গুরুত্বপূর্ণ নায়কচরিত্রের অন্তরঙ্গ স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এরিস্টটলের সূত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এরিস্টটল নায়ক চরিত্রের স্বরূপ নির্দেশ করে বলেছেন যে, সে "a person neither essentially virtuous or just nor yet involved in crime by deliberate vice or villainy, by some human frailty". ট্রাজেডিতে নায়কের যে শোচনীয় পতন

দেখানো হয়, তার জন্তে দুটি সম্ভাব্য কারণের কথাও এ প্রসঙ্গে নির্দেশিত হয়েছে। সে দুটি যথাক্রমে—(ক) ignorance of affairs beyond his knowledge ও (খ) human passion. মোটকথা এই যে ট্র্যাজেডির আখ্যান যে নায়কচরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, যাকে অবলম্বন করে নাট্যকার তাঁর জীবনভাবনাকে মূর্ত করে তোলেন, সেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রটি যেমন অবিমিশ্র নিষ্কলুষ বা কুচক্রী হবে না, তেমনি তার বিরাট চরিত্রের পতনও ঘটবে দুটি সম্ভাব্য কারণের সূত্রে; হয় তার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত কোন ঘটনার প্রতিক্রিয়ারূপে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে, নয় মানবিক বাসনার কোন অপ্রতিরোধ্য অসংযম তার জীবনে পতন ঘটিয়ে তুলবে। যে অ-সাধারণ চরিত্র ট্র্যাজেডির প্রাণকেন্দ্র, তার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথাও একটি পাপের রন্ধ্রপথ থাকবে, যার মধ্য দিয়ে পতনের শনি প্রবেশ করে তার বিপুল পৌরুষ ও অসীম শক্তিমত্তাকে বিপর্যস্ত ও ভূপাতিত করে দেবে। নায়কের ব্যক্তিত্বের এই রন্ধ্র বা ত্রুটিকে মোটামুটি দুটি ভাগেই ভাগ করা হয়েছে—unconscious crime and thoughtles folly ও conscious crime. এর প্রথমটিকে অবশ্যই human frailtyর অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং গ্রীক নাটকে, বিশেষ করে ইডিপাসের ত্রয়ীতে এর স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এই রীতির নায়ক চরিত্রের চিত্রণ প্রাচীন যুগেরই বিশিষ্টতা, তাই এটিকে non-Shakespearean নায়ক লক্ষণ বলে অভিহিত করা যায়। সাধারণভাবে দ্বিতীয় ধরণের ত্রুটি, অর্থাৎ conscious crime-এর সূত্রেই আধুনিক কালের নায়কচরিত্র চিহ্নিত। গ্রীক নাটকে এর দু একটি বিচ্ছিন্ন উদাহরণ মিললেও, শেক্সপীয়রের নাটক এর বিচিত্র উদাহরণস্থল। ম্যাকবেথ এর সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নিদর্শন। ওথেলোতে অবশ্য সজ্ঞান ও অজ্ঞান উভয় ধরণের অপরাধ বা ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। হ্যামলেট কিছুটা ব্যতিক্রম হলেও, তার দোলাচল-চিত্ততা ও দীর্ঘসূত্রতা এরই পর্যায়ে পড়ে। বলতে পারা যায় যে, আধুনিক বিশ্বসাহিত্যে নায়ক পরিকল্পনায় এই রীতিই সর্বাধিক পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। এছাড়া অবশ্য অত্যন্ত মুষ্টিমেয় হলেও, flawless hero বা নির্দোষ নায়কের উদাহরণও সাহিত্যে পাওয়া যায়। শেক্সপীয়রের রোমিও এর বিশিষ্ট উদাহরণ; কেননা তার শোচনীয় জীবনপরিণাম তার সজ্ঞান বা অজ্ঞান কোন ত্রুটির সূত্রেই সংঘটিত হয়নি, হয়েছে শুধুমাত্র ঘটনাগত কার্য-পরম্পরায়। কেউ কেউ অবশ্য অভিভাবকের বিনানুমতিতে তার পরিণয়কেই এই ত্রুটি বলে নির্দেশ করেছেন—কিন্তু সে মত সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

এটিকে তাই সমালোচকরা ট্র্যাজেডির একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে স্থাপন করে বলেছেন—Tragedy of Fortune।

ট্র্যাজেডিতে নায়ক চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা তাঁদের অমর নাট্যসৃষ্টি করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করেই তাঁরা আপন আপন প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যে ট্র্যাজেডিতে নতুন নতুন তাৎপর্য আরোপ করতে চেয়েছেন, আর তারই ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নায়কের মধ্যে বিবিধ বৈচিত্র্য আত্মপ্রকাশ করেছে। কখনো তাঁরা দুই-নারীর পরস্পর বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত নায়কের দোলাচলতা ও পতন দেখাতে চেয়েছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন একদিকে common duty and law ও অন্যদিকে power of passion or emotion, কেমন করে দুটি নারীর রূপ ধরে নায়কের সত্তাকে দ্বিধা-দীর্ণ করে তার পতনের পথটিকে প্রসারিত করে দিচ্ছে। কামনার সঙ্গে আদর্শের এই দ্বন্দ্ব সাধারণত নায়কের অন্তর্জগৎকেই বিক্ষত করে তোলে। এই শ্রেণীর নায়ক চরিত্রায়নে লেখকের বিশ্লেষণমুখ্যতাই প্রাধান্য পায়। ফরাসী নাটকের জগতেই এর উদাহরণ বেশি, অবশ্য শেক্সপীয়রের Antony and Cleopetra নাটকের Antony চরিত্রের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য অনেকাংশেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া কোথাও কোথাও নাটকে দ্বৈত নায়কত্বও লক্ষ্য করা যায়, যেখানে নাটকের ঘটনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় দিক দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে দুটি চরিত্রের প্রবর্তনায়। আবার অনেক আধুনিক নাটকে নায়কের অস্তিত্বই নেই বলা চলে। গলসওয়ার্দির 'Strife' বা 'Justice' এই ধরণের নায়কহীন নাটকের নিদর্শনরূপে গণ্য হতে পারে।

॥ ৩ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে পাশ্চাত্ত্য Tragedyর আদর্শে নায়ক সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় গ্রহণ খুবই প্রাসঙ্গিক। উনিশ শতকের যে পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছে, তার সমস্ত পরিমণ্ডলটি ছিল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, বিশেষ করে, শেক্সপীয়রের নাটকের আলোকে উদ্‌ভাসিত। হিন্দু কলেজে শেক্সপীয়ার পঠন-পাঠন, ডিরোজিও রিচার্ডসনের অনবদ্য অধ্যাপনা, নাট্যোৎসাহী বাঙালীর নাট্যাভিনয়ে শেক্সপীয়রের নাটকের জনপ্রিয়তা,—সব মিলিয়ে উনিশ শতকের আবহাওয়ায় পাশ্চাত্ত্য প্রভাবিত এক নতুন সাহিত্যাদর্শ দানা বেঁধে উঠছিল। 'কীর্তি-

বিলাসের, ভূমিকায় জি, সি, গুপ্ত ভারতীয় নাট্যাদর্শের পরিবর্তে পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির প্রতি নিঃসংশয় আনুগত্য ও পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করেছেন। তাঁর নাট্যকাহিনীতে হ্যামলেটের কাহিনীর ছায়াপাতে এই ধারণাই স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, হরচন্দ্র ঘোষ কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর অথবা চন্দ্রকালী ঘোষ বা বেণীমাধব ঘোষ প্রভৃতিও সে যুগে শেক্সপীয়রের নাটকের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। [৫] মোটকথা সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের কালে বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলাদেশে বাস করতেন তার সাহিত্যিক পরিবেশটি শেক্সপীয়রের প্রভাবে ছিল প্রভাবিত।

একদিকে শেক্সপীয়ার অন্যদিকে ইংরেজি নভেল,—বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিক্ষমতাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিদেশী নভেলের আঙ্গিককে আয়ত্ত করার যে অসম্পূর্ণ প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ববর্তী কালে লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমের কুশলী প্রতিভা তাকেই পূর্ণাঙ্গ রূপদান করতে সমর্থ হয়েছে। একথায় কোন দ্বিমতই নেই যে, মুলেন্স এর 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' কিংবা লালবিহারী দে-র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' অথবা প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল',—এর কোনটাই উপন্যাসের সার্থক আঙ্গিকটিকে আত্মস্থ করতে পারেনি। আখ্যানবস্তুর যে সর্বাঙ্গীণ ঐক্য রচনা, চরিত্রের মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের সঞ্চার, জীবনবোধের যে বিপুল ও নীতিনিরপেক্ষ মানবভৌম দৃষ্টিভঙ্গি, তা এদের কোনটিতেই অঙ্কুরিত হয়ে উঠতে পারেনি। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' মধ্যে এই চেতনার একটি ক্ষীণতম আভাস পাওয়া গেলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই এর সার্থক ও সফল রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৬৫-তে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী' শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্রথম সফল উপন্যাস। আর এই উপন্যাসে ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কটের প্রভাব সমস্ত সমালোচকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ১৮৬৫ তে প্রকাশিত 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে ১৮৯৩তে প্রকাশিত 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন একদিকে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রতিভার ক্রমবিকাশকে ধীরে ধীরে পরিণতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি এই সমস্ত রচনার মধ্যদিয়ে মানবজীবন সম্পর্কেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমবিবর্তিত হয়ে একটি সুসমঞ্জস পরিণামে পৌঁছেছে। সাধারণত ঔপন্যাসিকরা তাঁদের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়েই তাঁদের নিজস্ব জীবনদর্শন ব্যক্ত করে থাকেন এবং এই অভিব্যক্তিতে সর্বাধিক গুরুত্ব অর্জন করে নায়ক

চরিত্র। এক হিসাবে বলা চলে যে, ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্ট নায়ক চরিত্রের চোখ দিয়েই বিশ্বরূপ দর্শন করেন এবং তার চিন্তার সূত্রেই আপন জীবনদর্শন প্রকাশ করেন। অবশ্য সব ঔপন্যাসিকের রচনাতেই যে এই ক্রমবিকাশের ধারাপথটি খুব স্পষ্ট ও সহজবোধ্য তা নয়, অনেক ঔপন্যাসিকই আখ্যান নির্মাণের নব নব কৌতূহলেই উপন্যাস রচনা করেন বা কখনো কখনো সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ তাঁদের সৃষ্টি প্রেরণাকে উত্তেজিত করে তোলে। তাই তাঁদের সমগ্র রচনার কালানুক্রমিক ধারাপথটির অনুসরণ করলেই তাঁর জীবন দর্শনের রূপরেখাটিকে ধরা যায় না। অনেক লেখক জীবনের শুরুতেই যে বিশিষ্ট জীবনবোধকে আয়ত্ত করেন, পরবর্তী রচনাতে তারই অনুবর্তন করেন মাত্র। আবার কারো কারো জীবনবোধ তাঁদের সাহিত্যজীবনের মধ্যপথে একটি সম্পূর্ণতা পায়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালীর' প্রথম আত্মপ্রকাশেই যে জীবনবোধ গড়ে উঠেছে তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যসাধনায় তারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে এই পরিপূর্ণতার পথরেখাটি কিছুটা এলোমেলো। ঠিক কোন্‌খানে যে তিনি জীবনদর্শনের সিদ্ধিতে পৌছেছেন, তা অত্যন্ত দুর্লক্ষ্য। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ অবশ্য এই ধারার ব্যতিক্রম। তাঁদের উপন্যাসের কালানুক্রমিক ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়েই তাঁদের জীবনবোধ ক্রমশ দানা বেঁধে উঠেছে। এক একটি রচনার মধ্য দিয়ে এক একটি দল উন্মোচন করে করে যেন তাঁদের জীবনবোধের শতদলটি পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠেছে। আর এই ক্রমবিকাশের রেখাচিত্রটি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই আরো স্পষ্ট, ঋজু, নিঃসন্দিগ্ধভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রমানস থেকে বঙ্কিমমানসের যে মৌলিক পার্থক্য, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মন যেখানে ভাবুকের, বঙ্কিমের মন সেখানে নৈয়ায়িকের,—সেই পার্থক্যের জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনের নিরিখে বঙ্কিমমানসের ক্রমবিকাশের পরিচয়টি আরো স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট নায়ক চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের যথার্থ রেখাচিত্রটি এই ধারাবাহিকতার ভূমিকাতেই খুঁজে পাওয়া সম্ভবপর হবে।

॥ ৪ ॥

আর পাঁচজন বাঙালী সাহিত্যিকের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট পার্থক্য আছে। তাঁর সাহিত্যে চেতনা ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে অন্যের যথেষ্ট তফাৎ। যে উনিশ শতকে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই যুগপরিবেশ যেমন একদিকে তাঁর

মন তৈরী করেছিল, অন্যদিকে তেমনি তাঁর নিজস্ব পারিবারিক আদর্শ, বিশেষ করে তাঁর পিতার আদর্শও তাঁর মনে গভীর রেখায় মুদ্রিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো 'সাহিত্য' তাঁর কাছে একের সঙ্গে অপরের, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের সহিতত্বের সূত্রে ধরা দেয়নি। তিনি স-হিত অর্থাৎ মঙ্গলসাধনের অর্থেই সাহিত্যের সহিতত্বকে দেখতে পেয়েছিলেন। উনিশ শতকের নানা ভাবদ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত বাংলাদেশে তিনি ভাবনা ও আদর্শের একটি স্থির ও অচঞ্চল কেন্দ্রবিন্দুর সংহতি খুঁজেছিলেন। জীবনের বিচিত্র পর্বে নানা বিপরীতমুখী ভাবনার সমন্বয় করে তিনি যে একটি বিশেষ জীবনদর্শন গড়ে তুলেছিলেন, তার মূল কথা ছিল—'প্রীতি সর্বব্যাপিনী. প্রীতিই ঈশ্বর', এই প্রীতিমন্ত্রই তাঁর সাহিত্য ভাবনায় হিতসাধন বা মঙ্গলসাধনের ভাবকেন্দ্রটি রচনা করেছিল। তাই বঙ্গীয় লেখকদিগের প্রতি তাঁর উপদেশে তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, যে রচনা সংসার সমাজের হিতসাধনে অপারগ, তা রচিত না হওয়াই ভালো। তাঁর এই হিতবাদী-জীবনদর্শনের কেন্দ্রে তিনি মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর কাছে তাই মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধান অত্যন্ত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রতিভাস কমলাকান্তের মুখ দিয়ে 'এ জীবন লইয়া কি করিব,'—এই জিজ্ঞাসার উত্তরই তাই বঙ্কিমচন্দ্র সারাজীবনব্যাপী সারস্বত সাধনায় অনুসন্ধান করে গেছেন। আর তাঁর সৃষ্ট নায়ক চরিত্রগুলি এই উত্তর অনুসন্ধানের এক একটি প্রয়াস-ক্ষেত্র মাত্র। কেন না ট্র্যাজেডি বা মহাকাব্যের মত আধুনিক যুগে উপন্যাসের ক্ষেত্রেও নায়ক চরিত্র ঔপন্যাসিকের প্রধান অবলম্বন, যার দ্বারা উপন্যাসের 'aim and spirit' আত্মপ্রকাশ করে। নায়কই সেই উপায় যার মাধ্যমে উপন্যাসের 'significance and tone' ব্যঞ্জনালাভ করতে সক্ষম হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারাটি পর্যালোচনার পূর্বে বঙ্কিমী নায়ক সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ ধারণার পরিচয় গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। সাহিত্যিক হিসাবেও বঙ্কিমচন্দ্র যেমন আর পাঁচজন সাহিত্যিক থেকে স্বতন্ত্র, চরিত্র-পরিকল্পনায় বিশেষত নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনায়, তাঁর রীতি ও নীতি স্বতন্ত্র। শুধুমাত্র মানবজীবনের অসীম বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করাই তাঁর সাহিত্যিক মনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল না, মনুষ্যত্বের আদর্শ সন্ধানও ছিল তার কাছে সমপরিমাণেই গুরুত্বপূর্ণ, এমন কি গুরুতরও। সাধারণভাবে শেক্সপীয়রের রচনাতে আমরা মানব-জীবনের অনন্ত বৈচিত্র্যের পরিচয় লাভ করে তাঁর মধ্যে ঐশী সৃষ্টি ক্ষমতার

প্রতিবিম্ব দর্শন করে ধন্য হই। তাঁর ট্র্যাজেডিগুলিতে মানুষের প্রচণ্ড শক্তি ও শোচনীয় বিপর্যয় দেখে আমরা যুগপৎ নন্দিত ও স্তম্ভিত হই। আমরা তাঁর রচনায় মানবজীবনকে পাই, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শকে পাই না। অবশ্য তার জন্য দুঃখও করি না, কেননা, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ শেক্সপীয়রের অন্বিষ্ট ছিল না, ছিল মানবজীবনের অসীম রহস্যময় বৈচিত্র্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় আমরা শেক্সপীয়রীয় রীতির এই অনন্ত রহস্যময় বৈচিত্র্যের সঙ্গে একটি স্থির অচঞ্চল আদর্শের অনুসন্ধিৎসাও লক্ষ্য করি বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে মানুষের বিচিত্র ও আদর্শ—উভয়রূপকেই তাঁর উপন্যাসের পাতায় পাতায় খুঁজে ফিরেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে চতুর্থ সংস্করণ-রাজসিংহে এই খোঁজা অবিরাম ও নিরলসভাবে প্রবাহিত হয়ে শেষ পর্যন্ত সার্থকতা লাভ করেছে। তাঁর রচনায় তাই সংস্কৃত আলংকারিক শাস্ত্র সম্মত ধীরোদাত্ত ও ইংরেজি রোমান্সের 'শিভ্যালরিযুক্ত' নায়কের সঙ্গে শেক্সপীয়র প্রদর্শিত ট্র্যাজিক নায়ক এবং সর্বশেষে লেখকের নিজস্ব ভাবনাশ্রিত Ideal বা আদর্শ নায়কের একটি স্পষ্ট বিবর্তন রেখা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের সাহিত্যিক মন যতই পরিণত হয়েছে, তার নায়কের রূপও ততই শিভ্যালরি থেকে ট্র্যাজেডির দিকে উন্নীত হয়েছে। পরে শিভ্যালরি বা বীরোচিত লক্ষণটি ট্র্যাজেডির নায়কের অন্যতম বৈশিষ্ট্যরূপে গৃহীত হয়ে আদর্শ নায়কের রূপ পরিগ্রহ করতে উদ্যত হয়েছে। অত্যন্ত স্থূলভাবে বলা যায় যে, জগৎসিংহে রোমান্সসুলভ শিভ্যালরি লক্ষণযুক্ত নায়কের আত্মপ্রকাশ, 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্রনাথে ট্র্যাজিক নায়কের প্রথম পদক্ষেপ, সীতারামে ট্র্যাজিক ও আদর্শ নায়কের সমীকরণ প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতা এবং সর্বশেষে 'রাজসিংহে' আদর্শ নায়কের প্রতিষ্ঠা ও পরিণাম। অবশ্য রাজসিংহের আদর্শ নায়কত্বের পাশে মবারক চরিত্রে ট্র্যাজিক নায়কের রূপও স্থান পেতে দ্বিধা করেনি। বঙ্কিম-উপন্যাসের রচনাগত কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করে ও উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক পর্যালোচনা ও নায়ক-চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিশ্লেষণ সাহায্যে বঙ্কিমী-উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারাটি অতঃপর আমরা অনুসন্ধানে সচেষ্ট হবো।

॥ ৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রকাশগত দিক থেকে একটি কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করলে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-ভাবনার ক্রমবিকাশের সূত্রটির

একটি স্পষ্ট পটভূমিকা রচনা করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটা কথা বলে রাখা দরকার যে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রচনাবলীর নতুন নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্তন, পরিবর্জন ও পরিমার্জনা করতেন. ফলে, তাঁর উপন্যাসের শুধু রূপেরই নয়, ভাবনাগত দিকেরও বিপুল পরিবর্তন সাধিত হতো। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যে কালানুক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করবো, তাতে এই দৃষ্টিভঙ্গিই বেশিমাত্রায় প্রযুক্ত হবে। তাঁর রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকা এইরকম :—

দুর্গেশনন্দিনী—১৮৬৫ খ্রীঃ
কপালকুণ্ডলা—১৮৬৬ খ্রীঃ
মৃণালিনী—১৮৬৯ খ্রীঃ
বিষবৃক্ষ—১৮৭৩ খ্রীঃ
ইন্দিরা—১৮৭৩ খ্রীঃ
যুগলাঙ্গুরীয়—১৮৭৪ খ্রীঃ
রাধারাণী—১৮৭৫ খ্রীঃ
চন্দ্রশেখর—১৮৭৫ খ্রীঃ
রজনী—১৮৭৭ খ্রীঃ
কৃষ্ণকান্তের উইল—১৮৭৮ খ্রীঃ
রাজসিংহ—১৮৮২ খ্রীঃ
আনন্দমঠ—১৮৮২ খ্রীঃ
দেবী চৌধুরাণী—১৮৮৪ খ্রীঃ
সীতারাম—১৮৮৭ খ্রীঃ

রচনাগুলির প্রথম প্রকাশের এই কালপরিচয় কিন্তু বঙ্কিমী-উপন্যাসের যথাযথ কালানুক্রমিক বিন্যাস নয়, কেননা, লেখকের জীবিতকালে প্রকাশিত শেষতম সংস্করণের নিজস্ব সংযোজনা ও সম্পূর্ণতার সূত্রেই এই তালিকায় যথাযথ কালানুক্রমিকতা রক্ষিত হবে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, 'ইন্দিরা'র পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশ পায় ৩০ শে জুলাই, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ পায় ১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসে এবং 'সীতারামের' তৃতীয় সংস্করণ ২৩ মে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রণীত সীতারামের তৃতীয় সংস্করণই শেষ গ্রন্থ, কেননা তাঁর দেহান্তর ঘটে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল। কিন্তু এই সংস্করণগুলির ক্ষেত্রে আনুপূর্বিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অন্তত তিনটি গ্রন্থের

ক্ষেত্রে নতুন সংস্করণ রচনাগুলিকে নবরূপ দান করেছিল, যা তাদের প্রথম সংস্করণগুলির থেকে সম্পূর্ণ অন্য রচনায় পরিণত করেছে। প্রথম সংস্করণে 'ইন্দিরার' পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল মাত্র ৪৫, অথচ পঞ্চম সংস্করণে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৭৭ পৃষ্ঠায়। রাজসিংহ প্রথম সংস্করণ ছিল মাত্র ৮৭ পৃষ্ঠার, চতুর্থ সংস্করণে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪৩৪ পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ পাঁচগুণ বর্ধিত হয় তার কলেবর। সীতারামের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ভিন্ন রূপ নেয়। ১৮৮৭ তে প্রকাশিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল ৪১৯, আর ১৮৮৯ তে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণে পৃষ্ঠা সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ৩০০ পৃষ্ঠায়। ১৮৯৪ তে প্রকাশিত 'সীতারামের' তৃতীয় সংস্করণ এই দ্বিতীয় সংস্করণেরই পুণর্মুদ্রণ-জাতীয়। সুতরাং, যথার্থ বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস হিসাবে 'রাজসিংহের' চতুর্থ সংস্করণকেই গণ্য করা উচিত, কেননা এই সংস্করণে রাজসিংহের যে রূপ পাওয়া যায়, তা প্রথম সংস্করণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর যে একটিমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার কথা স্বীকার করেছেন, তাও এই চতুর্থ সংস্করণটিই। অতএব, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কালানুক্রমিক তালিকায় প্রথম স্থান 'দুর্গেশনন্দিনীর' ও শেষ স্থান চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহের'।

॥ ৬ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশের রূপরেখাটি অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির রচনাগত ও প্রকাশগত কালানুক্রমিকতাকে সর্বক্ষেত্রে মেনে চলবো না। আমাদের যাত্রাপথে অল্পস্বল্প পরিবর্তনের অবকাশ আছে, কেননা, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগত বৈশিষ্ট্য ও জীবনদৃষ্টিগত ক্রমবিকাশের সূত্রটিই হবে আমাদের বিচারের পথরেখা। আমাদের যাত্রা শুরু হবে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনীর' কল্পসৌন্দর্যের ধূসর জগৎ থেকে ক্রমশ 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' সমাজ-পরিবার-নির্ভর বাস্তবতার স্পষ্টতায়, তারপর 'আনন্দমঠ'-'দেবী চৌধুরাণী'-'সীতারামে'র আধ্যাত্মিক আদর্শানুসন্ধানের সরণি বেয়ে শেষ পর্যন্ত 'রাজসিংহের' আদর্শলোকে। পরিভাষায় বলতে গেলে বলা যায় যে, বঙ্কিমী উপন্যাসে রোমান্সের নায়ক ক্রমে ট্র্যাজেডির নায়কের রূপ পরিগ্রহ করে, ক্রমশ আধ্যাত্মিক নায়কের পর্যায় থেকে আদর্শ নায়কের ধ্যানরূপটিকে বাস্তবক্ষেত্রে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। 'ইন্দিরা' ঠিক এই পরিক্রমাপথে স্থান পায় না, কেননা, 'ইন্দিরা' আনুপূর্বিক কমেডির

লক্ষণাক্রান্ত, আর কমেডিতে কোন একটি বা দুটি চরিত্র কখনোই তেমন প্রাধান্য লাভ করতে পারে না, যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রেরণা ও কর্ম ছাড়া কাহিনী অচল হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ, কমেডিতে যাকে নায়ক বা Hero বলে, তার উপস্থিতি সাধারণভাবে অপ্রাপণীয়।[৬] 'রাধারাণী' বা 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসপদবাচ্য নয় বলে, এর ভূমিকা বঙ্কিমউপন্যাসের নায়ক চরিত্র বিশ্লেষণ ও তার বিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক নয়।

॥ ৭ ॥

'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সার্থক উপন্যাস। শুধু বঙ্কিমচন্দ্রেরই নয়, বাংলা সাহিত্যেরও এটি প্রথম সার্থক উপন্যাস। গল্প কথনের সনাতন-রীতির পরিবর্তে নাটকীয় উপস্থাপনা, পূর্ববর্তী রচনার তুলনায় চরিত্রচিত্রণে বহুলাংশে পরিণতির স্বাক্ষর, নারীচরিত্রের স্পষ্টতর চিত্রায়ণ, অতিনিরূপিত সম্পর্কের বাইরে নরনারীর স্বাধীন হৃদয়ভাবের উচ্চারণ, ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার রসপরিবেশন এবং আঙ্গিকের একটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনায় বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী তার আবির্ভাবকালেই বাঙালী পাঠকের মনোহরণ করতে সমর্থ হয়েছিল। মোগল-পাঠানের ঐতিহাসিক বিরোধের পটভূমিকায় নরনারীর প্রেম-প্রতি-হিংসা, ঈর্ষা-সন্দেহের বিচিত্র প্রসঙ্গ এই উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। রাজপুতরাজ মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ এই উপন্যাসের নায়ক, শুধু এই উপন্যাসেরই নয়, বাংলা উপন্যাসের প্রথম নায়ক জগৎসিংহ। পূর্ববর্তী আলালের ঘরের দুলালের মতিলালের তুলনায় তার নায়ক লক্ষণ বহুলাংশে পূর্ণতর। মতিলাল লেখকের উদ্দেশ্য প্রচারের উপায় মাত্র, তাই ধনীগৃহের অত্যধিক আদরের বিপথগামী যুবকের type চিত্র। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ববোধ উপন্যাসের চরিত্রকে সজীব করে তোলে, মতিলালে তার বিন্দুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে জগৎসিংহ সংস্কৃত কাব্য-নাটক ও পাশ্চাত্ত্য রোমান্স ও ট্র্যাজেডির নায়কদের উত্তরাধিকার চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করেই সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে।

নায়ক হিসাবে জগৎসিংহের বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে দেখানো চলে,—

(ক) জগৎসিংহ রাজপুত্র, বীর, সদ্বংশজাত, তার পিতা মানসিংহ, সে নিজে মোগল পাঠানের এই যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পেয়েছে। তার দুঃসাহস ও বীরত্ব আখ্যানে প্রমাণিত, বিশেষ করে গড় মান্দারনে পাঠান সৈন্যের সঙ্গে একাকী সম্মুখযুদ্ধে তার বীরত্ব ও অকুতোভয়তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত।

(খ) জগৎসিংহ প্রেমিক, নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রমশীল, একনিষ্ঠ। শৈলেশ্বর মন্দিরে দুর্যোগের রাত্রে মুহূর্তের দর্শনেই সে তিলোত্তমাকে হৃদয় অর্পণ করেছে। এই প্রেমানুভূতি তার সমস্ত কর্মধারাকে পরিচালিত করেছে। এরই শক্তি তাকে দুঃসাহসী করেছে। নারীজাতির প্রতি সম্ভ্রমবোধ ও শরণাগতের রক্ষা তার চরিত্রে একটি নতুনতর মাত্রা যোজনা করেছে। ইংরেজি রোমান্স-এর নায়ক-চরিত্রের সমধর্মিতা বেশি পরিমাণে এই চরিত্রে প্রকাশ পেয়েছে।

(গ) নানা ধরণের গুণ ও আদর্শের সমবায়ে গঠিত জগৎসিংহ চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা আত্মজিজ্ঞাসার অবকাশ অত্যন্ত কম; নেই বললেই চলে। তিলোত্তমাকে অপ্রাপণীয়া জেনেও সে তার প্রতি সমুৎসুক হয়েছে, অথচ হৃদয়-মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়নি। এই লক্ষণ সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে আয়েষার ঐকান্তিক প্রেমনিবেদনের প্রত্যাখ্যানে ও দিগ্‌গজের মুখে তিলোত্তমার কলঙ্ককথা শুনে কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ ছাড়াই হৃদয়-মন্দির থেকে তিলোত্তমার 'প্রতিমা বিসর্জনে'। একদিকে যেমন স্বল্প সাক্ষাতেই সে তিলোত্তমার প্রতি গভীর ও সুদৃঢ় প্রেম অনুভব করেছে, অন্যদিকে তেমনি আয়েষার দীর্ঘ সাহচর্য ও ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও সে আয়েষার প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ বোধ করেনি। এর মধ্যে তিলোত্তমার প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শময়তা দেখা গেলেও, এটি যথাযথ মানবিক লক্ষণাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। আর তিলোত্তমার প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রেও এই একই আচরণ পরিলক্ষিত হয়; জগৎসিংহ ঘুম থেকে উঠে, স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়েই প্রতিমা বিসর্জনের ব্যাপারটি সমাধা করেন। সঙ্গত কারণেই এখানে দুটি সদৃশ ঘটনার প্রতিতুলনা এসে পড়ে। 'আইভ্যান হো' তে উইলফ্রেড যে তার শুশ্রূষাকারিণী রেবেকাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, তা তাকে ইহুদী হিসাবে জেনে প্রখর ইহুদীবিদ্বেষের ফলেই; কিন্তু যবনকন্যা আয়েষাকে জগৎসিংহ অনুরূপ কারণে প্রত্যাখ্যান করেনি বা তার মধ্যে যবনবিদ্বেষও কোথাও দেখানো হয় নি। আর ডেসডিমোনাকে শুধু অবিশ্বাস করার আগেই নয়, হত্যা করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ওথেলোর সমস্ত অন্তঃকরণ দ্বিধায় দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত ও জর্জর হয়েছিল।

(ঘ) আসলে 'দুর্গেশনন্দিনীর' জগৎ সিংহের মধ্যে খাঁটি নায়কের লক্ষণ অনুসন্ধান না করাই ভালো। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে 'গোলে-বকাওলি' বা 'বিজয়বসন্তের' স্বাদে পরিচিত বাঙালী পাঠকের কাছে নতুন

ধরণের আখ্যানবস্তু পরিবেশন করতে চেয়েছেন। সমকালীন পাঠক-মানসের প্রতিক্রিয়া থেকে জানতে পারা যায় যে, 'দুর্গেশনন্দিনীর' গল্প মোটামুটি সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরেজিনবীশ—উভয়শ্রেণীর পাঠকেরই তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয়েছিল। মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত কিংবা পুরাণ অথবা মুসলমানী গল্প কাহিনীর অভ্যস্ত আসরে সহসা এই ধর্মনিরপেক্ষ, মানবভৌম, সেকুলার কাহিনীর আবির্ভাব সমগ্র দেশবাসীকে সচকিত করে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সাহিত্যিক মনোভাবও ছিল এই নতুন আখ্যান রচনার প্রতি অভিনিবিষ্ট। 'জীবন লইয়া কি করিব' এই গভীর তত্ত্বজিজ্ঞাসু বঙ্কিম এই পর্বে আত্মপ্রকাশ করেননি; তাই তাঁর কাহিনীর নায়কও কোন গভীর ট্র্যাজিক চারিত্র অথবা আদর্শ ব্যক্তিত্ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি। মোটামুটিভাবে প্রচলিত রীতি ও বিশ্বাসই জগৎসিংহের চরিত্র পরিকল্পনার নেপথ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। সংস্কৃত কাব্য-নাটকের নায়ক, রূপকথার রাজপুত্র নায়ক ও ইংরেজি রোমান্সের নায়কের আদর্শের সম্মিলনে ও সন্নিপাতে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনীর' নায়ক জগৎসিংহকে গড়ে তুলেছেন। এই কারণেই এই চরিত্রটি আধুনিক সমালোচকের পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। চরিত্রটি সম্পর্কে তাই বিরূপ মন্তব্য করে বলা হয়েছে—"জগৎসিংহ নববিবাহিত বাঙালী যুবক প্রেমিকদের মতোই রঙচটা ও ব্যক্তিত্ববিহীন।"[৭] এই একই ধারণার অনুবর্তী হয়ে অপর একজন সমালোচক বলেছেন যে "একথা বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থের নায়ককে নির্দোষ চরিত্র হইতে হইবে, এমন কোন বিধি নাই।"[৮] এক্ষেত্রে উভয় সমালোচকই ট্র্যাজেডির নায়কের আদর্শে জগৎসিংহের বিচার করতে গিয়ে এই ধরণের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নায়ক বিচারে এমন কঠোর মানদণ্ড গ্রহণ করা কতটা যুক্তিযুক্ত, তা চিন্তার অবকাশ রাখে। যেখানে লেখক ট্র্যাজেডির কোন আদর্শকেই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত করতে মনস্থ করেননি, সেখানে সেই আখ্যানের নায়ককে ট্র্যাজিক নায়কের আদর্শে বিচার করা সঠিক হবে না। জগৎসিংহ বঙ্কিমের প্রথম নায়ক, বাংলাসাহিত্যের প্রথম নায়ক, মধ্যযুগীয় সাহিত্য ও মুসলমানী কিস্‌সা থেকে পৃথক, প্যারীচাঁদের মতিলালের থেকে বহুলাংশে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সক্রিয় এবং আখ্যান পরিচালক। তবে, এখনো পর্যন্ত উপন্যাস চরিত্রে যথার্থ ব্যক্তিলক্ষণ তার অনায়ত্ত, কিছুটা টাইপধর্মী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সে সম্পূর্ণ ও পরিণত নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণতার বিলোপ ঘটিয়ে আগামী পরিপূর্ণতার ইঙ্গিতবাহী। বঙ্কিমচন্দ্রের নতুনরীতির

আখ্যানের নতুন নায়ক, বাঙালী পাঠকের চেতনায় নতুন অভিজ্ঞতার আলোকসম্পাত।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক নবকুমার চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে জগৎসিংহেরই প্রায় সমানধর্মী, তবে, নবকুমারের মধ্যে অনেকটা ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। জগৎসিংহ যেখানে প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের জগৎ থেকে আগত, নবকুমারের আবির্ভাব সেখানে অপেক্ষাকৃত বাস্তবতর সামাজিক প্রতিবেশ থেকে। জগৎসিংহের চরিত্র-পরিকল্পনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাই অনেকটাই গতানুগতিকতার দ্বারা পরিচালিত, কেন না, মধ্যযুগের রাজবংশীয় যুবাচরিত্রের অঙ্কনে তিনি অধীত বিদ্যার সাহায্য নিয়েছেন। যে বিদেশী আখ্যানের আদর্শে তিনি বাংলা নভেলের সূচনা করেছেন, প্রথম বাংলা আখ্যানের নায়কের চরিত্র-পরিকল্পনায় সেই রীতি-আদর্শকেই তিনি বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন। কিন্তু নবকুমারের চরিত্র-পরিকল্পনায় বঙ্কিম অনেক বেশি পরিমাণে আপন উনিশ শতকীয় মানসিকতা ও যুগবৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছিলেন। বাংলা উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র জীবনবোধ ও মনুষ্যত্ববোধের যে বিশিষ্ট ভাবনাটি অতঃপর ব্যক্ত করতে উদ্যত হয়েছিলেন, নবকুমার চরিত্রে তার অপরিণত ও প্রচ্ছন্ন আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নবকুমারের চরিত্রে প্রথাসিদ্ধ নায়কলক্ষণের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিগতগুণেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। তার সৌন্দর্যবোধ, কৃতজ্ঞতা বোধ, পরোপচিকীর্ষা, প্রেম, সন্দেহপ্রবণতা, একনিষ্ঠতা, আত্মবিসর্জন কামনা, সব কিছুর মধ্য দিয়েই তার ব্যক্তিত্বের একটি ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট রূপ ধরা দিয়েছে। বিশেষ করে উপন্যাসের প্রথমার্ধে নবকুমারকে আধুনিক যুগের প্রতিভূ বলেই বোধ হয়। সমুদ্র দর্শনে তার চিত্তের বিপুল আনন্দ, কালিদাসের শ্লোকোদ্ধার ও বৃদ্ধের সঙ্গে কথোপকথনে তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে মনোভাব যথেষ্ট পরিমাণে আধুনিক চিন্তাপ্রসূত। স্মরণীয় যে, নবকুমারের এই মনোভাব অষ্টাদশ শতকীয় রামপ্রসাদী অধ্যাত্ম ভাবনার রোমন্থনমাত্র নয়, এটি উনিশ শতকীয় প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগবাদ, হিতবাদের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা বঙ্কিমমানসেরই আত্মপ্রকাশ। আবার কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের প্রথম সাক্ষাৎ ও তজ্জনিত প্রেমোন্মেষ গতানুগতিক রোমান্টিক প্রেমদৃশ্যের সমধর্মী নয়। তিলোত্তমা-জগৎসিংহের প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্যের সঙ্গে তুলনা করলেই এর মৌলিকতা ও অসাধারণত্ব ধরা দিতে দেরী করে না। দিগন্ত ব্যাপী অকূল সমুদ্র, বিস্তৃত সৈকত ভূমি, নিবিড় অরণ্যানী, নিঃসঙ্গতা নবকুমারের সৌন্দর্যপীড়িত চেতনায় যে একটা বিশেষ

আবেগের সৃষ্টি করেছিল, কপালকুণ্ডলা যেন সেই প্রাকৃতিক পরিবেশেরই মানবী সংস্করণ। সুতরাং, এই বিশেষ পরিবেশে যে প্রথম দর্শনজনিত প্রেম, তা শুধুমাত্র মানব মানবীর পারস্পরিক আকর্ষণই নয়, বরং একে এক সৌন্দর্য-মুগ্ধ মানব হৃদয়ের মুহূর্তের প্রতিবিম্বে জননান্তর সৌহৃদানিই বলা চলে। অথচ, এই রোমান্টিক সৌন্দর্যলক্ষ্মী যে অপ্রাপণীয়া, উনিশ শতকীয় এই বোধ বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সদা জাগরূক ছিল। তাই বনফুলকে গৃহাঙ্গনে রোপন করে নবকুমার তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না, এই বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনাই নবকুমার চরিত্রের প্রাণ। সাধারণভাবে দেখা যায় যে, সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত নবকুমার চরিত্রে যে শক্তি ও দার্ঢ্য দেখা যায়, বিবাহান্তে সপ্তগ্রামে প্রত্যাবর্তনের পর তা অনেকাংশেই লুপ্ত হয়ে গেছে। এর মূলে সমাজ-পরিবার-গত যে প্রভাবই ক্রিয়াশীল থাক না কেন, উনিশ শতকীয় নবজাগ্রত রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধই মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল বলে মনে হয়। কল্পলোকে যে সৌন্দর্য-মূর্তি অনায়াসে ধরা দেয়, বাস্তবতায় তার প্রতিষ্ঠা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে। তাই কাপালিকের আশ্রয়ে কিংবা নির্জন সমুদ্রতীরে নবকুমার যে কপালকুণ্ডলাকে অকুণ্ঠভাবে গ্রহণ করেছিল, সামাজিক জীবনে তাকে নিয়ে তার মনে কোথায় যেন কিছুটা কুণ্ঠা ছিল। অধিকারীর গৃহে বিবাহ-প্রস্তাবে নবকুমার যে প্রথমে কিছুটা দ্বিধা করেছে, তারও মূল এইখানে। অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে বঙ্কিম এই দ্বিধার একটা সঙ্গত সমাজনির্ভর মানসিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নায়ক চরিত্রাঙ্কনে কিছুটা আধুনিক রীতি গ্রহণ করেছেন। নবকুমারের মনে দ্বিধা ছিল যে, অজ্ঞাতকুলশীলা কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করে আপন সমাজে প্রত্যাবর্তন করলে, সমাজ তাকে গ্রহণ করবে কি না। সমাজের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যক্তি-জীবনের যে স্বাতন্ত্র্য গড়ে ওঠে, কপালকুণ্ডলাতেই বঙ্কিম তার প্রথম আভাস দিলেন। মনে রাখা দরকার, জগৎসিংহ তিলোত্তমার বিবাহের ক্ষেত্রে জগৎসিংহের মনে যে বাধা এসেছিল, তা ছিল প্রধানত দুটি পরিবারের বিবাদের সূত্র ধরে। তবে নবকুমার যে বঙ্কিমী ট্র্যাজিক নায়কের প্রথম সূচনা তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার চারিত্রিক উৎকর্ষ ও গভীর প্রেমানুভূতি এবং ব্যক্তিত্বের গোপন রন্ধ্রপথে সন্দেহের ক্ষীণ অথচ অসন্দিগ্ধ অবস্থিতি, ঘটনার পারম্পর্যে সন্দিগ্ধ মনের দুর্বলতা ও কাপালিকের সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ এবং কারণবারি সেবন সব মিলিয়ে নবকুমারের চরিত্রে এক ধরণের দুর্বলতার সৃষ্টি করেছিল, যা সমস্ত ট্র্যাজিক নায়কেরই আসন্ন পতন আভাসিত করে থাকে। প্রথম সংস্করণে

বঙ্কিম নবকুমারকে গঙ্গাবক্ষ থেকে উদ্ধার করেছিলেন, কিন্তু তাতে নবকুমারের চরিত্রের ভরাডুবি ঘটেছিল। পরবর্তী সংস্করণে অনন্তসমুদ্র মধ্যে কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারেরও অন্তর্হিত হওয়া তার চরিত্রটিকে একটি সম্পূর্ণতা দিয়েছে। নবকুমার চরিত্রে বঙ্কিম সর্বপ্রথম গতানুগতিক প্রথার বাইরে ব্যক্তিত্ব সচেতন নায়ক-চরিত্র সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। যদিও এখানে তাঁর কল্পনায় নায়কের পুরো রূপটি ধরা পড়েনি, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে জগৎসিংহ থেকে নবকুমার, বঙ্কিমী-নায়ক-চিন্তা ও রূপায়ণে অনেকটা পরিণত রূপ পরিগ্রহ করেছে।

জগৎসিংহের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও বীর্যবত্তা, নবকুমারের মধ্যে সৌন্দর্য-পিয়াসী সংস্কারমুক্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব সঙ্কুল ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ, 'মৃণালিনীর' নায়ক হেমচন্দ্রের পর্যায়ে আরো একটি নতুন তাৎপর্যে বিশিষ্টতা লাভ করলো। হেমচন্দ্র জগৎসিংহেরই পরিণত সংস্করণ, তবে তার চরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্র একটি নতুন মাত্রা যোজনা করেছেন। হেমচন্দ্র বীর, প্রেমিক, উদারচেতা এবং দেশপ্রেমিক। এই শেষোক্ত লক্ষণটিতে হেমচন্দ্র বঙ্কিমী উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। বক্তিয়ার খিলজী কর্তৃক গৌড়বিজয়ের ঐতিহাসিক ঘটনাটিই 'মৃণালিনী' উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য বিষয়; স্বভাবতই বাঙালীর কলঙ্ক-মোচনের যে চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের মনকে দীর্ঘদিন ধরে পীড়িত করে এসেছিল, এই উপন্যাসে লেখক তার প্রতিই নিবদ্ধচিত্ত ছিলেন। এজন্য চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে এখানে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। গল্পের নায়ক হেমচন্দ্র আদর্শ নায়কের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘটনায় বা চারিত্রিকতায় তার কোন স্পষ্ট প্রমাণ বা উল্লেখ নেই। এজন্যই চরিত্রটি সমালোচক মহলেও বেশ কিছুটা দ্বিধার সৃষ্টি করেছে। বঙ্কিমী উপন্যাসের দুই বিশিষ্ট সমালোচক হেমচন্দ্র চরিত্র সম্পর্কে একেবারে ভিন্নধর্মী মত প্রকাশ করেছেন।[৮] আমরা অবশ্য দুইয়ের মাঝামাঝি একটি মতেরই অনুগামী। বঙ্কিমচন্দ্রের 'প্রথম তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমের যে শিল্পবুদ্ধি ও আত্মপ্রকাশ-ক্ষমতা ধীরে ধীরে অবয়ব গ্রহণ করছিল, এই তিনটি রচনার নায়কের মধ্য দিয়ে বঙ্কিম তারই একটি স্পষ্ট রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। আবার, এই চিত্রাঙ্কনে তাঁর চেতনায় সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল থেকেছে তাঁর নতুন কাল ও যুগমানস। এ প্রসঙ্গে জনৈক সমালোচকের মত উদ্ধারযোগ্য:—

'দুর্গেশনন্দিনী'তে পাই যুগোচিত যোগ্য একটি সুঠাম সুন্দর মানবিক কাহিনী, কপালকুণ্ডলায় পাই যুগদৃষ্টিতে উদ্‌ভাসিত প্রকৃতির এক ভয়াল মনোহর

তাৎপর্যপূর্ণ রূপ, আর মৃণালিনীতে পাই যুগমানসের এক অভিনব আত্ম প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা।[১০]

মুখ্যত ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাসে যে নতুন যুগচেতনাকে আত্মস্থ করতে চেয়েছিলেন, তার প্রধান অবলম্বন ছিল রচনা তিনটির নায়কচরিত্র, কেননা, নায়কের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ প্রবর্তনাতেই আখ্যায়িকা দানাবেঁধে উঠতে পারে। এই উপন্যাসগুলি শিল্পী ও কবিস্বভাব বঙ্কিমচন্দ্রের শক্তিসঞ্চয়ের অনুশীলন ক্ষেত্র; পরবর্তী বৃহত্তর সমাজবোধ ও দার্শনিক চিন্তাভাবনার ভূমিকাস্থানীয়। প্রথম তিন নায়কের চিত্রায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবী নায়কচরিত্রের পূর্বাভাস; কেননা, পরবর্তী সমগ্র বঙ্কিমী-নায়ক রূপ ও সৌন্দর্যমুগ্ধ, আধুনিকমনা বীর্যবান ও দেশপ্রেমিক; কিন্তু সেটুকুই তাদের শেষ কথা নয়, তা ছাড়াও তারা একটি আদর্শ মনুষ্যত্বের ধ্রুবলোকের জন্য সন্ধিৎসু। সেই পরম প্রার্থিত স্তরে পৌছাবার সাধনাই বঙ্কিম উপন্যাসের ক্রমবিকাশের পথরেখা; প্রথম তিনটি নায়ক তারই সুদৃঢ়ভিত্তি। স্বতন্ত্রভাবে জগৎসিংহ, নবকুমার ও হেমচন্দ্র পরিপূর্ণ সাফল্যের অধিকারী হতে না পারলেও, তাদের মধ্যেই বীজাকারে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত নিহিত আছে। জগৎসিংহের প্রেম ও বীরত্ব. নবকুমারের পরোপচিকীর্ষা, সৌন্দর্যচেতনা ও আত্মদ্বন্দ্ব, হেমচন্দ্রের দেশপ্রাণতা—বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক চেতনাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। পরবর্তী স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়করা এদেরই উৎস থেকে আত্মপ্রকাশ করে তাদের যাত্রা শুরু করেছে।

॥ ৮ ॥

বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এবং পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলা চলে যে, এই সময় থেকেই বঙ্কিম-সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট পথ পরিবর্তন ঘটলো। শিল্পী ও কবিস্বভাব বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্ব থেকেই ক্রমশঃ দেশ-জাতি সমাজ ও দর্শনের গভীরে ডুব দিয়ে মানবজীবনের রহস্যভেদে প্রবৃত্ত হলেন। যদি বলা যায় প্রথম তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্প-সাধনার ভিত্তি স্থাপনা করেছেন, তবে বলতে হয় যে, বিষবৃক্ষ থেকেই তাঁর উপন্যাসে যথার্থ পরিণতির সূচনা হয়। প্রথম তিনটি উপন্যাস ইতিহাসের সুদূর পটভূমিকায় সংস্থাপিত বলে, মানজীবনের সঙ্গে

পারিপার্শ্বিক সমাজের সম্পর্ক কিছুটা ক্ষীণ। অথচ পারিপার্শ্বিক সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সূত্রে মানবজীবনের যথার্থ স্বরূপ সন্ধানই ঔপন্যাসিকের একমাত্র অন্বিষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র যে জীবনের অর্থানুসন্ধানকে তাঁ সাহিত্য-সাধনার মৌলিক প্রেরণা ও উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁর প্রথম তিনটি উপন্যাসে যথাযথ আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজে পায়নি। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাস এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি। এ ছাড়া বঙ্কিমী উপন্যাসের নায়ক-পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও 'বিষবৃক্ষ' অসীম গুরুত্বপূর্ণ; কেননা, এই পর্ব থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত মানুষের অনুসন্ধান যথার্থভাবে শুরু হয়েছে।

জগৎসিংহ, নবকুমার ও হেমচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম তিন নায়ক চরিত্র সংস্কৃত কাব্য নাটক ও ইংরেজি রোমান্সধর্মী আদর্শ অবলম্বনে পরিকল্পিত। চরিত্রগুলির বীরত্ব, সৌন্দর্যস্পৃহা, প্রেমবোধ, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ—সমস্ত কিছুই ইংরেজি রোমান্সের শিভ্যালরির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু যথার্থ ট্র্যাজিক চেতনা ও ট্র্যাজিক মহিমা এই চরিত্রত্রয়ীর মধ্যে দুর্লক্ষ্য। হয়তো নবকুমারের সমগ্র জীবনকাহিনীতে ট্র্যাজিক বিষণ্ণতার একটি ক্ষীণ স্বর শ্রুত হয়েছে, তবুও যাকে যথার্থ ট্র্যাজিক নায়ক বৈশিষ্ট্য বলা যায়, বঙ্কিম সাহিত্যে 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্রনাথই তার সফল উদাহরণ। এরিস্টটলের কাল থেকে আজ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির নায়কচরিত্রের যে বিশিষ্ট রূপ চেতনা বিবর্তিত হয়ে এসেছে নগেন্দ্র তারই আলোকে উদ্ভাসিত চরিত্র। নগেন্দ্র চরিত্রের ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে বিন্যস্ত করা চলে,

(ক) ট্র্যাজেডির নায়কের যে flaw বা ত্রুটি ঘটে human passion বা মানবিক বাসনা কামনার সূত্র ধরে, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রচরিত্রে তারই প্রকাশ দেখা যায়। অনিন্দ্য-চরিত্র নগেন্দ্রের পদস্খলনের বিষয় নিয়ে বিষবৃক্ষ রচিত এবং কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপজমোহের মানবিক কামনাবাসনা-জনিত ত্রুটিই এই পদস্খলনের মৌল কারণ।

(খ) ট্র্যাজেডির নায়কের ক্ষেত্রে অপর একটি প্রচলিত সূত্র 'The hero swayed by two ladies', অর্থাৎ দুই নারীর বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হওয়ার বৈশিষ্ট্যটিও 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্র চরিত্রে পরিস্ফুট হয়েছে। এই দ্বিমুখী আকর্ষণের একদিকে থাকে duties বা কর্তব্যনিষ্ঠা, অন্যদিকে থাকে passion ও desire বা বাসনা ও কামনা। ব্যক্তিত্বশালী নায়ক এই দুই আকর্ষণে বিক্ষত হয়ে ক্রমশ তার শোচনীয় পরিণামের দিকে অগ্রসর হয়ে থাকে।

একদিকে বিবাহিতা পত্নী সূর্যমুখী ও অন্যদিকে বিধবা কুন্দনন্দিনী—এই উভয় আকর্ষণে নগেন্দ্র বিক্ষত হয়েছে। সূর্যমুখীর প্রতি আকর্ষণ কর্তব্যের সীমায় পড়ে। বঙ্কিম যার নাম দিয়েছেন গুণজ মোহ, কুন্দনন্দিনীর প্রতি আকর্ষণ বাসনা-তাড়িত, বঙ্কিমী ভাষায় 'রূপজ মোহ'।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক চরিত্রের বিচারে কেবলমাত্র গ্রীক নাটক, এরিস্টটলের নাট্যতত্ত্ব, কিংবা শেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ অবলম্বন করলেই তা যথার্থ পথ ধরতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্রের মানসভূমিতে এই প্রাক্তন ঐতিহ্যের বিপুল উত্তরাধিকার সুপ্রচুর ভাবে স্বীকৃত হলেও, বঙ্কিমী-নায়কভাবনায় উনিশ শতকীয় যুগ ও সমাজের যুগন্ধর পুরুষের নিজস্ব দার্শনিক মনোভঙ্গিটিও সমপরিমাণে কার্যকর ও গুরুত্বময়। মানবজীবনের যে চরম অর্থ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনজিজ্ঞাসাকে বারবার উত্তেজিত করেছে, উপন্যাসের নায়ক-পরিকল্পনায় বারে বারে বঙ্কিম তারই উত্তর খুঁজে ফিরেছেন। এইজন্য তাঁর উপন্যাসের ট্র্যাজিক-নায়ক ও আদর্শ-নায়ক বারে বারেই আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে, কখনো তা দুই চরিত্রের রূপে, কখনো বা একই চরিত্রের দ্বৈত-মানসিকতায়।

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ সৃষ্টি বিষয়-ভাবনা ও নায়ক-পরিকল্পনায়। "বিষবৃক্ষে" বঙ্কিমের সাহিত্যশিল্প পরিণত রূপে দেখা দিল। ঘরোয়া প্রণয়কাহিনী রোমান্সের বস্তু হইল, পাত্রপাত্রীর প্রণয়লীলায় সংঘর্ষ দেখা দিল এবং উপন্যাসের গতি এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইল।"[১১] একদিকে ঘরোয়া নর নারীর প্রণয়-ব্যাপার ও অন্যদিকে প্রণয়-ব্যাপারে সংঘর্ষ—এই দুই দিক দিয়েই পূর্ববর্তী তিন উপন্যাস থেকে 'বিষবৃক্ষ' স্বতন্ত্র এবং এই স্বাতন্ত্র্যই তাঁর সাহিত্য-শিল্পের পরিণতির চিহ্ন বহন করে। এই উভয় বিষয়েই বঙ্কিমের প্রধান অবলম্বন তাঁর বিশিষ্ট নায়ক চরিত্র, কেননা, ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কেন্দ্রীয় পরিচালিকা শক্তির উৎস সে-ই। বিবাহিত ও দাম্পত্যজীবনে সন্তৃপ্ত অনিন্দিত চরিত্র নগেন্দ্র অনাথা কুন্দনন্দিনীর প্রতি রূপমুগ্ধতা হেতু উপন্যাসে যে সমস্যার সৃষ্টি করেছেন, তার প্রভাবজনিত সংঘর্ষই উপন্যাসটির প্রাণবস্তু। কিন্তু এই সংঘর্ষ কেবলমাত্র বাইরের দিক থেকেই আসেনি; শুধুমাত্র দেবেন্দ্র, হীরা বা সূর্যমুখীর প্রতিকূল তটেই এই প্রবল প্রণয়াবেগ প্রতিহত হয়নি, স্বয়ং নগেন্দ্রের অন্তকরণের মধ্যেও এই প্রণয় একটি বিষম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। হরদেব ঘোষালকে লেখা নানা পত্রে নগেন্দ্রের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপটি যথাসম্ভব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। অন্তরে ও বাহিরে প্রতিনিয়ত সংঘর্ষের আবেগ নগেন্দ্র চরিত্রকে তার ঈপ্সিত পরিণামের

দিকে ছুটিয়ে নিয়ে গেছে। রূপজ ও গুণজ মোহের এই ছুটি প্রান্তে আন্দোলিত ও আহত হয়ে নগেন্দ্রনাথ তার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পরিণতি লাভ করেছে। নগেন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম নায়ক যার মধ্যে সারস্বত আদর্শের পরিবর্তে মানবিক জীবনোচ্ছ্বাসই প্রাধান্য পেয়েছে। রক্ত মাংসের সজীব মানুষ, তার মানসিক দোষত্রুটি নিয়েই জীবনের বাস্তব পরিমণ্ডলে, নগেন্দ্রই বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম ভূমিষ্ঠ হয়েছে। জগৎসিংহ, নবকুমার বা হেমচন্দ্র তাই বঙ্কিমী নায়কের প্রতিনিধি-স্থানীয় নয়। নগেন্দ্রনাথই তাঁর প্রথম মানসসন্তান, মানবজীবন জিজ্ঞাসার উপায়, জীবনানুসন্ধানের সুস্পষ্ট পথরেখা।

কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সামাজিক উদ্দেশ্যমূলকতা অতিপ্রকট বলে তার চরিত্রায়ণেও বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুটা দ্বিধা ফুটে উঠেছে। তাই নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে 'বিষবৃক্ষে' দেবেন্দ্র-চরিত্রও যথেষ্ট গুরুত্ব পেয়েছে এবং উপন্যাসের গঠন-পরিকল্পনার প্রতি লক্ষ্য রাখলে একটি প্রশ্ন স্বতই মনে জেগে ওঠে যে, বিষবৃক্ষের প্রকৃত নায়ক কে,—নগেন্দ্র না দেবেন্দ্র? ঘটনার সামগ্রিক বিচারে নগেন্দ্রের নায়কত্ব অবিসংবাদিত হলেও, লেখকের উদ্দেশ্য-সচেতনতা দেবেন্দ্রের মধ্যে উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ভাবনার পরিপোষণ খুঁজে পেয়েছে। তাই কুন্দের মৃত্যু-ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাসের পরিসমাপ্তি না টেনে তিনি শেষ পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্র ও হীরার পরিণতি দেখিয়েছেন। দেবেন্দ্র অতিশয় পাপিষ্ঠ সন্দেহ নেই, তবু সাহিত্যের বিচারে সে নগেন্দ্র অপেক্ষা উজ্জ্বলতর। সে গুণে ইয়াগো বা লেডি ম্যাকবেথ পাপিষ্ঠ হয়েও সাহিত্যের শাশ্বত লোকের অধিবাসী, সেই গুণে দেবেন্দ্র গুণান্বিত। সমালোচক নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র চরিত্র সম্পর্কে তাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন,—"নগেন্দ্রের ভূমিকা অপরিস্ফুট। তাহার তুলনায় দেবেন্দ্র ব্যক্তিত্বশালী, [লেখকের উদ্দেশ্যমূলকতা এই চরিত্রটিকে শিল্প পরিণতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে]।"[১২] নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র উভয়েই বিষবৃক্ষের বীজ বপন করেছিল এই উপায়ে অর্থাৎ রূপমুগ্ধতার মাধ্যমে। উভয়ের বীজই অঙ্কুরিত, মঞ্জরিত ও পল্লবিত হয়েছিল, উভয়কেই তার জন্য কঠিন ও চরম মূল্য দিতে হয়েছিল; কিন্তু নগেন্দ্রের মধ্যে স্বাভাবিক আদর্শবাদিতার প্রাধান্য হেতু তার চরিত্র অপেক্ষাকৃত দ্বন্দ্বহীন হয়েছে বা পরিণাম অপেক্ষাকৃত কম শোচনীয় হয়েছে। কুন্দকে বিবাহ, সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ, 'সকল সুখেরই সীমা আছে'—নগেন্দ্রের এই চরম আত্মোপলব্ধি ও কুন্দের প্রতি বিতৃষ্ণা ও সূর্যমুখীর প্রতি দ্বিগুণিত ও অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণবোধ নগেন্দ্র চরিত্রে যথোচিত আন্তরিক ও বহিরঙ্গ

সংঘর্ষের জটিল আবর্ত রচনা করলেও তার পরিণাম বেশ সাদামাটা। পরিণামে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে যে সূর্যমুখীকে ফিরে পাওয়ার গভীর সুখের সাগরে কুন্দনন্দিনীর অকাল-মৃত্যু কোন গভীর তরঙ্গ তুলতে পেরেছিল কি না! এই প্রচ্ছন্ন সংশয় থেকেই রবীন্দ্রনাথ 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের প্রেরণা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু দেবেন্দ্রের ক্ষেত্রে বঙ্কিম তা করেন নি; তার 'বিষবৃক্ষ' ফলবান হয়ে যে বিষম বিপর্যয় ঘটিয়েছে, হীরা-দেবেন্দ্রের চরিত্রে বঙ্কিম তা বিস্তারিতভাবে দেখিয়েছেন। বরং সূর্যমুখীর সন্তৃপ্ত সান্নিধ্য অপেক্ষা হৈমবতীর সঙ্গে দেবেন্দ্রের অতৃপ্ত দাম্পত্যজীবন তার জীবনের মধ্যে যে শূন্যতা সৃষ্ট করেছিল, তার ছিদ্রপথে কুন্দের প্রতি রূপমোহ ও বাসনাবেগ অনেক বেশি মানবিক রূপে ধরা দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ট্র্যাজিক চরিত্র আঁকলেও বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়রের মত নিরাসক্ত স্রষ্টা ছিলেন না। যে নিরাসক্তি ও নির্মমতা ঔপন্যাসিকের প্রধান চরিত্রধর্ম, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শচেতনা তা থেকে তাঁকে বারে বারে স্খলিত করেছে। নগেন্দ্র ও দেবেন্দ্র—এই উভয় চরিত্রের পরিকল্পনায় বঙ্কিমী প্রতিভার এই বৈশিষ্ট্য ও সীমাবদ্ধতা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শুধু মানবজীবনের চিত্রায়ণই নয়, উনিশ শতকে নবজাগ্রত সমাজে ও জীবনে তার একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠাও ছিল বঙ্কিমের অন্যতম প্রধান প্রেরণা। তাই নগেন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপ্ত হলেও তা শেষ পর্যন্ত সংসারসীমায় মানিয়ে গেছে। পক্ষান্তরে দেবেন্দ্রের বিষবৃক্ষ ফলবান হয়ে তার সর্বাত্মক ধ্বংস সাধন করেছে। ট্র্যাজেডিতে নায়ক চরিত্রের যে সামগ্রিক রূপ সম্ভাবনা, তা দেবেন্দ্র চরিত্রেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রচ্ছন্নভাবে সম্ভাবনাময় ছিল, কিন্তু আদর্শনিষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র নগেন্দ্রকেই তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের প্রধান উপায় রূপে গ্রহণ করেছেন। তাই ব্যক্তিত্বশালী ও সম্ভাবনাময় হয়েও দেবেন্দ্র যথোচিত ফুটে ওঠেনি; আর নগেন্দ্র নায়ক হিসাবে লেখকের ট্র্যাজিকচেতনা ও আদর্শবোধ উভয়েরই প্রকাশ-ক্ষেত্র রূপে নির্দিষ্ট হয়েছে। কিন্তু বিষবৃক্ষ সম্বন্ধে একটা কথা সর্বদা স্মরণ রাখা দরকার যে, এই গ্রন্থেই বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথম তাঁর নিজস্ব পরিণত শক্তির সন্ধান পেয়েছেন এবং শেক্সপীয়রীয় ট্র্যাজেডির আদর্শ এখানেই সর্বপ্রথম অনুসৃত হয়েছে। বঙ্কিমের পরবর্তী নায়ক-পরিকল্পনার এটি সূত্রপাত এবং আদর্শবোধ ও শিল্পবোধের যুগ্ম তাৎপর্যে চিহ্নিত।

'বিষবৃক্ষে' যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের ট্র্যাজিক নায়কের প্রথম আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তেমনি বঙ্কিমের প্রথম আদর্শ নায়কের পদধ্বনি শোনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী ও নীতিবেত্তা; জীবনের রসরূপের নির্মাণ যেমন

তাঁর অবশ্যকৃত্য ছিল, জীবনের আদর্শরূপের অনুধ্যানও তেমনি তাঁর কর্তব্য ছিল। তাই, নবজাগ্রত উনিশ শতকের যুগপুরুষ রূপে তিনি আপন স্কন্ধে জীবনের আদর্শরূপ গড়ে তোলার গুরুভার গ্রহণ করেছিলেন। তাই শেক্সপীয়রের অনুরক্ত এই লেখক শেক্সপীয়রের মত নিরাসক্ত ছিলেন না। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সচেতন ইচ্ছার রূপটি বারে বারে অভিব্যক্ত হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবেই সেই ইচ্ছাটি সমাজ ও মানুষের হিতৈষণায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত হয়েছে। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসও বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এবং বঙ্গদর্শনের মতই তা সামাজিক আদর্শ ও কেন্দ্রসংহতির লক্ষ্যমুখী। যদিও ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট বক্তব্য মৃণালিনীর মতো এখানেও প্রকাশিত, তবুও সেটাই এই রচনার মুখ্য প্রতিপাদ্য নয়। লক্ষ্মণসেনের সময়ে বক্তিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ে বাংলার ইতিহাসের একটি অধ্যায়ের সমাপ্তি, ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক মীরকাশেমের কাছ থেকে বঙ্গবিজয় "চন্দ্রশেখরের" উপজীব্য। উভয় ক্ষেত্রেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন রাজকর্মচারী বিশ্বাসঘাতক, স্বার্থবুদ্ধিপরায়ণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী—পশুপতি ও গুরগন খাঁ। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত একাধিক প্রবন্ধে বঙ্কিমের এই ইতিহাসবোধ অভিব্যক্ত ও উপন্যাসে তা আখ্যাত। কিন্তু ইতিহাসের এই ভাবনাচিন্তার ওপরেও স্থান পেয়েছে বঙ্কিমের কাঙ্ক্ষিত মানস আদর্শপুরুষের অনুসন্ধান। চন্দ্রশেখর শর্মা এই আকাঙ্ক্ষিত চরিত্র ; পরবর্তী অনুশীলনতত্ত্বের পূর্বাভাস।[১৩]

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে চন্দ্রশেখর শর্মা প্রকৃত নায়ক হলেও, প্রতাপ কিংবা মিরকাশেমও নায়ক লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। বঙ্কিমের উপন্যাসে শিল্পবোধ ও আদর্শচেতনার যে দ্বন্দ্ব বারে বারে আত্মপ্রকাশ করে লেখককে দ্বিধাগ্রস্ত করে দিয়েছে, একাধিক নায়ক লক্ষণাক্রান্ত চরিত্রের একই রচনায় অবস্থান তারই প্রমাণ দেয়। এই উপন্যাসেও চন্দ্রশেখর, প্রতাপ ও মিরকাশেম তিনটি চরিত্রেই নায়ক-লক্ষণ বিদ্যমান। চন্দ্রশেখর যে বঙ্কিম-ভাবনায় নায়ক, তার বড় প্রমাণ উপন্যাসটি তারই নামে নামাঙ্কিত। চন্দ্রশেখর জ্ঞানতাপস ও কর্মী, শাস্ত্রচর্চাই তাঁর জীবনের প্রধান অবলম্বন। এই শাস্ত্রচর্চার পথটিকে আরো মসৃণ করার জন্যই তিনি শৈবলিনীকে বিবাহ করেছিলেন। যদিও লেখক শৈবলিনীর রূপের প্রতি একটি মুগ্ধতা-বোধকেই বিবাহের কারণ বলে জানিয়েছেন, তবুও বিবাহোত্তর জীবনে তাঁর এই রূপমুগ্ধতা জ্ঞানচর্চার কোনরূপ বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। হয়তো বা কোন নিশীথে, সুষুপ্তা শৈবলিনীর অপরূপ মুখখানিতে জ্যোৎস্নার আলোর লাবণ্য দেখে তাঁর মনে একটি বিষণ্ণ

ভাবনার উদয় হয়েছে, কিন্তু কোথাও এই ভাবনা কোন তীব্র রূপ ধারণ করেনি। কিন্তু শুষ্ক জ্ঞানচর্চার অন্তরালে যে একটি গভীর সৌন্দর্যমুগ্ধ মন শৈবলিনীর রূপরাশিতে নিমগ্ন হয়ে ছিল, তা একই সঙ্গে পাঠক ও চন্দ্রশেখর আবিষ্কার করে শৈবলিনীর গৃহত্যাগের পর চন্দ্রশেখরের বেদগ্রামে প্রত্যাবর্তনে, সমগ্র প্রিয় শাস্ত্ররাশিকে অগ্নিতে সমর্পণ করে চন্দ্রশেখরের বেদগ্রাম ত্যাগ তাঁর সেই সংগুপ্ত রূপমুগ্ধতারই বহিঃপ্রকাশ। বঙ্কিম চন্দ্রশেখরকে কেবলমাত্র শুষ্ক জ্ঞানতাপস করে রক্তমাংসের সজীবতা থেকে বঞ্চিত করেননি, তাঁকে মানবিক করে তুলেছেন। তবে, মহাপুরুষ রামানন্দ স্বামীর সান্নিধ্যে এসে চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিত্ব কিছুটা বিনষ্ট হয়েছে এবং আপন ব্যক্তিগত স্বভাব, গুরুদেব ও শাস্ত্রাচারের দ্বারা বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে। কিন্তু উপাখ্যানের শেষে যখন পরিশুদ্ধা শৈবলিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে তখন তাঁর মধ্যে জ্ঞান ও কর্মচর্চার সঙ্গে প্রেমবোধও সমন্বিত হয়েছে এবং চন্দ্রশেখর মোটামুটিভাবে বঙ্কিমের আদর্শ মানুষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বঙ্কিমমানসের গীতা-পর্ব এখনও শুরু হয়নি এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ মনুষ্যত্বের রূপটি এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে নিরূপিত হয়ে ওঠেনি। শুধুমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবনায় যে মনুষ্যত্ববোধ ক্রমশ রূপায়িত হতে চলেছে, চন্দ্রশেখর তারই রূপায়ণ। এটি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ চরিত্রের অগ্রদূত।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র আখ্যানের নিয়ামক রূপে যে নায়ক চরিত্রের সার্থকতা, তা চন্দ্রশেখরের মতো প্রতাপের মধ্যেও রয়েছে। অবশ্যই চন্দ্রশেখর এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র, তারই যোগসূত্রে ইতিহাস ও মানবজীবন এখানে একত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবুও সক্রিয়তা ও কর্মক্ষমতায় চন্দ্রশেখরের চেয়ে প্রতাপ চরিত্রই আমাদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একদিক থেকে বিচার করলে প্রতাপকে চন্দ্রশেখর অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, কেন না এই উপন্যাসের ঘটনা-কেন্দ্রটি সর্বদাই পরিচালিত হয়েছে শৈবলিনীর মধ্যস্থতায়। আর শৈবলিনীর সমগ্র জীবনবৃত্তান্ত গড়ে উঠেছে প্রতাপের প্রতি তার দুর্নিবার অনুরাগের বিষয়কে নিয়ে। প্রতাপ চরিত্রও শৈবলিনীর প্রতি মনোভাবের সূত্রেই আপন জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে। তার চরিত্রের যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় আত্মবিসর্জন-প্রবণতা, যা তাকে মহত্তর লোকে সংস্থাপিত করেছে. তারও প্রথম সূচনা দেখা যায় শৈবলিনীর সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে আত্মনিমজ্জনের প্রয়াসে। সেখানে শৈবলিনী আত্মরক্ষায় উদ্যোগী হলেও প্রতাপ কিন্তু আত্মবিসর্জনে কৃতসংকল্প ছিল।

বাল্যকবয়সের এই স্পৃহা প্রতাপের সমগ্র জীবনসাধনায় বারে বারেই জাগরূক থেকেছে এবং সর্বশেষে তার মহৎ আত্মবিসর্জন-কামনায় তারই বিরাট প্রকাশ দেখা গেছে। এই পর্যায়ে প্রতাপ চরিত্রে সুউন্নত প্রেমবোধ, প্রগাঢ় দেশানুরক্তি, মহৎ পরোপচিকীর্ষা,—সব কটি বঙ্কিমী-নায়কধর্মই পূর্ণমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। চন্দ্রশেখর চরিত্রে আদর্শ মনুষ্যত্বের যে দিকগুলি কিছুটা অনুদ্‌ঘাটিত ও প্রচ্ছন্ন ছিল, প্রতাপে তারই পরিপূরণ করা হয়েছে। বলা যায় যে চন্দ্রশেখর ও প্রতাপ এই উভয় চরিত্র একত্র সম্মিলিত হয়েই বঙ্কিমের আদর্শ-নায়কের সমগ্র রূপটিকে ধ্যানদৃষ্টিতে ধরতে চেয়েছে।

মিরকাশেমের সঙ্গে অবশ্য মূল ঘটনার নিবিড়ভাবে কোন যোগ নেই। সমালোচক বলেছেন, 'চন্দ্রশেখরের দ্বিতীয় কাহিনী মীরকাশেম দলনীর আখ্যায়িকা মূল প্লটের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিতে পারে নাই। এটিকে স্বতন্ত্র উপন্যাসে রূপ দিলেই বোধ হয় ভালো হইত।"[১৪] সত্যিই চন্দ্রশেখরের জ্যোতিষচর্চার সূত্রে মীরকাশেমের জীবনের সঙ্গে প্রতাপ শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের সংযোগ ঘটেছে নচেৎ সমস্যা ও ভাবনায় তারা দুটি স্বতন্ত্র গ্রহের বাসিন্দা। অবশ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের রীতিই এই যে, যুগ সন্ধিক্ষণের প্রবল রাজনৈতিক আলোড়নে সাধারণ-অসাধারণের সমস্ত ভেদ লুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রতাপ শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের ব্যক্তিগত জীবনসমস্যার সঙ্গে মীরকাশেম-দলনীর জীবনসমস্যা ও বৃহত্তর রাজনৈতিক বিক্ষোভ একাঙ্গীকৃত হয়ে পড়ে। মীরকাশেম চরিত্রটিকে বঙ্কিম ইতিহাসের বিষয়রূপে নির্বাচিত করলেও, শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে একটি ট্র্যাজিক মহিমার পরিণাম দেখিয়েছেন। "অমাত্যবর্গ বিদায় হইলেন। তখন নবাব রত্ন সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন; হীরক খচিত উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন মুক্তার হার কণ্ঠ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, রত্নখচিত বেশ অঙ্গ হইতে দূর করিলেন—তখন নবাব ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া 'দলনী! দলনী!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। এ সংসারে নবাবি এইরূপ।'[১৫] নবাব মীরকাশেমের চরিত্রে এই অসাধারণ ট্র্যাজিক সম্ভাবনা আবিষ্কার করে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী প্রতিভা চরিতার্থ হতে চেয়েছে এবং চন্দ্রশেখর উপন্যাসের সামগ্রিক আদর্শ চরিত্রের ব্যাপক প্রভাবের মধ্যে ট্র্যাজেডির উৎকৃষ্ট চরিত্র আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। মীরকাশেম স্বতন্ত্র কাহিনীর নায়ক এবং এই কাহিনীটি স্বতন্ত্র আখ্যানের উপযোগী; তাই চরিত্রটির মধ্যেও স্বতন্ত্রভাবে পরিপূর্ণতার আভাস পাওয়া

যায়। আদর্শ নায়কের পাশে ট্র্যাজিক নায়কের এই চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি-পরিকল্পনার অগ্রদূতকল্প।

'রজনী' উপন্যাসটিও দুই নায়কের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এক হিসাবে নায়িকাও দুইজন, একজন প্রত্যক্ষভাবে উপন্যাসের চলমান আখ্যায়িকার নায়িকা, অন্যজন একটি পূর্ব স্মৃতির সূত্রে নায়িকা। নায়ক দুজনের সাধারণ রূপটি কিছুটা বিচিত্র। "নায়কদের একজন সংসার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন; অপরজন অপ্রাকৃতের অধীন, অন্তত বারো আনা রকম।"[১৬] স্বভাবতই তাই এই উপন্যাসে একদিকে আদর্শবাদ, অন্যদিকে রোমান্সপ্রবণতার বিস্তৃত সম্ভাবনা থেকে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী ব্যক্তিত্বের দ্বিধাও এখানে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে নায়কদ্বয়কে অবলম্বন করে। শচীন্দ্র সাধারণ অর্থে নায়ক, তার মধ্যে রোমান্টিক প্রণয়ীর লক্ষণগুলিই প্রকাশ পেয়েছে। যেটুকু অপূর্ণতা ছিল সন্ন্যাসীর অপ্রাকৃত শক্তিপ্রভাবে তাও পূরণ হয়ে গিয়েছে। তার মানসিকতা বিশ্লেষণ করে রূপমুগ্ধ প্রেমের একটা মনস্তত্ত্বসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে মাত্র। চরিত্র বৈশিষ্ট্যে সে জগৎসিংহেরই উত্তর পুরুষ। কিন্তু অমরনাথ চরিত্র যথার্থ নায়কপদবাচ্য না হয়েও যথার্থ নায়কের লক্ষণাক্রান্ত এবং বঙ্কিমের আদর্শবাদী নায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। চন্দ্রশেখরের প্রতাপ চরিত্রে তার পূর্বাভাস আছে বটে, কিন্তু অমরনাথ ট্র্যাজিক মহিমায় প্রতাপকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে। প্রতাপ যেখানে লেখকের আদর্শ-কল্পনার প্রতীক, অমরনাথ সেখানে জীবন্ত চরিত্র। সমালোচকের ভাষায়, "অমরনাথ রক্ত মাংসের মানুষ। প্রেমের স্মৃতিতে দহ্যমান তাহার হৃদয় রজনীর কৃতজ্ঞতা প্রলেপে শান্ত। কিন্তু এমনি তাহার ভাগ্য যে রজনীর প্রতি তাহার ভালোবাসাই তাহাকে বাধ্য করিল রজনীকে প্রত্যাখ্যান করিতে। অমরনাথের এই ট্র্যাজেডিকে বঙ্কিম গুরুত্ব দেন নাই। তবুও মনে হয় যে, প্রতাপের ট্র্যাজেডি ইহার কাছে তুচ্ছ।"[১৭] এই ট্র্যাজিক মহিমাতেই অমরনাথ চরিত্রটি তার পরিপূর্ণতা অর্জন করেছে। যে সহানুভূতির অভিষেকে সাহিত্যিক চরিত্র শিল্পের শাশ্বত লোকের অধিবাসী হয়ে ওঠে, অমরনাথ চরিত্র সেই সহানুভূতির আকর্ষণে সমর্থ হয়েছে। সে আদর্শ চরিত্র নয়, সরন্ধ্র মহৎ ব্যক্তি, তাই তার দোষত্রুটিপূর্ণ জীবনের রূপ আমাদের কাছে জীবনের গোটা রূপটাকে তুলে ধরতে চায়। সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের স্থান নেই, আছে মানুষের। সমালোচকের ভাষায়—"সাহিত্যে আদর্শ চরিত্রের স্থান বড় সংকীর্ণ। আদর্শ-চরিত্র পাত্রপাত্রী স্বভাবতই রিপুভঙ্গুর সাধারণ নরনারীর

অনেকটা উর্ধ্বে অবস্থিত। তাদের দিকে মানুষের প্রশংসমান দৃষ্টি কিন্তু সহানুভূতির ভাব নয়। সহানুভূতি দুর্বলতাও ত্রুটির অপেক্ষা রাখে⋯এই কারণেই সরল্ল মহৎ ব্যক্তি সাহিত্যের নায়ক, বঙ্কিম সাহিত্যেরও।”[১৮] অমরনাথ চরিত্রে এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরূপটি সার্থকভাবে ফুটেছে। সে জিতেন্দ্রিয়, পরোপকারী, অস্বার্থপর ও বৈরাগী, কিন্তু প্রথম যৌবনের রূপবহ্নিজাত দাহের ক্ষতচিহ্ন সে আজীবন বহন করে এসেছে। কিন্তু সে যে কত বড় মহৎচরিত্র, তা লবঙ্গলতার অন্তিম উপলব্ধিতেই আমাদের মর্মগোচর হয়। অথচ, এই দাহের জ্বালা তার মধ্যে কোন তিক্ততার সৃষ্টি না করে তাকে এক পরম বৈরাগ্যের ধূসর উদাসীনতায় পৌঁছে দিয়েছে। বঙ্কিমের নায়কদের মধ্যে পরিণামের এই উদাসীন বৈরাগ্যের গৈরিক উত্তরীয় ধারণ একটি অতি-পরিচিত প্রসঙ্গ। চন্দ্রশেখর শেষ পর্যন্ত যে দাম্পত্যধর্মে ফিরে এসেছে, তা বৈরাগ্য ছাড়া কিছুই নয়। প্রতাপ জীবনবৈরাগী, গোবিন্দলাল, সন্ন্যাসী, জীবানন্দ একই পথের পথিক। বঙ্কিমী নায়ক-পরিকল্পনার পথ-পরিক্রমায় অমরনাথ আরো একধাপ এগিয়ে গেছে। এখানে আদর্শ চরিত্র ও ট্র্যাজিক চরিত্র একীভূত হয়েছে,—যা অনেক পরবর্তীকালে সীতারামে আমরা প্রত্যক্ষ করবো। যে সংসার সদা-বহ্নিময় তাতে রূপবহ্নি ও ভোগবহ্নির পতঙ্গস্বরূপ যে মানুষ, বঙ্কিম সাহিত্য তারই ভাষ্যরূপ। বিপুল শক্তিধর মহৎ চরিত্রের এই রন্ধ্রপথে পতনের শনির অনুপ্রবেশ—বঙ্কিম অমরনাথে তারই রূপ দিয়েছেন।

নগেন্দ্রনাথ-চন্দ্রশেখর-অমরনাথ,—বঙ্কিমের পরিণত উপন্যাসসাধনায় যে ট্র্যাজিক ও আদর্শবাদী নায়ক চরিত্রাঙ্কনের দ্বিধা, তা আরো স্পষ্ট হয়েছে “কৃষ্ণকান্তের উইলের” গোবিন্দলাল চরিত্রে। শিল্পী বঙ্কিম ও নীতিনিষ্ঠ বঙ্কিমের যে দ্বন্দ্ব ও দ্বিধা তাঁর পূর্ববর্তী রচনাগুলির মধ্যে একটা অনিশ্চিত মনোভাব সৃষ্টি করেছিল, যার শক্তিশালী প্রবর্তনায় নায়ক-দ্বৈধ প্রায় সবকটি উপন্যাসেই লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ তার চিহ্ন অনেক কম। বলা যায় যে, ‘বিষবৃক্ষ’ থেকে বঙ্কিম উপন্যাসের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, ‘কৃষ্ণকান্তের উইলে’ তার একটি স্পষ্ট পরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান। এই উপন্যাসটিতে গোবিন্দলাল অবিসংবাদিত নায়ক, প্রধান চরিত্র ও কেন্দ্রীয় ব্যক্তিপুরুষ। তার জীবন ও মননের সংকটই এই আখ্যায়িকার প্রাণবস্তু। সুতরাং রচয়িতার যা কিছু শিল্পী-মানসিক সংকট, তা এই একটি মাত্র চরিত্রকেই অবলম্বন করে ধরা দিয়েছে। গোবিন্দলাল বঙ্কিমসাহিত্যে সর্বাধিক জীবন্ত ট্র্যাজিক নায়ক যার রূপায়ণে বঙ্কিম পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজিক

আদর্শটির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন। অবশ্য 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রথম সংস্করণে এই ট্র্যাজিক চেতনা যত শিল্পশোভন, পরবর্তীকালে পরিবর্তিত সংস্করণে তা বেশ কিছুটা বঙ্কিমী আদর্শ-সঞ্জাত। মনে রাখা দরকার যে, বঙ্কিমের জীবৎকালে 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' যে শেষ সংস্করণটি প্রকাশিত হয়, তার প্রকাশকাল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। ইতিমধ্যে গীতা পর্বের উপন্যাসগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়ে গেছে এবং এই 'ত্রয়ী' উপন্যাসের মনোভাবটি ৪র্থ সংস্করণ কৃষ্ণকান্তের উইলের গোবিন্দলাল চরিত্রের পরিণতি রচনায় বিশেষভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত গ্রন্থে যেখানে পরিণামে বারুণীতে গোবিন্দলালের আত্মবিসর্জনের কথা ছিল, চতুর্থ সংস্করণে তার বদলে গোবিন্দলালের সন্ন্যাসগ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লিখিত হয়েছে। বলা যায় যে, প্রথম সংস্করণে শিল্পী-বঙ্কিমের বিজয়, চতুর্থ সংস্করণে আদর্শবাদী ও তাত্ত্বিক বঙ্কিমের, পরিণামের এই বিশেষত্বটুকু বাদ দিলে গোবিন্দলাল বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নায়ক, যাকে ট্র্যাজিক আদর্শে বিচার করলে নিখুঁত বলে বোধ হয়।

'কৃষ্ণকান্তের উইলের' পর্যালোচনা কালে স্বাভাবিকভাবেই 'বিষবৃক্ষের' প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এই দুটি রচনার মধ্যে বহিরঙ্গ সাদৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। দুটি উপন্যাসেই প্রেমের ত্রিকোণ সমস্যার রূপ, দুই নারী ও এক পুরুষ। উভয় ক্ষেত্রেই সমস্যার কেন্দ্রে বিধবা রমণীর অবস্থিতি ও রূপমোহ উভয় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যার উৎপত্তিস্থল। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত, বঙ্কিমের প্রথম সমসাময়িক পটভূমিকায় রচিত 'বিষবৃক্ষের' অসম্পূর্ণতা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' দূরীকৃত হয়েছে। এই দিকে লক্ষ্য রেখে কোন কোন সমালোচক প্রথমটিকে খসড়া ও পরবর্তীটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৯] উপন্যাসের মতো নায়ক চরিত্রের ক্ষেত্রেও গোবিন্দলাল নগেন্দ্রনাথ অপেক্ষা পূর্ণতর মহিমার অধিকারী। শুধু বিষবৃক্ষের তুলনায়ই গোবিন্দলাল সমগ্র বঙ্কিম সাহিত্যের নায়কদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সমালোচকের ভাষায়,—"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর সকল নায়ক চরিত্রের মধ্যে গোবিন্দলালের ভূমিকা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও সমধিক পরিস্ফুট।"[২০] 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' আখ্যান বিশ্লেষণ করলে গোবিন্দলাল চরিত্রের ব্যক্তিত্ব ও পূর্ণাঙ্গতা সহজেই আমাদের মর্মগোচর হবে।

গোবিন্দলাল-ভ্রমরের সুখী দাম্পত্য জীবন মোটামুটিভাবে সুখ ও শান্তির স্বচ্ছন্দগতিতে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের উইলের সাক্ষ্যে তার অনিন্দিত চরিত্রের একটি স্পষ্ট প্রমাণ গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে।

কিন্তু এহেন অনিন্দ্য চরিত্র গোবিন্দলালের সুপ্ত রূপমোহ বিধবা রোহিণীকে ঘিরে উপ্ত হয়ে উঠলো। একদিকে বিধবার প্রতি করুণা ও সহানুভূতি অন্যদিকে ভ্রমরের অহংকার ও অভিমান তার সুপ্ত রূপতৃষ্ণাকে ধীরে ধীরে জাগ্রত করে তার মনের গভীরে এক জটিল আবর্তের সৃষ্টি করলো। তারপর ঘটনার গতি গোবিন্দলালকে ক্রমশ পতনের ধাপে ধাপে নামিয়ে এমন পর্যায়ে এনে ফেললো যে রোহিণীকে নিয়ে সে হরিদ্রাগ্রাম ত্যাগ করলো ও প্রসাদপুরের নির্জন কুঠিবাড়িতে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে লাগলো। কিন্তু যে রূপমোহ গোবিন্দলালকে উন্মত্ত করেছিল ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে অল্পদিনের মধ্যেই তার সে উন্মাদ তৃষ্ণার প্রশমন ঘটলো ও অনুপস্থিত ভ্রমরের জন্য তার অন্তরের গভীর অভাববোধ তাকে ক্রমশ রোহিণী সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে তুললো। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র গোবিন্দলালের এই মনোভাবের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করেননি, কিন্তু কুঠিবাড়িতে রোহিণীর শোচনীয় পরিণাম সেই অনুদ্‌ঘাটিত অধ্যায়টিরই একটি স্বাভাবিক ও সঙ্গত ফলশ্রুতি মাত্র। হত্যাপরাধে অভিযুক্ত গোবিন্দলাল ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথের সহায়তায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে খালাস পেল, কিন্তু তার ক্ষতবিক্ষত অন্তরঙ্গসত্তা মুক্তি পেল না। একদিকে ভ্রমর অন্যদিকে রোহিণী এই দুই আকর্ষণের বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয়ে তার চিত্তক্ষেত্র যথার্থ ট্র্যাজিক মহিমায় অভিষিক্ত হয়ে উঠলো। ইউরোপীয় ট্র্যাজেডিতত্ত্বে নায়কের পতনের জন্য যে মানবিক কামনাবাসনার অসংবরণীয় প্রবর্তনা ও দুই নারীর মধ্যে কর্তব্য ও বাসনার দ্বন্দ্বে দোলাচলতার একটি অভ্রান্ত প্রেরণাস্থলের উল্লেখ আছে, গোবিন্দলাল চরিত্রে তার যথাযথ রূপায়ণ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণভাষায় তার চিত্তবিক্ষোভের এই রূপটি অভিব্যক্ত করেছেন—"তখন ভ্রমর অপ্রাপণীয়া' রোহিণী অত্যাজ্যা, তবু ভ্রমর অন্তরে রোহিণী বাহিরে।...কিন্তু তবু, সেই পুনঃপ্রজ্বলিত, দুর্বার দাহকারী ভ্রমর দর্শনের লালসা, বর্ষে বর্ষে, মাসে মাসে, দিনে দিনে, দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে গোবিন্দলালকে দাহ করিতে লাগিল। কে এমন পাইয়াছিল? কে এমন হারাইয়াছে? ভ্রমর দুঃখ পাইয়াছিল, গোবিন্দলালও দুঃখ পাইয়াছিল। কিন্তু গোবিন্দলালের তুলনায় ভ্রমর সুখী। গোবিন্দলালের দুঃখ মনুষ্যদেহে অসহ্য, ভ্রমরের সহায় ছিল, যম সহায়। গোবিন্দলালের সে সহায় নাই।"[২১] গোবিন্দলালকে এই মানসিক দ্বন্দ্ববিক্ষত অবস্থায় পৌঁছে দিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নিপুণভাবে ধাপে ধাপে নামিয়েছেন। যে সমুন্নত মহৎ ব্যক্তিত্বের অধঃপতন ট্র্যাজেডির প্রাণ গোবিন্দলাল চরিত্রে তারই সফল ও সামগ্রিক

রূপায়ণ হয়েছে। ধাপে ধাপে গোবিন্দলালের অধঃপতন রাজা ম্যাকবেথের ধাপে ধাপে অধঃপতনের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেয়। এই অধঃপতনের চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন সমালোচক। "গোবিন্দলালে অনেক দোষ। গোবিন্দলাল পরদারানুসক্ত, পরস্ত্রী নিয়ে গৃহত্যাগী, অকারণে স্নেহময়ী ভার্যা-ত্যাগী এবং শেষ পর্যন্ত নারী-হন্তা। গোবিন্দলালের পতনের চারটি ধাপ, প্রত্যেক ধাপের কঠিন পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে রক্ষা করবার জন্য, ভগবানকে ডেকেছে সে। পাপের পঙ্কে যত অধিক নিমগ্ন হয়েছে তত অধিক আত্মগ্লানি অনুভব করেছে, তত অধিক জোরে রোহিণীকে অবলম্বন করেছে। অবশেষে এক দুর্গতির মধ্যে দুজনে তলিয়ে গিয়েছে। সর্বশেষে ভ্রমরের মৃত্যু আগ্নেয়গিরির চূড়ায় অস্তগামী সূর্যবিম্বের মতো তার মনস্তাপের শিরে জ্বালাময় কিরীট পরিয়ে দিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত, সর্বস্বান্ত, সর্বজনপরিত্যক্ত, নিয়তি-ও আত্মবিড়ম্বিত গোবিন্দলাল গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির নায়কের মতো মহিমান্বিত রূপে দেখা দিয়েছে।"[২২] স্বভাবতই বিষবৃক্ষের নায়ক নগেন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গত মনে আসে, কিন্তু নগেন্দ্রনাথের মধ্যে আত্মপরীক্ষার এই কঠিন স্তরগুলি অতিক্রমণের কোন পরিচয় নেই; তাছাড়া, বিষবৃক্ষের পরিণামেও ট্র্যাজেডির এই মহিমান্বিত রূপ দেখা যায়নি। আর দেবেন্দ্রের পরিণাম শোচনীয় হলেও সে পাষণ্ড বলে তার পতনে কোন মহিমা নেই।

গোবিন্দলাল-চরিত্রের পরিণাম নিয়ে কিছু ভাবনার অবকাশ আছে। প্রথম সংস্করণে তার মৃত্যু দেখানো হয়েছিল। সেক্ষেত্রে লেখক পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির পরিপূর্ণ রূপটিকেই ধরতে চেয়েছিলেন, সরন্ধ্র মহৎ ব্যক্তির অধঃপতন ও পরিণামে শোচনীয় মৃত্যু। পরবর্তী সংস্করণে সমাপ্তির অংশ পরিবর্তিত করে গোবিন্দলালকে সন্ন্যাসী রূপে দেখানো হয়েছে। পরিশিষ্টের এই অংশটির প্রয়োগ-সার্থকতা স্বীকার করে সমালোচক দেখিয়েছেন যে পরিণামে সন্ন্যাস ও শাস্তি গোবিন্দলালকে নগেন্দ্রনাথের স্তর থেকে অনেক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে এবং পাশ্চাত্ত্য আলংকারিক রীতির বাইরে ভারতীয় রীতির পরিণামও শিল্প ও সাহিত্যের বিচারে কম উচ্চাঙ্গের নয়।[২৩] কিন্তু আমাদের মনে হয়, এই পরিবর্তন শুধুমাত্রই সাহিত্য-শিল্পগত কারণে নয়, এর মূলে রয়েছে বঙ্কিমের পরিণত মানসিকতা। আনন্দমঠ থেকে বঙ্কিমের যে উপন্যাসধারার সূচনা, তার আদর্শগত ও তত্ত্বগত ভূমিকাটি কোনমতেই শিল্পগত ভূমিকা থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 'এ জীবন লইয়া কি

করিব'—এই আবাল্য উচ্চারিত জীবন-প্রশ্নের যে দার্শনিক উত্তর তিনি পরিণত জীবনে লাভ করেছিলেন, তার নিগূঢ় প্রবর্তনাই 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' এইরকম পরিশিষ্ট রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রণোদিত করেছিল। বঙ্কিমের পরিণত মননশীলতায় ধরা পড়েছিল এই সত্য যে, সন্ন্যাসই জীবনের পরম লক্ষ্য নয়, পরম লক্ষ্য সেই চরম প্রাপ্তি, যা মানবচৈতন্যকে ভগবৎ-চৈতন্যে বিলীন করে দেয়। তাই পরিশিষ্টে ভাগিনেয় শচীকান্তের প্রস্তাবের উত্তরে গোবিন্দলাল বলেছে— "বিষয়-সম্পত্তির অপেক্ষাও যাহা ধন, যাহা কুবেরেরও অপ্রাপ্য তাহা আমি পাইয়াছি। এই ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা মধুর, ভ্রমরের অপেক্ষাও যাহা পবিত্র, তাহা পাইয়াছি। আমি শান্তি পাইয়াছি।" অতঃপর শচীকান্তের কণ্ঠে জিজ্ঞাসা—'সন্ন্যাসে কি শান্তি পাওয়া যায় ?' উত্তরে গোবিন্দলাল বলেছে—"কদাপি না, কেবল অজ্ঞাতবাসের জন্য আমার এ সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ। ভগবৎ পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনিই আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।" গোবিন্দলালের এই মানসিকতা পূর্ববর্তী ভাবনাধারার সঙ্গে যথার্থভাবেই সঙ্গতিপূর্ণ। 'চন্দ্রশেখরে' আত্মবিসর্জনকামী প্রতাপের প্রতি মহাপুরুষের আশীর্বচন এই চরিত্রশক্তি অর্জনেরই প্রেরণাস্থল, অমরনাথের শেষ পরিণামে বঙ্কিম এরই ইঙ্গিত দিয়েছেন, আবার পরবর্তী 'আনন্দমঠে' এরই উদ্ভাস লক্ষ্য করা যায়। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, বঙ্কিমী রচনার নায়ক-পরিকল্পনায় লেখকের শিল্পবোধ ও আদর্শবোধ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে একাধিক উপন্যাসে নায়ক-দ্বিধার কারণ হয়েছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিমের শিল্পবোধ ও আদর্শবাদের মধ্যে একটি চমৎকার সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি রচিত হয়েছে। গোবিন্দলালে তাঁর ট্র্যাজেডি-চেতনা যেমন চরমোৎকর্ষ পেয়েছে, আদর্শবোধ ও জীবনানুসন্ধানও তেমনি চরিতার্থ হয়েছে। এই গ্রন্থপর্যায়ে এসে বঙ্কিম সাহিত্যের আর একটি পর্যায়ের পরিণাম ও সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছে। শিল্পী ও তাত্ত্বিক এই উভয় সত্তারই আত্মপ্রক্ষেপ ঘটলেও, এই পর্যায়ে বঙ্কিম মুখ্যতঃ শিল্পী। 'বিষবৃক্ষে' সে শিল্পীর জীবননিরীক্ষার শুরু, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তারই পরিণাম; নগেন্দ্রনাথে যার অসম্পূর্ণ অবলম্বন, গোবিন্দলাল তারই পরিপূর্ণ মাধ্যম। 'আনন্দমঠ' থেকে বঙ্কিমের তৃতীয় সাহিত্য পর্যায়ের সূচনা, গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মবাদী আদর্শের নিকষে জীবনের সত্য মূল্যের যাচাই, ভবানন্দ-জীবানন্দ থেকে সীতারামে এই অনুসন্ধান প্রসারিত।

॥ ৯ ॥

'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' এই তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র যতখানি তত্ত্বভূয়িষ্ঠ আদর্শবাদের দ্বারা প্রণোদিত হয়েছেন, বাস্তবজীবনবোধ ও মানবচরিত্রানুসন্ধানের দ্বারা ততখানি নয়। এই কারণেই সমালোচকের মনে হয়েছে যে এই পর্বে বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক প্রতিভা ক্রমশ ক্ষীণশক্তি হয়ে পড়েছে, তাঁর রচনার ধারায় যেন ভাঁটার টান পড়েছে।[২৪] এই কারণেই এই উপন্যাসত্রয়ীর চরিত্রস্থষ্টিতে আদর্শবাদ যতটা প্রাধান্য পেয়েছে মানবজীবনবৈচিত্র্য ততটা প্রকাশ পায়নি। তবু বলা যায় যে, সীতারাম তত্ত্ববোধ ও মানবজীবন-বৈচিত্র্যে সমুজ্জ্বল হয়ে এই পর্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হয়েছে। এই পর্যায়ের উপন্যাসগুলিতে সীতারামই একমাত্র নায়কপদবাচ্য হয়ে উঠেছে, অন্য রচনাদুটিতে যথার্থ নায়কের কোন স্পষ্টরূপ দৃষ্টিগোচর হয় না।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসের নায়ক কে? যদি নায়ক বলতে আমরা সেই চরিত্রকেই বুঝিয়ে থাকি, যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রবর্তনা ছাড়া কাহিনী অচল হয়ে পড়ে, তবে আনন্দমঠে সেই ধরণের কোন চরিত্র আছে কি না, সন্দেহের বিষয়। 'আনন্দমঠ' প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক উপন্যাস, সন্তানদলের আশ্রম ও আশ্রয় 'আনন্দমঠই' এর কেন্দ্রীয় খুঁটি, যার সহায়তায় কাহিনীটি দাঁড়িয়ে আছে। এই আনন্দমঠের তিনজন প্রধান অবলম্বন—সত্যানন্দ, ভবানন্দ ও জীবানন্দ। এদের মধ্যে শিল্পগত নায়ক-লক্ষণ একমাত্র ভবানন্দ চরিত্রেই লক্ষ্য করা যায়। সত্যানন্দ বঙ্কিমের তত্ত্বপ্রতীক, উপক্রমণিকায় যে ভক্তির উল্লেখ এবং পরিসমাপ্তিতে যে জ্ঞানের উচ্চারণ তা আপাতদৃষ্টিতে ভিন্নার্থক হলেও, বঙ্কিমের নিজস্ব ধর্মতত্ত্বীয় ধারণায় উভয়ের মধ্যে স্পষ্ট একটি সম্পর্কসূত্র বিদ্যমান। বঙ্কিমের মতে ভক্তি দ্বিবিধ—কর্মাত্মিকা ও জ্ঞানাত্মিকা; প্রথমটি গৌণ, দ্বিতীয়টি মুখ্য, জ্ঞানাত্মিকা ভক্তিতেই ভক্তির পরাকাষ্ঠা, বঙ্কিমী ভগবৎ সাধনার ও মনুষ্যত্বচর্চার সর্বোত্তম স্তর।[২৫] সত্যানন্দ এই ভক্তি-সাধনার বঙ্কিমী উপায়, তাই তার মধ্যে রক্তমাংসের মানবজীবনস্পন্দন কোথাও অনুভূত হয়নি। যে সরন্ধ্র মহৎ ব্যক্তিত্ব ট্র্যাজেডি তথা উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের প্রধান লক্ষণ, তার দ্বারা লক্ষণাক্রান্ত ভবানন্দ ও জীবানন্দ। এদের মধ্যে ভবানন্দের মধ্যেই উচ্চ আদর্শ ও কর্তব্যবোধ, রূপতৃষ্ণা ও ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার দ্বন্দ্ব সর্বাধিক অভিব্যক্ত হয়েছে। ভবানন্দ আনন্দমঠের শ্রেষ্ঠ সন্তান, সত্যানন্দের প্রধান অনুচর, 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রথম গায়ক, শস্ত্র ও

শাস্ত্রে সমান পারঙ্গম। তার অমলিন ব্যক্তিত্বে বাসনার ছায়া পড়েছে কল্যাণীর রূপমোহে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ বিস্তারিত আলোচনা না করলেও, স্থানে স্থানে ইঙ্গিতে এই মোহের বর্ণনা দিয়েছেন এবং পরিণামে এই রূপমোহ ও কর্ত্তব্যবোধ তার মধ্যে এক তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়কের মতোই ভবানন্দ ট্র্যাজেডির জ্বালাময় কিরীটকে আপন শিরোভূষণ করে আত্মবিসর্জনের লগ্নে এক অসাধারণ মহত্ত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে। তাঁর মধ্যেকার এই বিশিষ্ট চরিত্রধর্ম সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায়নি—"মৃতকল্পার প্রাণরক্ষা করিতে যাইয়া ভবানন্দের ব্রতচ্যুতি গোবিন্দলালের অধঃপতনের চিত্র স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু ভবানন্দ সেখানে প্রবৃত্তির মুখে কৃত্রিম বাঁধ দিয়াছেন, গোবিন্দলালের জীবনে যেখানে সহজ প্রেমের প্রবাহ অব্যাহত রহিয়াছে।"[২৬] বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক নায়ক গোবিন্দলালের সঙ্গে ভবানন্দের এই সাদৃশ্য চরিত্রটির ট্র্যাজিক সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত করে। তবে পরিবেশের ভিন্নতা উভয় চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ ও পরিণামের পার্থক্যের প্রধান নিয়ামক। গোবিন্দলালের অধঃপতন যেখানে পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রে অবাধ হয়েছে, ভবানন্দের ক্ষেত্রে সেখানে সন্তানধর্মের কঠোর নিয়ম ও অনুশাসন তাকে কৃত্রিম বাঁধ বাঁধতে প্রণোদিত করেছে। প্রথম সংস্করণে গোবিন্দলাল অবশ্য ট্র্যাজিক নায়কের উপযুক্ত পরিণাম পেয়েছিল, কিন্তু ১৮৯২-তে প্রকাশিত বঙ্কিমের জীবদ্দশার শেষ সংস্করণে সংযোজিত পরিশিষ্টে সে ভবানন্দেরই সমানধর্মী, বরং আরো ঊর্ধ্বচারী। ভবানন্দ আত্মবিসর্জন দিয়ে সন্তানধর্মের দীক্ষাকালীন প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে, গোবিন্দলাল জ্ঞানাত্মিকা ভক্তির স্তরে উন্নীত হয়ে ভ্রমরাধিক ভ্রমরের সন্ধান পেয়ে চরিতার্থ হয়েছে। তবু আনন্দমঠের উচ্চ আদর্শবাদ ও সুগভীর তত্ত্বভূয়িষ্ঠ বাতাবরণে ভবানন্দের মতো ট্র্যাজিক নায়কের সম্ভাবনাপূর্ণ চরিত্রের পরিকল্পনা, শিল্পী বঙ্কিমের সবল আত্মপ্রকাশ বলেই মনে করা যায়। এই একই ধরণের ভ্রান্তি বা অধঃপতনের চিহ্ন জীবানন্দ চরিত্রে থাকলেও, সেখানে তাত্ত্বিক বঙ্কিমের স্পষ্ট উপস্থিতি; কারণ উপন্যাসের শেষে শান্তি-জীবানন্দের ভবিষ্যৎ জীবন-পরিকল্পনা কোন রক্তমাংসের মানবমানবীর জীবন-পরিণাম নয়, তত্ত্বজ্ঞানীর আদর্শবোধের চূড়ান্ত সিদ্ধিস্থল।

'সীতারাম' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত প্রজ্ঞার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। গোবিন্দলালের মধ্যে যে ট্র্যাজিক নায়কসত্তা উৎকর্ষ অর্জন করেছিল, সীতারামে তার সঙ্গে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

শেষ পর্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনায় গীতার অবিসংবাদিত প্রভাব সীতারাম চরিত্রে শিল্পবোধ এবং তত্ত্বজ্ঞান ও নীতিচেতনার এক আশ্চর্য সমীকরণ ঘটিয়েছে। সীতারাম চরিত্রের পরিকল্পনায় বঙ্কিম পাশ্চাত্ত্য ট্র্যাজেডির আদর্শের সঙ্গে গীতার তত্ত্বভাবনার এক অপরূপ সামঞ্জস্য রচনা করেছেন। সীতারাম বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক-নায়ক। শেক্সপীয়রের মহাবল এ্যাণ্টনী যার একমাত্র তুলনাস্থল, তার জীবনপরিণাম-রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র গীতার যে বাণীসূত্র নির্দেশ করেছেন, তা ট্র্যাজিক নায়কের বিষাদান্ত পরিণামের অন্তর্নিহিত রেখাচিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। সীতারামের সূচনায় বঙ্কিমচন্দ্র গীতার যে শ্লোক উদ্ধার করেছেন তাতে মনুষ্যের আত্মবিনষ্টির অন্তরঙ্গ কারণটি নির্দেশিত হয়েছে: "বিষয়সমূহের ধ্যান করতে করতে তাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়; আসক্তি থেকে কামনা, কামনা থেকে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ থেকে সম্মোহ হয়, সম্মোহ থেকে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম থেকে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশ হলে মানুষ বিনষ্ট হয়।"[২৭] গীতার এই সূত্রটিকে ট্র্যাজেডির সরন্ধ্র মহৎ ব্যক্তিত্বের পতনের সঙ্গে অনায়াসেই মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এ্যারিস্টটল তাঁর ট্র্যাজেডি-নায়কের যে human frailty র কথা বলেছেন, যার অন্যতম উৎসস্থল human passion. গীতার এই শ্লোকবদ্ধ বিষয়-আসক্তি ও কামনার মধ্যে তারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সীতারামের চরিত্রপরিকল্পনায় বঙ্কিম এই দুই ধারণার একটি সমীকৃত রূপ সৃষ্টি করার প্রয়াসী হয়েছেন; প্রখর ও উচ্চ আদর্শবাদ সত্ত্বেও, চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সাধারণভাবে ধর্মতত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা ও গ্রন্থসূচনায় গীতাবচনের উদ্ধার 'সীতারাম' উপন্যাসটির শিল্পসৌন্দর্য সম্বন্ধে পাঠক-সমালোচকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এজন্যই সীতারাম চরিত্র যথোচিত গুরুত্ব অর্জন করেনি। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র মতো সীতারাম সম্পর্কেও একটি উচ্চ আদর্শবাদ ও তত্ত্বমুখীনতার বোধ এটির চরিত্রসৃষ্টি-গৌরবকে অনেকখানি ঢেকে রেখেছে, অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক-চরিত্র-পরিকল্পনার ক্রমবিকাশের ধারায় এই চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা পরিণত শক্তির প্রকাশ। দোষে গুণে মেশানো যে মানুষ এই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চের প্রধান অভিনেতা, সীতারামে তারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই সমালোচক এই চরিত্রটির মধ্যে অমরনাথের সাদৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। "রজনীর অমরনাথের পর সীতারাম ভূমিকাই বঙ্কিমের অধিক স্পষ্ট পুরুষ চরিত্র। সীতারাম আদর্শ পুরুষ নয়,

দোষে গুণে জড়িত মানুষ। সেইখানেই এই ভূমিকাটির সার্থকতা।"[২৮] এই স্বাভাবিক মনুষ্যত্বের শক্তিতেই চরিত্রটি শেক্সপীয়রের ট্র্যাজিক নায়কের মতোই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে।

সমগ্র উপন্যাসে সীতারাম চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র একটি মহৎ ও অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধঃপতনের স্তরগুলি আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থমধ্যে সীতারাম-জীবনের যে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে, তাকে কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত করে দেখানো চলে।

১. সূচনায় সীতারাম বীর, আর্তের প্রাণরক্ষায় বদ্ধপরিকর, হিন্দুর সম্ভ্রম রক্ষায় স্থিরপ্রতিজ্ঞ। শ্রীর অনুরোধে গঙ্গারামকে উদ্ধার করার সংকল্প প্রকাশে সীতারাম চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে।

২. পরবর্তী স্তরে গঙ্গারামের উদ্ধার, শ্রীর সিংহবাহিনী মূর্তি ও সীতারামের হিন্দুরাজ্য সংস্থাপনের অভিলাষ তার মহত্ত্বকে কর্মাত্মক রূপ দিয়েছে।

৩. দিল্লীতে রাজার সনদ আনতে যাওয়া এবং তোরাব খাঁ কর্তৃক অরক্ষিত দুর্গ আক্রমণ এবং অসাধারণ বীরত্ব সহকারে শ্রী ও জয়ন্তীর সহায়তায় দুর্গরক্ষা সীতারামের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও চরিত্রগৌরবকে চূড়ান্ত শীর্ষে পৌঁছে দিয়েছে।

৪ এই চরম গৌরবে পৌঁছেই সীতারামের জীবনে অধঃপতনের সূচনা ঘটলো। নাটকের ভাষায় climax-এর সঙ্গে সঙ্গেই Falling action-এর সূত্রপাত ঘটলো। রমার গঙ্গারাম-ঘটিত ব্যাপার ও দরবারে তার বিচার সীতারামের মনে একটা বিক্ষোভ ও নৈরাশ্যের সূচনা করলো।

৫. অতঃপর 'চিত্তবিশ্রামে' সন্ন্যাসিনী শ্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও অতৃপ্ত-কাম সীতারামের শ্রীর প্রতি অন্তর্নিহিত আসক্তির পুনর্জাগরণে তার অধঃপতনের আরো এক ধাপ অগ্রগতি। অতৃপ্ত কামনার বহিঃপ্রকাশ, রাজকার্যে অমনোযোগ, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা।

৬. সীতারামকে মোহমুক্ত করার প্রবল প্রেরণায় জয়ন্তীর সহায়তায় শ্রীর অন্তর্ধান সীতারামের অতৃপ্ত কামনার বিকৃত রূপকে ক্রোধের আগুনে প্রকাশ্য করে তুললো ও সীতারাম চরিত্রের অধঃপতন সম্পূর্ণ হলো। জয়ন্তীর শাস্তিবিধান সীতারাম চরিত্রকে অধঃপতনের শেষ ধাপে নামিয়ে দিয়েছে।

৭. গ্রন্থের একেবারে শেষে, আসন্ন সর্বনাশের প্রলয়লগ্নে সীতারামের চৈতন্যের মোহমুক্তি ঘটেছে এবং সীতারাম পুনরায় আপন ব্যক্তিত্বের ভূমিতে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে—সীতারাম বিনষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

'সীতারাম' উপন্যাসের ঘটনাটিকে এই স্তরপরম্পরায় বিন্যস্ত করে আমরা একটি মহৎ চরিত্রের অধঃপতনের পরিপূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। ট্র্যাজেডিতে যে above common level মহৎ ব্যক্তির চরিত্র পরিলক্ষিত হয়, সীতারামে তার পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। কিন্তু এই মহৎ ব্যক্তিত্ব সরন্ধ্র; তার চরিত্রের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের লৌহবাসরের মধ্যে পতনের রন্ধ্রপথের ইঙ্গিত লেখক সর্বত্র অব্যাহতভাবে প্রকাশ করেছেন। অল্পবয়সে শ্রী সীতারামের পিতার আদেশে সীতারাম কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিল। অতঃপর নন্দা ও রমা, বিশেষ করে রমার রূপে তৃপ্ত হয়ে সে নিশ্চিন্তে দিনাতিপাত করছিল। কিন্তু প্রগাঢ়যৌবনা শ্রীকে নতুন করে দেখে তার মধ্যে একটি অভিনব অথচ দুর্দমনীয় রূপতৃষ্ণা জেগে উঠলো। পুরাতন ও নূতনের মধ্যে নূতনের এই তরঙ্গাভিঘাত পুরুষের হৃদয়ে যে বিভ্রম ঘটায় 'বিষবৃক্ষে' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' বঙ্কিম তার পূর্বপরিচয় দিয়েছেন। প্রেমের চিত্রায়ণে এটি একটি অতি পরিচিত বঙ্কিমী-রীতি। এই রূপতৃষ্ণা ও আসক্তি সাময়িকভাবে রুদ্ধ হয়েছিল রাজ্যসংস্থাপনের প্রবল কর্মোদ্যমে। কিন্তু রাজ্য সংস্থাপিত করেই সীতারাম-চিত্তের এই রূপতৃষ্ণা নতুন করে অনুভূত হলো। নন্দা ও রমার মধ্যে সে উপযুক্ত মহিষীর সন্ধান পেল না, পরন্তু রমার কলঙ্ক তার মনকে আরো শূন্যতায় ভরিয়ে তুললো। তার মনে শ্রীর সিংহবাহিনী রূপ নতুন করে প্রোজ্জ্বল হলো ও শ্রীকে ঘিরে তার বাসনা ক্রমশ ঘনীভূত রূপ নিল। অতঃপর শ্রীর সাক্ষাৎ সে পেল বটে কিন্তু "সীতারাম মহিষী খুঁজিতে ছিল। দেবী লইয়া কি করিবে?" এ হেন পরিস্থিতিতে 'চিত্তবিশ্রামে' শ্রীর অবস্থিতি ও সীতারামের সঙ্গে তার নিয়মিত সাক্ষাৎ সীতারাম চিত্তে আসক্তিকে ক্রমশ গভীরমূল করে তুললো। সান্নিধ্যের মধ্যেও এই অনন্ত দূরত্ব ধীরে ধীরে সীতারামের মনকে বিষাক্ত করে তুললো ও সেই বিষের প্রভাবে তার অধঃপতন চূড়ান্ত হলো। শ্রীর প্রতি অপ্রতি-রোধনীয় রূপতৃষ্ণা ও অসংগত বাসনার রন্ধ্রপথেই সীতারামের ব্যক্তিত্বে পতনের শনি প্রবেশ করেছে। সীতারাম চরিত্রের পরিণতি সমালোচকের সপ্রশংস স্বীকৃতি অর্জনে সমর্থ হয়েছে। "সীতারাম চরিত্রের এই ভীষণ পরিবর্তন অদ্ভুত মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করিয়া ধরা হইয়াছে। সীতারামের এই অধঃপতনের চিত্র সর্বোত্তভাবে বীর

ম্যাকবেথের রক্তপিপাসু পশুতে পরিণতির সহিত তুলনীয় এবং এই চরিত্র বিশ্লেষণে বঙ্কিম সগৌরবে ধর্মতত্ত্বের ক্ষীণতম প্রভাব হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়াছেন।"[২৯] অবশ্য অপর একজন সমালোচক এই মতকে অতিশয়োক্তি মনে করেন। তাঁর মতে বীর ম্যাকবেথের অন্তিম সংলাপের মধ্যে যে তীব্র আত্মগ্লানি, অনুশোচনা ও জীবনজিজ্ঞাসার সুর শ্রুত হয়, সীতারামে তার ক্ষীণতম ধ্বনিও শ্রুত হয় না।[৩০] বরং সীতারামের শেষ মুহূর্তে চারিত্রিক পরিবর্তনটুকু মানবিক গুণসম্পন্ন ও স্বাভাবিক না হয়ে ধর্মতত্ত্ব ও গীতাবাণীর উদাহরণ রূপেই পরিকল্পিত হয়ে চরিত্রটির সামগ্রিক ট্র্যাজিক মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। সমালোচকের অনুসরণে এই অভিযোগ সহজেই খণ্ডন করা চলে। "বঙ্কিমের সীতারাম এক মুহূর্তে তাঁহার সমস্ত দৌর্বল্য ও চরিত্রগ্লানি ধূলিজঞ্জালবৎ ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন; গ্রন্থের এইরূপ পরিসমাপ্তি করিয়া বঙ্কিম তাঁহার জাতিগত ও ধর্মবিশ্বাসগত বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে বাস্তবতার বিশেষ হানি হইয়াছে বলিয়া মনে করার কোন কারণ নাই।...প্রত্যেক জাতির একটি বিশেষ রকমের রোমান্সের দিকে প্রবণতা আছে; এবং সেই রোমান্সের প্রকৃতি তাহার বাস্তবজীবনের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে। ইউরোপীয় রোমান্স আমাদের বাঙালী জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে ঠিক মিলিবে না; আমাদের জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপরই আমাদের রোমান্সের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই মানদণ্ডে বিচার করিতে গেলে সীতারামের শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের রোমান্স আমাদের বাস্তবজীবনের অবস্থার সহিত বেশ সুসঙ্গতই হইয়াছে। সীতারামের পূর্বজীবনের স্বাভাবিক মহত্ত্বই এই পুনরুদ্ধারের কার্যে সহায়তা করিয়াছে।...সীতারাম চরিত্র বঙ্কিমের অপূর্ব সৃষ্টি; সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বাস্তবের সহিত রোমান্সের সংমিশ্রণের সুসঙ্গতিতে ইহা পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের যে কোন সমজাতীয় চরিত্রের সহিত সমকক্ষতার স্পর্ধা করিতে পারে।"[৩১] এই বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়েছে যে, সীতারামের অন্তিম পরিণতি সাহিত্যাদর্শ থেকে কোনরূপ বিচ্যুতি নয়, বরং জাতিগত ও ধর্মগত বিশ্বাসের সংগে সুসঙ্গতিপূর্ণ।

স্মরণ রাখা দরকার যে, সীতারামের সূচনায় বঙ্কিম গীতার শ্লোক উদ্ধার করেছেন। সেই শ্লোকে মানুষের আত্মবিনষ্টির তথা অধঃপতনের ধাপগুলি সূক্ষ্ম স্তর-পরম্পরতার মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। সীতারাম চরিত্রের অঙ্কনে বঙ্কিম নিপুণভাবে এই স্তরপরম্পরা রক্ষা করেছেন।

বঙ্কিমের সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, গীতার এই ধারণা কোনমতেই সীতারামের ট্র্যাজিক বৈশিষ্ট্যকে ক্ষুণ্ণ করেনি; বরং দুই ধারণা একত্র সমন্বিত হয়ে বঙ্কিমের সৃষ্টিপ্রতিভার চরম উৎকর্ষ প্রমাণ করেছে। এই শ্লোকেই এই বিনষ্টি থেকে উদ্ধারের পথও নির্দেশিত হয়েছে। আসক্তিহীন ও রাগদ্বেষবর্জিত প্রসন্নতাই মানুষের পরিপূর্ণতার উৎস। সীতারামের সমগ্র জীবনকাহিনীতে ট্র্যাজিক চেতনা, গীতাবচন ও জাতিগত রোমান্সের সমন্বয় ঘটিয়ে নায়ক চরিত্রসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছেন।

শিল্পগত দিক ছাড়াও আদর্শগত দিক দিয়েও সীতারাম চরিত্র বঙ্কিমী সাহিত্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারায় আমরা দেখেছি যে ট্র্যাজিক নায়ক ও আদর্শ নায়ক তাঁর শিল্পকল্পনাকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছে। সীতারামে এসে উভয়ের একটা সমন্বয়ের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল। একদিকে শিল্পী বঙ্কিমের ট্র্যাজিক নায়ক, অন্যদিকে ঋষি বঙ্কিমের আদর্শ নায়ক উভয়েই এই চরিত্রে একাঙ্গীভূত হয়েছে। কামনাবহ্নির পতঙ্গ এ্যাণ্টনীর মতোই সীতারাম, আবার পরদুঃখকাতর, আশ্রিতবৎসল, হিন্দুরাজ্য সংস্থাপক রাজা সীতারাম। কিন্তু ইতিহাস এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক, তাই সর্বতোভাবে গুণান্বিত হয়েও সীতারামে বঙ্কিমের কল্পনা পরিসমাপ্তির আশ্রয় পেলো না। তাঁকে আবার নতুন করে লিখতে হলো চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ', যেখানে বঙ্কিমের আদর্শ নায়ক ইতিহাসের তথ্যে ও শিল্পীর কল্পনায় একাধারে একটি ব্যক্তি মানুষের মধ্যে আশ্রয় পেল।

"রাজসিংহ" উপন্যাসের নায়ক রাজসিংহ; যদিও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, ঐতিহাসিক অংশের নায়ক তিনজন—রাজসিংহ, ঔরংজীব ও বিধাতাপুরুষ।[৩২] বঙ্কিমের কল্পনায় বিধাতাপুরুষের কোন স্থান নেই। তিনি ইতিহাসের ঘটনা পরম্পরতার মধ্যে অনৈসর্গিকতার কোন প্রভাব দেখতে পাননি।[৩৩] বাকি রইল দুজন—ঔরংজীব ও রাজসিংহ। প্রথম সংস্করণে ঔরংজীব চরিত্র ছিল না, কিন্তু চতুর্থ সংস্করণে তা বিশেষ গুরুত্ব-সহকারে চিত্রিত হয়েছে। কোন কোন সমালোচক ঔরংজীব চরিত্রটিকেই 'রাজসিংহের' প্রধান চরিত্র রূপে গ্রহণ করেছেন।[৩৪] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়, রচনাকালীন মানসিকতা ও বিশিষ্ট শিল্পিমানসের পরিচয় নিলে এই মত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। মনে রাখা দরকার যে, চতুর্থ সংস্করণ 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের শেষ রচনা এবং তৎপূর্ববর্তীকাল বঙ্কিমমানসে ধর্মতত্ত্ব ও

অনুশীলন-তত্ত্বের পূর্ণ প্রভাবের কাল। ‘আনন্দমঠ’ থেকে ‘সীতারাম’ পর্যন্ত ত্রয়ী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন ধর্মতত্ত্বাশ্রিত পূর্ণ মনুষ্যত্বের অনুসন্ধান করে গেছেন। ‘আনন্দমঠে’ চরিত্র কাল্পনিক, ‘দেবী চৌধুরাণীতে’ সে কাল্পনিক এবং স্ত্রীলোক, ‘সীতারামে’ আদর্শের অনেকটা কাছাকাছি গেলেও ইতিহাসের সাক্ষ্যে সীতারাম ব্যর্থ। বঙ্কিম তাঁর বিশিষ্ট ধর্মচেতনাকে এই ব্যর্থতার মূলে রেখেছেন, কারণ সীতারাম বহুগুণান্বিত হয়েও ধর্মভ্রষ্ট। চতুর্থ সংস্করণ ‘রাজসিংহে’র ভূমিকায় এই কথাটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে বঙ্কিম ‘রাজসিংহ’কে তাঁর আদর্শনায়ক রূপে গ্রহণ করার যুক্তি বিন্যাস করেছেন। “অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই, হিন্দু হোক মুসলমান হোক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরংজেব ধর্মশূন্য, তাই তাহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এইজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।” সুতরাং বঙ্কিমের কল্পনায় রাজসিংহই যে নায়করূপে বৃত হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি বঙ্কিমের দীর্ঘ সাধনার ধন, মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শ, অনুশীলিত ধর্মতত্ত্বের জীবন্ত ও বাস্তব বিগ্রহ। রাজসিংহের সৃষ্টিতেই বঙ্কিমের জীবনানুসন্ধানের পরিণতি ও পরিসমাপ্তি। অবশ্য এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পিসত্তা যতখানি চরিতার্থ হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছে আদর্শবাদী সত্তা।

কিন্তু ‘রাজসিংহ’ উপন্যাসের উপকাহিনীটি সকল সমালোচকেরই মুগ্ধ প্রশংসা অর্জন করেছে। প্রায় সকলেই মবারক-জেবুন্নিসার প্রণয়কাহিনীটির মানবিক গুণে আকৃষ্ট হয়েছেন। কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এটিকেই ‘রাজসিংহে, বঙ্কিমের প্রধান বর্ণনীয় চিন্তা করে, ঐতিহাসিক অংশটিকে ‘লিরিক কাব্যের এপিক ভূমিকা’ রূপে অভিহিত করেছেন।[৩৫] জেবুন্নিসা-মবারকের আখ্যানটির মানবিক গুণ নিঃসন্দেহে উচ্চাঙ্গের, কিন্তু তবুও সেটিকেই এই উপন্যাসের প্রধান বর্ণনীয় মনে করায় যেমন অতিশয়োক্তি আছে, তেমনি বঙ্কিম-মানসের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। রবীন্দ্রনাথ জেবুন্নিসাকে উপন্যাস অংশের নায়িকা বলেছেন।[৩৬] স্বভাবতই সেই অনুষঙ্গে মবারক চরিত্রে নায়কত্বের কিছু দাবি জেগে ওঠে। যথেষ্ট ট্র্যাজিক সম্ভাবনায় অভিষিক্ত হয়েও মবারক ওসমানেরই উত্তরসূরীমাত্র।[৩৭] অবশ্য পরিণতশক্তি বঙ্কিমের হাতে তার

চরিত্রে বহুগুণ বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তবুও, তাকে কোনমতেই উপন্যাসের নায়কপদবাচ্য করা যায় না। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে 'রাজসিংহ'ই নায়ক, বঙ্কিমের দৃষ্টিতে আদর্শ নায়ক, অনুশীলন ধর্মতত্ত্বের পরীক্ষিত ও বাস্তব নায়ক। মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে যে বোধ লেখককে আবাল্য অনুসন্ধিৎসু করে তুলেছিল, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌছে লেখক তাঁর প্রার্থিত ও কাঙ্ক্ষিত চরিত্রের দেখা পেয়েছেন। এই সন্ধানে তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল সৃষ্ট নায়কচরিত্রগুলি, কারণ নায়কই "exposes both aim and spirit"।[৩৮]

॥ ১০ ॥

বঙ্কিমী উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারাপথে আমরা চারটি রচনার আলোচনা থেকে বিরত থেকেছি। এই চারটি রচনা যথাক্রমে 'ইন্দিরা' 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী' ও 'দেবী চৌধুরাণী'। এর প্রথম তিনটি রচনাকে 'উপকথা' শ্রেণীভুক্ত করা চলে, যাতে জীবনচিত্রায়ণের চেয়ে রূপকথাজাতীয় গল্প রচনাই লেখককে অধিকমাত্রায় প্রণোদিত করেছিল। এই তিনটি রচনায় তিনটি চরিত্রকে নামতঃ নায়করূপে অভিহিত করা যায়; 'ইন্দিরায়' 'উপেন্দ্র', 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে 'পুরন্দর' ও 'রাধারাণীতে' 'রুক্মিণীকুমার'। কিন্তু নায়িকার বিপরীত চরিত্র হিসাবেই এরা নায়ক পদবাচ্য, নচেৎ কাহিনীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রক অথবা লেখকের aim and spirit প্রকাশের বাহন-কোনভাবেই এরা তাৎপর্যমণ্ডিত চরিত্র নয়। 'দেবী চৌধুরাণীতে' ব্রজেশ্বর অনেকটা নবকুমারের স্বভাবধর্মের অধিকারী, কিন্তু নবকুমারের দ্বিধা বা দার্ঢ্য, কিছুরই সে অধিকারী নয়। প্রফুল্লকে অবশ্য কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে কাহিনীর নিয়ন্ত্রণকারিণী বলা চলে এবং সাহিত্যের সংসারে নায়িকামুখ্য আখ্যানেরও একেবারে অসদ্ভাব নেই; তবু রচনার মধ্যে ধর্মতত্ত্বানুশীলনের তীব্রতা ও গ্রন্থসমাপ্তিতে লেখকের উচ্চ আদর্শবাদ চরিত্রটিকে মর্ত্যমানবীয় স্তর থেকে একেবারে গীতাকথিত অবতারকল্প চরিত্রে উন্নীত করে দিয়েছে। এই সমস্ত কারণে এই রচনাচতুষ্টয়কে আমাদের আলোচনার বিষয়বহির্ভূত করে রাখা হয়েছে। নায়কচরিত্রের ক্রমবিকাশ এই আলোচনার প্রধান বিষয় এবং এই 'নায়ক' কতকগুলি বিশিষ্ট সাহিত্যিক লক্ষণে সমৃদ্ধ। এই রচনা-চতুষ্টয়ে সেই বিশিষ্ট লক্ষণসমৃদ্ধ নায়কের কোন সন্ধানই মেলে না।

॥ ১১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার শেষে বঙ্কিমী নায়ক পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদের ফলশ্রুতি

উচ্চারণের অবকাশ ঘটে। সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণে রেখেই সেটি সূত্রাকারে পরিবেশন করছি :

১. সামাজিক শ্রেণীর পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমের নায়কেরা সকলেই উচ্চবংশ সম্ভূত। জগৎসিংহ, হেমচন্দ্র, সীতারাম, রাজসিংহ—এঁরা প্রত্যেকেই রাজবংশীয় ; নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, অমরনাথ,—এঁরা সবাই অভিজাত ধনীগৃহের সন্তান। নবকুমার, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর,—এঁরা সাধারণ ঘরের সন্তান হয়েও ইতিহাসের বিপুল আবেগে আপন ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃহৎ ঘটনা ও উচ্চপর্যায়ের মানুষের সমশ্রেণীভুক্ত হয়েছে। ভবানন্দ বা জীবানন্দের পূর্ব পরিচয় যাই হোক না কেন, সন্তানধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁরা অসাধারণত্ব অর্জন করেছেন। মোটের উপর বঙ্কিমী নায়কবৃন্দ হয় রাজবংশীয়, নয় অভিজাত, নচেৎ অসাধারণ।

২ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রায় সব নায়কই সক্রিয়, কর্মচঞ্চল। এবা সমগ্র আখ্যানবস্তুটির ধারক ও বাহক। সাধারণভাবে এটিকে ট্র্যাজেডি-নায়কের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যায়, কেন না ট্র্যাজেডিতেই প্রধানত একটি, কখনও বা দুটি চরিত্র সমগ্র আখ্যানটিকে ধরে থাকে। 'হ্যামলেটে' হ্যামলেট, 'কিংলীয়ার'-এ লীয়ার ও কর্ডেলিয়া, 'ওথেলো'তে ওথেলো ও ইয়াগো কিংবা 'ম্যাকবেথে' রাজা ও রানী ম্যাকবেথ এর উদাহরণ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে অবশ্য একনায়কত্বেরই প্রাধান্য, নগেন্দ্রনাথ, গোবিন্দলাল, চন্দ্রশেখর, সীতারাম ও রাজসিংহ এর দৃষ্টান্তস্থল। এই সমস্ত নায়ক আখ্যানের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে ; এদের প্রত্যক্ষ প্রবর্তনা ব্যতীত কাহিনীর গতি অচল হয়ে পড়তো।

৩. প্রধানতঃ শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডির আদর্শেই বঙ্কিম তাঁর আখ্যানের পরিকল্পনা রচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট দ্বিধা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর যুগন্ধর পুরুষ হিসাবে সামাজিক হিতৈষণা তাঁর কর্মোদ্যমের অন্যতম মুখ্য প্রেরণাস্থল ছিল। তিনি অবশ্য নানাভাবে সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্গে নীতির অচ্ছেদ্য সম্পর্কটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। বিবিধ প্রবন্ধের অন্তর্গত 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে তিনি এ বিষয়ে তাঁর মতামত সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। তথাপি তাঁর রচনার মধ্যে আমরা এই দুইয়ের প্রভাবজাত একধরণের দ্বিধা দেখতে পাই। প্রথম তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমী শিল্পী-মানস গড়ে উঠেছিল এবং এই পর্বে ছিল কবি ও শিল্পী সত্তার অপ্রতিহত একাধিপত্য। কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের যুগ থেকেই তাঁর সমাজ

হিতৈষণা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে আর এরই ফলে তাঁর রচনায় মাঝে মাঝেই দ্বিধা এসেছে। এই দ্বিধা তাই তাঁর উপন্যাসের নায়কের একনায়কত্বের একাধিপত্যের মধ্যে কিছুটা দোলাচলতার সৃষ্টি করেছে। নগেন্দ্রের পাশে দেবেন্দ্র, চন্দ্রশেখরের পাশে প্রতাপ,—এরই ফলশ্রুতি মাত্র। আর এই সূত্রে কোন কোন নায়কের মধ্যে সক্রিয়তার আপেক্ষিক অভাব পরবর্তী নিষ্ক্রিয় নায়কসত্তার ক্ষীণ পূর্বভূমিকা রচনা করেছে। উদাহরণ-স্বরূপ, চন্দ্রশেখর চরিত্রের কথা বলা যায়। চন্দ্রশেখর যতখানি না ঘটনার স্রষ্টা, তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটনার দ্বারা সৃষ্ট। তাঁর জ্ঞানার্জনী জীবনবিমুখতা ঘটনার অভিঘাতে তিরোহিত হয়ে তাঁকে রক্ত-মাংসের মানুষে পরিণত করেছে এবং একের পর এক ঘটনার অভিঘাত তাঁকে ক্রমশই জীবন্ত ও পার্থিব করে তুলেছে।

৪. বঙ্কিমের নায়ক-পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রেরই জয় হয়েছে। শিল্পী হিসাবে মানবজীবনের যে বিপুল বিস্তৃতি ও তার ট্র্যাজিক বিষণ্ণতা তাঁকে প্রণোদিত করেছিল, আদর্শবাদী হিসাবে তাতে তিনি তাঁর চূড়ান্ত চরিতার্থতা খুঁজে পাননি। তাই মর্ত্যের ধূলিমালিন্যে অমর্ত্য মাধুরীকে আস্বাদন করার জন্য অমর্ত্যমাধুরীকে মর্ত্যসীমায় স্থাপন করে তারই আদর্শে মর্ত্যজীবনের পরাকাষ্ঠা খুঁজেছেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরূপেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সেই কৃষ্ণের পূর্ণতম ব্যক্তিত্বের প্রতিচ্ছবি সন্ধান করেছেন বাস্তব মানবের মধ্যে। 'সীতারামে' ইতিহাসের প্রতিবন্ধকতায় সে সন্ধান সার্থক হয়নি বলেই 'রাজসিংহে' তাকে তিনি খুঁজে পেয়ে চরিতার্থ হয়েছেন। 'রাজসিংহ' বঙ্কিমের শিল্পী মনের রূপসিসৃক্ষা নয়, আদর্শবাদী মনের পরিতৃপ্তি। বঙ্কিমী নায়ক-ভাবনা তার নিজস্ব পথধারায় এখানেই গন্তব্যে এসে পৌঁছেছে।

॥ ১২ ॥

"বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দেহগঠনের আদর্শ এসেছে ইংরেজি নাটক, বিশেষ করে শেক্সপীয়র থেকে। তাঁর নাটক গড়ার কলাকৌশল, কেন্দ্রবদ্ধরূপ, উপকাহিনীর আনুগত্য তথা তাৎপর্যমুখিতা বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন এবং নাট্যজগৎ থেকে নিয়ে এসে উপন্যাসকথনে প্রয়োগ করেছিলেন। এই পথ ধরেই তিনি একটা মৌলভঙ্গী আবিষ্কার করলেন যা নাটকীয় হলেও ঠিক নাটকের নয়।...বঙ্কিম নাট্যভঙ্গীকে মানবচিত্তের গভীর বোধের সঙ্গে যুক্ত করে উপন্যাস শিল্পের নতুন সম্ভাবনা তৈরী করলেন।"[৩৭] বঙ্কিমচন্দ্রের

উপন্যাস রচনার গঠনরীতি প্রসঙ্গে শেক্সপীয়রীয় নাট্যরীতির প্রভাব এক সর্বজনবিদিত সত্য। এই আদর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র শেক্সপীয়রের ট্র্যাজেডিগুলিকেই বেছে নিয়েছিলেন। কেন না যে জীবনসমস্যা ও তার পরিণাম বঙ্কিম উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়, তা ট্র্যাজেডিধর্মেই আপন প্রকাশ চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে। আর এই ট্র্যাজেডি নির্ভরতার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তার রচনায় একটি বা কখনও কখনও দুটি চরিত্র কেন্দ্রীয় ঘটনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আখ্যানবস্তু তাই সর্বত্রই কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়কের সূত্রেই সংগ্রথিত হয়েছে। সাধারণভাবে যে সমস্ত story element বা গল্পবস্তু একটি অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত হয়ে plot বা কাহিনী-বৃত্ত গড়ে তোলে, বঙ্কিমের উপন্যাসে তার সফল দৃষ্টান্ত সর্বত্র দৃশ্যমান। তাছাড়া, ট্র্যাজেডি নাটকের মতো একটি কেন্দ্রীয় ভাবনাই এখানে একটি বা দুটি চরিত্রের কেন্দ্রীয় সূত্রে একটি গোটা কাহিনীবৃত্ত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অপরিমিত ও অসংযত উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে অবশ্যম্ভাবী পতনের মূল ম্যাকবেথের জীবনে তারই ভাষ্য রচিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবীর দোলাচলচিত্ততা যে আত্মবৈনাশিক, হ্যামলেট তারই প্রমাণক্ষেত্র। বঙ্কিমের উপন্যাসেও নীতি ও ধর্মবোধের সদ্‌ভাবে ও অভাবে মানবজীবনের পরিণাম প্রদর্শিত হয়েছে। এখানেও একটি কেন্দ্রীয় ভাবনাবিন্দু ধীরে ধীরে নাটকীয় রীতি আশ্রয় করে উর্ধ্বগতি লাভ করে চরম মুহূর্তের শিখর স্পর্শ করে পুনরায় নিম্নমুখী হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কিংবা 'রাজসিংহের' গঠনকৌশলে এই নাট্য-রীতির দৃঢ়বদ্ধতা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তেব উইলে' বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হওয়া থেকে তার ফলাস্বাদনে মানব-জীবনের পরিণাম সম্বন্ধে ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে এবং নগেন্দ্রনাথ দেবেন্দ্রনাথ ও গোবিন্দলালের কেন্দ্রীয় সূত্রে এই পরিণাম-কাহিনী বিধৃত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই উপন্যাসের নায়করাও সমগ্র ঘটনা-বৃত্তটিতে কেন্দ্রশক্তিরূপে বিরাজ করেছে। এর প্রধান কারণ বঙ্কিমী উপন্যাসের নায়কদের সক্রিয়তা, যারা শুধুমাত্র ঘটনার দ্বারা পরিচালিত হয় না, যারা নানাভাবেই ঘটনাকে পরিচালিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলাবদ্ধ ঘটনাবৃত্ত বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিকজগতে নিঃসঙ্গ মহিমায় বিরাজ করছে। এর প্রধান কারণ বঙ্কিমী ভাবনায় এক নায়কের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ও গ্রন্থের উপজীব্য ও প্রতিপাদ্য সম্পর্কে নিঃসংশয় চেতনা। যেখানেই এর ব্যত্যয় ঘটেছে সেখানেই উপন্যাসের গঠনরীতিতে

শৈথিল্য দেখা দিয়েছে, মূল ও উপকাহিনীর মধ্যে যোগসূত্র সর্বত্র সুসমঞ্জস হয়নি। প্রসঙ্গত 'চন্দ্রশেখর' ও 'আনন্দমঠের' কথা উল্লেখযোগ্য। প্রতাপ-শৈবলিনী-চন্দ্রশেখর ও দলনী-মীরকাশিমের কাহিনীর মধ্যে বঙ্কিমের কল্পনা ও ভাবনা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে। একদিকে তাঁর নিজস্ব ধর্মবোধ ও তার ব্যত্যয়ের ঘটনা ও অন্যদিকে নিয়তি-নির্ধারিত জীবনের অসহায় ঘটনাময়তা উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দুটিকে স্থির ও সংহত হতে দেয়নি। তাই চন্দ্রশেখর চরিত্রের সূত্রে দুটি ঘটনার মধ্যে যথাসাধ্য যোগসূত্র রক্ষা করতে চেষ্টা করেও বঙ্কিম সফল হয়ে উঠতে পারেননি, 'আনন্দমঠে'ও অনুরূপভাবে ভবানন্দ-কল্যাণী, জীবানন্দ-শান্তি ও সত্যানন্দের মহাব্রতের মধ্যে লেখকের কল্পনা ত্রিধাবিভক্ত হয়েছে। এখানে যেমন কোন চরিত্রই নায়কের মর্যাদা পায়নি, তেমনি গোটা আখ্যানেও কোন অখণ্ড কাহিনীবৃত্ত গড়ে ওঠে নি।

উৎস-নির্দেশ

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।

২। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিম সরণী।

৩। A. Nicoll—The Theory of Drama.

৪। ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়)।

৫। ডঃ সুকুমার সেন—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য়)।

৬। A. Nicoll—The Theory of Drama.

৭। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)

৮। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র।

৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যয়—ব-সা-উ-ধা ; ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত —বঙ্কিমচন্দ্র।

১০। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিম সরণী।

১১। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)

১২। ঐ — ঐ

১৩। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র।

১৪। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)

১৫। বঙ্কিমচন্দ্র—চন্দ্রশেখর (৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ)।

১৬। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিমসরণী।

১৭। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা ই (২য়)।

১৮। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিম সরণী।
১৯। ঐ — ঐ
২০। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)
২১। বঙ্কিমচন্দ্র—কৃষ্ণকান্তের উইল
২২। প্রমথনাথ বিশী—বঙ্কিম সরণী।
২৩। ঐ — ঐ
২৪। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)
২৫। বঙ্কিমচন্দ্র—ধর্মতত্ত্ব (২০শ অধ্যায়)।
২৬। প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত—উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম।
২৭। রাজশেখর বসু-কৃত অনুবাদ (২/৬১—৬৪)।
২৮। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (২য়)
২৯। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
৩০। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র।
৩১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
৩২। রবীন্দ্রনাথ—বঙ্কিমচন্দ্র (আধুনিক সাহিত্য)
৩৩। প্রথমনাথ বিশী—বঙ্কিম সরণী।
৩৪। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র।
৩৫। মোহিতলাল মজুমদার—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস।
৩৬। রবীন্দ্রনাথ—রাজসিংহ (আধুনিক সাহিত্য)।
৩৭। ডঃ সুকুমার সেন —বা-সা-ই (২য়)।
৩৮। A. Nicoll—The Theory of Drama.
৩৯। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি।

রবীন্দ্রনাথ

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাসে স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথ। যদিও ইতিহাসের তথ্যতালিকায় মধ্যবর্তীপর্বের দু'একজন লেখকের কথা উল্লিখিত হতে পারে, কিংবা কারো কারো এক একটি রচনায় সমকালে কিছুটা আলোড়নও জেগেছিল তবুও সামগ্রিকভাবে বাংলা উপন্যাসের বিবর্তনধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই রবীন্দ্রনাথের অবস্থান। আরো স্পষ্ট ভাষায় বললে বলা যায় যে বাংলা উপন্যাসের যে যাত্রাপথ বঙ্কিমের দ্বারা নির্দেশিত, রবীন্দ্রনাথই তাকে যথার্থভাবে আধুনিক পদবাচ্য করে তার ভবিষ্যৎ গন্তব্যটি চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মোটামুটিভাবে বাংলা উপন্যাসের সমস্ত সমালোচকই একমত হয়েছেন যে বঙ্কিমী পথে যাত্রারম্ভ করলেও, অনতিবিলম্বেই রবীন্দনাথ নিজস্ব পথরেখাটি চিনে নিতে পেরেছিলেন এবং দুটি একটি গুরুমুখী সৃষ্টির পরেই তাঁর রচনায় আত্মনির্ভরতা স্পষ্ট হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই কারণে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র পরিচয়টি জানতে হলে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর মিল ও প্রভেদের বিষয়টি আগে ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার; দেখে নেওয়া দরকার—কোন্ বিশেষগুণে বঙ্কিমের উপন্যাস একান্তভাবেই বঙ্কিমী, আর রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রাবীন্দ্রিক। খুঁজে নিতে হবে উভয় স্রষ্টার মনের সেই গোপন মহলটি যেখানে তাঁদের অন্তরতম মনোভঙ্গিটি ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। আর উভয় ব্যক্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয়পর্ব সমাপ্ত হলেই বাংলা উপন্যাসে উভয়ের অবদানগত পরিমাপটিও যথার্থমুখী হতে পারবে। এ জন্য বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ভূমিকাটি খুঁজে নিতে হলে তাঁকে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেই জানতে হবে। তাঁর এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি বঙ্কিমী উপন্যাসের জগৎ ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

॥ ২ ॥

"বঙ্কিমচন্দ্রের পর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায়ের অবতারণা হইয়াছে। যাহাকে আমরা আধুনিক বা অতিআধুনিক যুগ নামে অভিহিত করি, তাহার সূচনা বঙ্কিমের পরবর্তী যুগে। এই যুগের প্রবেশ তোরণে যে নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত রহিয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথের।"[১] সমালোচকের এই অভিমতে স্থিরলক্ষ্য থেকে আমরা অতঃপর বঙ্কিচন্দ্র ও

রবীন্দ্রনাথের মানসভঙ্গি, রচনানীতি ও উপন্যাসচিন্তার পার্থক্য অনুধাবনে সচেষ্ট হবো।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানতঃ দুটি প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই বঙ্কিম-পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার মুক্তিপথ নির্দেশ করেছেন। এক. ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোধানে, দুই. সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার প্রবর্তনে। যে সুগভীর কৌশলে বঙ্কিম ইতিহাস, রোমান্স ও বাস্তবজীবনকে একসূত্রে বেঁধে তাঁর অনবদ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনা করেছিলেন তাঁর পরবর্তী অক্ষম অনুকারীরা তা একটুও আয়ত্ত করতে পারেননি। তাছাড়া সামাজিক পরিমণ্ডলও ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার অনুকূল ছিলনা। কারণ উনিশ শতকের শেষ পর্ব ছিল নানাধরণের বিতর্ক ও আন্দোলনে সংক্ষুব্ধ, যেখানে নিশ্চিন্তমনে কল্পনায় অতীতচারিতা কিছুটা কষ্টসাধ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠতা ও তাঁর ইতিহাসপ্রীতিই তাঁকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে সফলকাম করেছিল। কিন্তু তিনি নিজেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে এই অতীতচারিতা পরিহার করে সমসাময়িক বাস্তবক্ষেত্রে নেমে এসেছিলেন এবং সেখানেও দেখা গেছে যে উপন্যাসের পক্ষে বাস্তব সমাজজীবন মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। একটা বিষয় এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, উনিশশতকের উপন্যাসের যাত্রা শুরু হয়েছিল সামাজিক রচনা দিয়ে, আর অন্ততঃ দুজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভার মধ্যে দ্বিচারিণী সৃষ্টি স্বভাব লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসের পাশে সামাজিক উপন্যাসের মতো রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর শতবর্ষব্যাপী ভারত ইতিহাসের সুবৃহৎ পরিমণ্ডল ছেড়ে 'সমাজ' ও 'সংসারের' শক্ত মাটিতে পরিচিত পরিবেশে পদস্থাপনা করেছিলেন।

তাই অত্যন্ত সঙ্গত কারণে সামাজিক উপন্যাসেই বাংলা উপন্যাসের আধুনিক যুগের যাত্রাপথ নির্দেশিত হয়েছিল। কেননা, বিরল প্রতিভার উৎকৃষ্ট প্রযোজনায় বঙ্কিম যে উচ্চাঙ্গ উপন্যাসগুলি, অবশ্যই ঐতিহাসিক, রচনা করেছিলেন তা ছিল বাংলাসাহিত্যের একটি উজ্জ্বল অথচ ব্যতিক্রান্ত অধ্যায়। কেননা সামাজিক উপন্যাসই বাংলা উপন্যাসের পরমাগতি এবং প্যারীচাঁদের হাতেই তার প্রথম সুস্পষ্ট নির্দেশনা। স্কটের উপন্যাস, শেক্সপীয়রের নাটক, সুগভীর অতীত-অনুসন্ধিৎসা ও প্রখর দেশানুরাগ বঙ্কিমকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় মুখ্যত প্রণোদিত করেছিল। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনুরূপ একটি ঘটনার সাদৃশ্যও উল্লেখ করা যায়।

গীতিকবিতানির্ভর বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকে রঙ্গলাল-মধুসূদনের হাতে আখ্যানধর্মী ও মহাকাব্যের যে কৃত্রিম ক্লাসিকধারা উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের অনুবর্তনে তাকেই একদা বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রধান ধারা বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু কাল ও সাহিত্যের নিগূঢ় নিয়মে শেষপর্যন্ত গীতিধর্মী বাংলা কবিতা আপন পথরেখাটি ঠিকই খুঁজে নিয়েছিল এবং প্রমাণ করেছিল মহাকাব্যগুলি যতই উচ্চাঙ্গের শিল্পকর্ম হোক না কেন, তা মূলতঃ বাংলা কবিতার সঙ্গে নাড়ীর যোগে সংযুক্ত নয়।

তাই বাংলা সামাজিক উপন্যাসেই আধুনিকযুগের যাত্রাপথ সুনির্দিষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রেও লক্ষণীয় যে বঙ্কিমের হাতেও অন্ততপক্ষে দু'খানি স্মরণীয় গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যারা অনায়াসেই আধুনিক বাংলাউপন্যাস-গঙ্গার গোমুখী উৎসরূপে নির্দেশিত হতে পারতো। বস্তুত 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা বাস্তবধর্মী সামাজিক উপন্যাসের অগ্রপথিক এবং নায়ক নায়িকার জীবন-সমস্যার দিক দিয়ে পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের অভ্রান্ত উৎসরূপেই বিরাজ করছে। তবুও যে সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতাবোধ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রাণমন্ত্র. মনস্তাত্ত্বিকতার যে গহনচারিতা আধুনিক ঔপন্যাসিককে মানবহৃদয়সমুদ্রের ডুবুরিরূপে গড়ে তুলেছে তার অভাব রয়েছে বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসের বাস্তবতায়। সেখানেও বঙ্কিম রোমান্সের সর্বগ্রাসী প্রভাব থেকে আত্মমুক্তি সংগ্রহ করতে পারেননি। কুন্দের স্বপ্নদর্শন, সূর্যমুখীর আকস্মিকভাবে অন্তর্ধান ও পুনরাবির্ভাব কিংবা প্রসাদপুরের কুঠীতে গোবিন্দলাল-নিক্ষিপ্ত পিস্তলের গুলির শব্দে রোমান্সজগতের যে আয়তন নির্মিত হয়েছে, রবীন্দ্র-উপন্যাসে তার ক্ষীণ ইঙ্গিতটুকুও দৃষ্ট হয়না। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে এই রোমান্স বহির্ঘটনা পরিত্যাগ করে মানবচরিত্রের অন্তর্লোকের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে এবং এরই ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের গৃহীত পদ্ধতি থেকে রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথকরূপ পরিগ্রহ করেছে। বাস্তব পরিবেশ বর্ণনা ও নরনারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে বঙ্কিম বিশেষ সময় ব্যয় করেননি ; তাঁর কাহিনী বহির্ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিহত হয়েই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাই ঘটনাবৈচিত্র্যই রচনাকে মনোহারী করে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, তিনি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত রচনায় উৎসাহী নন, তাঁর কাহিনী এগিয়ে চলেছে পাত্রপাত্রীদের মনোজগতের রহস্যময় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ঘাতপ্রতিঘাতের সহায়তায়। একজন মনস্বী সমালোচকের উক্তির দ্বারা বিষয়টি ব্যক্ত করা যায় :

"বাহিরের ঘটনাসংঘাত অথবা ব্যক্তিচিত্তবৃত্তির বিক্ষোভ নয়, পাত্রপাত্রীর হৃদয়াবেগ ও হৃদয়বৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিসংঘর্ষ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রিত করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে পাত্রপাত্রী বাহিরের সংঘটনের হাতের পুতুলের মতো, বহির্জগৎই যেন একসঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ও সূত্রধার। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বহির্জগৎ সূত্রধার তো নয়ই, রঙ্গমঞ্চও নয়। রঙ্গমঞ্চের অন্তঃপট মাত্র। পাত্রপাত্রীর হৃদয়ই রঙ্গমঞ্চ এবং রস জমিয়াছে সেই হৃদয়ের আলোড়নে ও সংঘাতে। রবীন্দ্রনাথের আগের উপন্যাসে পাত্রপাত্রী যেন নাচের পুতুল, তাহাদের বাহিরের চেহারা দর্শকের গোচরে কিন্তু মনের চেহারা কিছুমাত্রও গোচর নয়।...যেখানে বাহিরের ঘটনার প্রাধান্য, সেখানে এমন ভূমিকাই আবশ্যক, কিন্তু যেখানে অন্তর্দ্বন্দ্বই সর্বস্ব সেখানে অচল।"[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতি থেকে রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির একটি স্পষ্ট প্রভেদলক্ষণ এই বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বাস্তবতার আপেক্ষিক বাহুল্যে। বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটিভাবে নাট্যরীতির আশ্রয়ী ছিলেন তাই তাঁর উপন্যাসে পাত্রপাত্রীর ও আখ্যানবস্তুর পরিণাম সংঘটিত হয়েছে নাটকীয় ঘটনাপরম্পরার মধ্যদিয়ে। এই ঘটনাময়তা প্রায়শই বহিরঙ্গমূলক। এমন কি যে রচনাটিতে চরিত্রের উত্তমপুরুষের জবানিতে কাহিনী ব্যক্ত হয়েছে, সেই 'রজনী'তেও ঘটনা পরিণামে চরিত্রের আন্তরিক সংক্ষোভের চেয়ে বাহিরের ঘটনাবলীই অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়েছে। কোন কোন রচনায়, যেমন 'বিষবৃক্ষে', নগেন্দ্র বা সূর্যমুখীর লেখা পত্রে তাদের অন্তরের গহনলোকের কিছুটা উদ্‌ঘাটন হয়েছে। তবুও সেখানে মোটামুটিভাবে বহির্ঘটনাই আখ্যান নিয়ন্ত্রণ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নধরণের। হয়তো মূলত কবিস্বভাব বলেই রবীন্দ্রনাথের ভাবনা আবেগপ্রধান ও তা সর্বদাই মানবমনের গহনচারিতার পক্ষপাতী। যে বাস্তবজগৎ মানবসংসারের চারপাশে নিত্য উচ্ছ্বসিত ঘটনাবহুলতার মধ্যে ব্যক্ত হয়ে চলেছে, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা যথেষ্ট সত্য বলে গৃহীত হয়নি। 'চোখের বালি'র ভূমিকায় তিনি মনোলোকের গহন থেকে যে সত্যকে বের করে আনার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ তাকেই সত্যতর ও প্রকাশযোগ্য বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া, ঘটনাজাল-সৃষ্টি ও ঘটনার চমৎকারিত্ব গড়ে তোলার দিকে রবীন্দ্রনাথের স্বভাবতই অনীহা ছিল, তাই তাঁর রচনার সূচনাপর্বে তিনি বৈচিত্র্যের মধ্যে সমাহিত চরিত্রের আত্মচিন্তার অবকাশ রচনা করতে পেরেছিলেন।

অতএব, বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব উপন্যাসের যাত্রাপথটিকে সুনির্দিষ্ট করে তাকে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ দিয়েছে। এই পরিবর্তনের লক্ষণগুলি সূত্রাকারে নিম্নরূপ :

১। ঐতিহাসিক উপন্যাসের তিরোধান।

২। সামাজিক উপন্যাসে এক সূক্ষ্মতর ও ব্যাপকতর বাস্তবতার প্রবর্তনা।

৩। বহির্ঘটনামূলকতার পরিবর্তে অন্তর্বিশ্লেষণ-প্রবণতা।

৪। নাট্যরীতির পরিবর্তে আবেগধর্মী কাব্যরীতি।

৫। রোমান্সধর্মিতার ক্রমবিলুপ্তি।

॥ ৩ ॥

কিশোর বয়সের রচনা অসম্পূর্ণ 'করুণা'কে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথ মোট বারোটি উপন্যাস রচনা করেছেন। রচনাগুলির মধ্যে সময়ের ব্যবধান, রীতির প্রভেদ ও জীবনবোধের পরিণতির দরুণ কতকগুলি স্পষ্ট স্তরবিভাগের অবকাশ রয়েছে। উপন্যাসগুলির রচনাকাল নীচে দেওয়া হলো :

১। করুণা—১২৮৪ বঙ্গাব্দ

২। বৌঠাকুরাণীর হাট—১২৮৯ বঙ্গাব্দ

৩। রাজর্ষি—১২৯৩ বঙ্গাব্দ

৪। চোখের বালি—১৩০৯ বঙ্গাব্দ

৫। নৌকাডুবি—১৩১২ বঙ্গাব্দ

৬। গোরা—১৩১৬ বঙ্গাব্দ

৭। চতুরঙ্গ—১৩২৩ বঙ্গাব্দ

৮। ঘরেবাইরে—১৩২৩ বঙ্গাব্দ

৯। যোগাযোগ—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

১০। শেষের কবিতা—১৩৩৬ বঙ্গাব্দ

১১। দুইবোন—১৩৪০ বঙ্গাব্দ

১২। মালঞ্চ—১৩৪০ বঙ্গাব্দ

১৩। চার অধ্যায়—১৩৪১ বঙ্গাব্দ

রবীন্দ্রউপন্যাসের এই কালানুক্রমিক রচনাতালিকার দিকে লক্ষ্য রাখলে চারটি স্পষ্ট কালব্যবধানের পরিচয় পাওয়া যাবে। 'করুণা' সহ প্রথম তিনটি রচনার পর ষোলো বছরের দীর্ঘ বিরতির পর 'চোখের বালি' দিয়ে উপন্যাস রচনার একটি পর্ব ; তারপর 'গোরা'র পর আবার দশবছরের ব্যবধানে 'চতুরঙ্গ'

ও 'ঘরেবাইরে' একই বছর প্রকাশিত ; সর্বশেষে আবার তেরোবছরের ব্যবধানে 'যোগাযোগ' 'শেষের কবিতা' দিয়ে আর একটি পর্ব, যা রবীন্দ্রউপন্যাসের শেষ পর্যায়। কালগত এই ব্যবধানকে সামনে রেখে রবীন্দ্রউপন্যাসেরও যুগবিভাগ করা চলে। প্রথম তিনটি রচনায় প্রথমপর্ব, 'চোখের বালি' থেকে 'গোরা' পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব, এবং 'চতুরঙ্গ' থেকে 'চার অধ্যায়' পর্যন্ত তৃতীয় পর্ব, যদিও এর মধ্যে আবার দুটি উপবিভাগ সম্ভবপর। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' এক পর্বের ও বাকিগুলি অন্যপর্বের। ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে তিনটি স্তরে বা পর্বে বিন্যস্ত করে নিয়েছেন ; তাঁর মতে প্রথমস্তরে হৃদয়ভাবের প্রবলতা ; দ্বিতীয়স্তরে প্রেমসম্পর্কের প্রাধান্য, তৃতীয়স্তরে বুদ্ধিরসের প্রাধান্য, যেখানে হৃদয়সংঘাত ও মানসদ্বন্দ্ব জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে উপস্থাপিত।[৩] অবশ্য 'গোরা'কে তিনি তৃতীয়স্তরের অন্তর্ভুক্ত করার আগ্রহী। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রউপন্যাসের পর্ববিভাগ করেছেন কিছুটা পৃথকভঙ্গিতে।[৪] তাঁর মতে রবীন্দ্রউপন্যাস প্রথমপর্বে প্রধানত ঘটনামুখী ; এপর্বে রবীন্দ্রনাথের উপর বঙ্কিমী প্রভাব স্পষ্ট ; 'চোখের বালির' পরে রচিত হলেও 'নৌকডুবি'কেও তিনি এই পর্যায়ভুক্ত করেছেন। 'চোখেরবালি' ও 'গোরা' এক পর্যায়ভুক্ত এবং 'চতুরঙ্গ' থেকে বুদ্ধিনিভর, শিথিল কাহিনী অপেক্ষাকৃত আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত রচনা এবং সর্বশেষে 'দুইবোন' থেকে বাকি রচনাগুলি ক্ষুদ্রকায় উপন্যাস।

আমাদের মতে রবীন্দ্র উপন্যাসধারাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত স্তরপরম্পরায় বিন্যাস করা চলে .

১। করুণা—এটি রবীন্দ্রনাথের একটি অসম্পূর্ণ প্রয়াস, কিন্তু এর মধ্যে রবীন্দ্র উপন্যাসের যাত্রারম্ভটি সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে, তাই এটিকে তাঁর উপন্যাসগুলির একটি প্রাথমিক খসড়া বলা যায়।

২। 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'—এই দুটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ পুরোনো রীতির অনুবর্তন করেছেন। যদিও এখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনেকটাই ফুটেছে। ঐতিহাসিক আবেষ্টনী গ্রহণ করলেও রাবীন্দ্রিক আবেগধর্মী মনঃসমীক্ষণের সূচনা এখানে দেখা যায়।

৩। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা'—এই তিনটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ইতিহাসের পট ছেড়ে সামাজিক পটকে আশ্রয় করেছেন, বিশেষ করে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের পটভূমিকায় তিনি এখানে মানবজীবনের স্বরূপ খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন। 'গোরা'তে গিয়ে এই সন্ধানপর্ব চরমে উঠেছে এবং

ব্যক্তির জীবন যে সামাজিক হয়েও সামাজিকতার ঊর্ধ্বে, তা 'গোরা'র আত্মসঙ্কট ও সঙ্কটমুক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৪। 'চতুরঙ্গ' থেকে 'চার অধ্যায়'—এই সাতখানি উপন্যাসে ইতিহাস বা সমাজ কোনটাই মানবজীবনের স্বরূপ সন্ধানের যথার্থ পটরূপে নির্ধারিত হয়নি। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেই তার সত্তার চরিতার্থতা খুঁজেছেন। ব্যক্তি এ পর্বে নানা পটে আপন স্বরূপ উপলব্ধি করতে চেয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিত্বই যে চরম ও পরম এই সত্যে পৌঁছে গেছে।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়কের ক্রমবিবর্তনের ধারাপথটি এই স্তরপরম্পরায় অনুসন্ধান করাই আমাদের মতে সঙ্গত বলে বোধ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথেরও মানসপরিণতির একটি সুস্পষ্ট যাত্রাপথ আছে, তাকে ঠিকমত অনুসরণ করতে পারলেই তাঁর স্রষ্টামানসের সম্পূর্ণ পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাবে।

॥ ৪ ॥

মানবজীবনের সার্থকতা সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাই ঔপন্যাসিককে উপন্যাস রচনায় প্রণোদিত করে। দেশ ও কালের পটে বিধৃত মানবজীবন কোন্ বিশেষ সার্থকতা বহন করে, তা জানা এবং জানানোই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন 'এ জীবন লইয়া কি করিব' এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর সাহিত্যে তার উত্তর খুঁজেছেন এবং ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও সমকালীন সমাজ-পরিবেশে তার একটি সদুত্তরও পেয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও অনুরূপ একটি মহৎ অনুসন্ধিৎসা দেখতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায় একে Personality বলা যায়। 'ব্যক্তিত্ব' দ্বারা শব্দটির ঠিক ভাষান্তর হয় না, কেননা ব্যক্তিত্ব ও চারিত্র্য—উভয়ের সম্মিলনেই এই Personality গড়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সাহিত্য-সাধনায় এই Personality-রই সন্ধান করে ফিরেছেন। যে সীমা-অসীমের মিলন সাধনের প্রয়াস সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল বীজমন্ত্র বলে স্বয়ং কবি "জীবনস্মৃতি'তে উল্লেখ করেছেন তাও আসলে এই Personality-কে আয়ত্ত করার প্রয়াস। এই অনুসন্ধান তাঁর প্রতিটি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের পরিকল্পনাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সর্বত্র সার্থকতার পরমতীর্থে পৌঁছাতে পারেননি। হয় ইতিহাসের পটে, নয় সমাজের পরিস্থিতিতে এই পরমলক্ষ্য তিনি কদাচিৎ খুঁজে পেয়েছেন। 'রাজর্ষি'তে গোবিন্দমাণিক্য কিংবা 'গোরা'য় গোরা—তাঁর এই প্রাপ্তির স্বর্ণফসল;

নতুবা অন্যত্র আমরা এই পরমের অভাবে অপূর্ণতাকেই দেখতে পাই। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের অনুসন্ধান-প্রয়াস এতটা সরলীকৃত নয়, তা জটিল এবং অন্তর্গূঢ়। কখনো একটি চরিত্রে, কখনো বা যুগলচরিত্রের সহায়তায়ও তিনি তাঁর এই সন্ধানপর্ব চালিয়েছেন। কোথাও বা পরিপূর্ণতা থেকে ভ্রষ্ট মানুষের জীবনের বিকৃতি ও অপূর্ণতা দেখিয়ে তির্যকরীতিতে তাঁর পরিপূর্ণতার ধ্যানটি আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, স্বদেশীর মোহে সন্দীপ ও সন্ন্যাসের মোহে অতীনকে প্রতিষ্ঠিত করে তিনি দুটি প্রচণ্ড জীবনী-শক্তির যে করুণ অপচয় দেখিয়েছেন, তা তাঁর এই তির্যক ভঙ্গিরই উদাহরণ। এখানে Personality-র পূর্ণচাঁদকে বিকৃতির রাহুগ্রাসে ফেলে তিনি পূর্ণচাঁদের মহিমার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়ক-পরিকল্পনার ক্রমবিকাশে আমাদের এই বিষয়টির ওপর জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে এবং নায়ক-চরিত্রায়ণে রবীন্দ্রনাথ আর যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই প্রদর্শন করুন না কেন শেষ বিচারে এটাই হবে চরম মানদণ্ড।

॥ ৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বহির্ঘটনামূলক বলে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রায় সকলেই বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে গড়ে তোলা মানুষ, তাদের সামগ্রিক জীবনপরিণতি ও মানসোৎকর্ষ এই ঘটনাগত প্রতিক্রিয়ারই অবদান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পদ্ধতির ভিন্নতা সুপরিজ্ঞাত; তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বমূলক জটিলতারই রূপকার। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা এই আন্তরিক টানাপোড়েনেই মানুষ হয়ে উঠেছে। বাইরের ঘটনা যে তাদের স্পর্শ করেনা, তা নয়, কিন্তু সেই ঘটনা তাদের আন্তরিকজগতে যে বিক্ষোভ জাগিয়ে তোলে, তারই প্রতিক্রিয়ায় সে বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রথম পর্বের কয়েকটি ঘটনামুখ্য আখ্যান বাদ দিলে, সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্র-উপন্যাস সম্পর্কে এটি একটি সামান্য লক্ষণ। এটুকু ছাড়াও, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসজগতের নায়কদের থেকে রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়কেরা আরও কয়েকটি লক্ষণে স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ, বঙ্কিমের কাজ ছিল প্রধানতঃ রাজাবাদশাহ বা ধনী-জমিদারদের নিয়ে। একমাত্র নবকুমারকে বাদ দিলে, তাঁর আর কোন নায়কই, সাধারণ মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষ নয়। রবীন্দ্রনাথের চরিত্ররা সকলেই উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ। এমনকি রাজবংশীয় প্রতাপাদিত্য-বসন্তরায় বা উদয়াদিত্য কিংবা রাজবংশীয় গোবিন্দমাণিক্য বা নক্ষত্ররায়, এরাও যেন চরিত্রলক্ষণে ও জীবনস্বভাবে মধ্যবিত্তশ্রেণীর। কেননা তাঁদের জীবনাচরণে কোথাও এমন কিছু ব্যক্ত হয়নি,

যাকে রাজকীয় ঐশ্বর্য বলে মনে করা যায়। দ্বিতীয়তঃ বঙ্কিমের নায়করা প্রায় সকলেই মোটামুটিভাবে সক্রিয়; তারা শুধুমাত্র ঘটনার নীরব সাক্ষী বা ঘটনানিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিমাত্রই নয়, ঘটনার নিয়ন্ত্রণকারীও বটে; রাজবংশীয়দের কথা ছেড়ে জমিদার শ্রেণীর অভিজাত মানুষের কথা ধরলেও দেখি যে, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ বা অমরনাথ তাদের কর্মোদ্যম ও জঙ্গমতা দিয়ে ঘটনাকে নানা খাতে পরিচালিত করেছে। রবীন্দ্রনাথে একমাত্র 'গোরা'কে বাদ দিলে প্রায় সর্বত্রই চরিত্ররা ঘটনাতাড়িত, অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় ও আত্মমুখী। তারা বহুলাংশেই পরিচিত জীবনের ক্ষেত্র থেকে আহৃত মানুষ। সুখ-দুঃখ-দ্বিধাদ্বন্দ্বে সমাকীর্ণ তাদের চেতনা, তারা তাদের দ্বিধাদীর্ণ মনের জন্যেই আখ্যানে জটিলতা আনে, যা মোচন করতে তারা বহিরঙ্গ-সক্রিয়তা অপেক্ষা চিন্তাগত ক্রিয়াশীলতারই পরিচয় দেয় বেশি। এই কারণে বঙ্কিমযুগ থেকে রবীন্দ্রযুগে উত্তীর্ণ হয়ে, বাংলা উপন্যাসের নায়কচরিত্র ক্রমশঃ একদিকে যেমন তার শ্রেণীগত কৌলিন্য মোচন করে নিম্নাভিমুখী হয়ে সাধারণ্যে মিলতে চেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি তাদের বহির্জাগতিক চাঞ্চল্য ক্রমেই সংযত ও সংহত হয়েছে এবং বিক্ষোভ-জটিল অন্তর্দ্বন্দ্বে মথিত করে তাদের অন্তর্লোককে ক্ষতবিক্ষত, ক্রিয়াশীল ও সমন্বয়সচেষ্ট করে তুলেছে। বাইরের জগতে, ঘটনার হাতে তারা যত মার খেয়েছে, অন্তরের জগতে, নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তারা ততই আত্মস্থ হতে চেয়েছে। এই রীতিই সাধারণভাবে রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়কদের ব্যক্তিত্ববিকাশে ও চরিত্র-রূপায়ণে প্রযোজিত হয়েছে এবং এই পথেই রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের স্বাভাবিক বিবর্তনধারাকে ভবিষ্যৎ যাত্রাপথে বহুদূর প্রসারিত করে দিয়েছেন। অবশ্য উদাহরণ সর্বদাই তত্ত্বের চেয়ে স্পষ্টতর, এবং অতঃপর রবীন্দ্র-উপন্যাসের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতার আলোচনাতেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের নায়ক চরিত্র রূপায়ণের পরিপূর্ণ তাৎপর্যটি অনুধাবন করতে আমরা সচেষ্ট হবো।

॥ ৬ ॥

রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রাথমিক পর্বে আমরা তিনটি রচনাকে নির্দিষ্ট করেছি। ১২৮৪ বঙ্গাব্দ থেকে ১২৯৩ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সময়সীমার মধ্যে এই গ্রন্থতিনটি রচিত। এর মধ্যে 'করুণা' অসম্পূর্ণ রচনা এবং বাকিদুটি তাঁর অপরিণত শিল্পিসত্তার সৃষ্টি হলেও তারা সম্পূর্ণ। এই সময়সীমায় বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের উচ্চমঞ্চে আসীন এবং তাঁর সক্রিয় উপস্থিতিতে বাঙালীর মন সম্পূর্ণভাবেই বঙ্কিমাশ্রিত। স্বভাবতই কিশোর ও তরুণ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে

বঙ্কিমের এই সর্বাতিশায়ী উপস্থিতি ও প্রভাব অস্বীকার করার কোনই উপায় ছিলনা এবং তাঁর প্রথম রচনা 'করুণা' যে বঙ্কিম-সরণীতে পথিকবৃত্তি নিয়েছে, তা গ্রন্থপাঠে যে-কোনও পাঠকই স্বীকার করবেন। উপন্যাসের কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রনির্বাচন, ঘটনাবহুলতা ও কিছু কিছু বিশেষ মুহূর্ত রচনায় বঙ্কিমী রীতির স্পষ্ট অনুবর্তন দেখা যায়। তবু এর মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের আত্মস্বভাবের ঘোষণাটি একেবারে অশ্রুত থাকেনি, কারণ তিনি প্রেমকেই এই গ্রন্থের মুখ্য উপজীব্য করেছিলেন। যদিও এর মধ্যে তৎকালীন কলকাতার সমাজজীবনের ছবি, তারুণ্যের অসংযত উচ্ছৃঙ্খলতার বিশদ বিবরণ আছে, তবু 'করুণা' চরিত্র পরিকল্পনায় কবিসুলভ প্রেমানুভূতিই অধিক পরিমাণে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর প্রথমজীবনের কাব্য ও কবিতাগুলির মতো 'করুণা'ও তার রোমান্টিক হৃদয়ের অরণ্যে পথ হারিয়েছে, আর বাস্তবের রুক্ষ, কঠোর, স্থূল হস্তাবলেপে তার এই প্রেমস্বপ্ন ক্রমেই বিশুষ্ক ও বিলীয়মান হয়ে গেছে। আর রাবীন্দ্রিক নায়কের পূর্বাভাসরূপেও এই উপন্যাসের নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, বিশেষ করে 'করুণা'র মহেন্দ্রের মধ্যে 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রের একটি পূর্বরূপ দেখতে পাওয়া যায়। উভয়ক্ষেত্রেই ঘটনার সমধর্মিতা ও চরিত্রের সাময়িক পদস্খলন ও পরিণামে উত্তরণ সমালোচকের কাছে উভয়ের সাদৃশ্য অনেকটাই গ্রাহ্য করে তুলেছে।[৫] মহেন্দ্র-আশা-বিনোদিনীর ত্রিভুজ সমস্যা ও মহেন্দ্র-রজনী ও মোহিনীর ত্রিভুজ সমস্যা শুধুমাত্র বীজ ও বৃক্ষের পার্থক্যে পৃথক, কেননা অপরিণত হলেও 'করুণা'র এই সমস্যাই রবীন্দ্রনাথকে যথার্থ ঔপন্যাসিক করে তুলেছে এবং এই প্রেরণাবশেই 'চোখের বালি'তে তিনি আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যুগান্তর এনেছেন, যা বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে একটি নূতন পথে যাত্রা করেছে। প্রসঙ্গত এও স্মরণীয় যে প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ঐতিহাসিক পটভূমিকার আশ্রয় নিলেও, তাঁর প্রথম এই রচনাটিতে সামাজিক প্রেক্ষাপটই পরিগৃহীত হয়েছে এবং এই পটেই রবীন্দ্রনাথ তার সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছিলেন। নরেন্দ্র ও মহেন্দ্র—'করুণা'র এই দুই প্রধান পুরুষ চরিত্রের মধ্যে নরেন্দ্র নামত নায়ক হলেও, সে বঙ্কিমীবর্ত্মের যাত্রী, কিন্তু মহেন্দ্রের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আগামী নায়কের ভ্রূণ-রূপটিকে আবিষ্কার করেছেন, কেননা, আমরা দেখবো যে, যে বিশেষ অর্থে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক যুগোপযোগী নায়কের স্রষ্টা ও যে-পথে তাঁর উত্তরকালের বাঙালী নায়কেরা পরিক্রমা করেছেন, অস্পষ্ট হলেও 'করুণা'র মহেন্দ্রই তার অগ্রপথিক।

'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি'—এই দুটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের স্বাভাবিক বিবর্তনধর্মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। বঙ্কিমে আমরা দেখি যে, ঐতিহাসিক উপন্যাস দিয়ে যাত্রা শুরু করে তিনি সামাজিক উপন্যাসে পদার্পণ করেছিলেন। অবশ্য ইংরাজীতে লেখা 'রাজমোহন্স ওয়াইফে' বঙ্কিম সামাজিক পট আশ্রয় করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তাঁর প্রথম উপন্যাসে সামাজিক পট অবলম্বন করলেও, পরবর্তী রচনাদুটিতে ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের আশ্রয় নিলেও তাঁর রীতি ও মনোভঙ্গি যে বঙ্কিমীরীতি ও মনোভঙ্গি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তা কোনো মন্তব্যের অবকাশ রাখেনা। 'বৌঠাকুরানীরহাট' ও 'রাজর্ষি' দুই উপন্যাসেরই নায়ক দুই রাজা, প্রতাপাদিত্য ও গোবিন্দমাণিক্য, কিন্তু বঙ্কিমের দুই রাজকীয় নায়ক 'রাজসিংহ' বা 'সীতারামে'র থেকে কতো স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের নায়ক তার ব্যক্তি-আত্মার চরিতার্থতার অনুসন্ধানে সদা তৎপর, কিন্তু বঙ্কিমের নায়ক সামগ্রিক সমাজ-মানুষের জীবনের পটভূমিকায় আপন সত্তা-সার্থকতা সন্ধানে সচেষ্ট। যে প্রবল ইতিহাস-ঘটনা বঙ্কিমের এই শ্রেণীর কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে রবীন্দ্রনাথে তার কোন চিহ্নই নেই। 'বৌঠাকুরানীর হাটে' প্রতাপাদিত্যের পারিবারিক সমস্যাই মুখ্য। আর 'রাজর্ষিতে' "ইতিহাস তাহার সমস্ত বাহ্য বৈচিত্র্য ও কোলাহল লইয়া বহুদূরে সরিয়া গিয়াছে,......... মোগলসৈন্যের আক্রমণ, শাহ্‌ সুজার রাজধানী—এ সমস্তই যেন কবির আধ্যাত্মিক ধ্যাননিরত চক্ষুর সম্মুখ দিয়া অস্পষ্ট, ছায়াময় ভোজবাজির মত চলিয়া গিয়াছে। ইতিহাসের জনশূন্য প্রান্তরের উপর রাজর্ষির সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে। তাহার অর্থহীন কোলাহল ও ব্যর্থতার প্রচেষ্টার পশ্চাতে এক মুক্ত প্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তি নীরবে স্থির হইয়া আছে।"[৬] সমালোচক-কথিত এই 'মুক্ত প্রাঙ্গণের অক্ষুণ্ণ শান্তি'ই রবীন্দ্রউপন্যাসে অন্বিষ্ট; নায়কচরিত্র তার উপায় ও ঘটনাবিশ্লেষণ তার মাধ্যম।

প্রতাপাদিত্য ও গোবিন্দমাণিক্য—পর পর চিত্রিত এই দুটি রাজচরিত্রের মধ্যে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় রাজধর্মের পরাদর্শ-সন্ধান সম্পৃক্ত হতে চেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এদের মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের মুক্তপ্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তির সন্ধানও করেছেন। চরিত্রচিত্র হিসাবে এই দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মের; প্রতাপাদিত্য যার গ্রহণলগ্নরূপ, গোবিন্দমাণিক্য তারই পূর্ণোজ্জ্বল জ্যোতির্ময় প্রকাশ। নিষ্ঠুরতা, আত্মম্ভরিতা, কঠোর শাসকতা, আত্মস্বার্থ ও জেদ রক্ষায় নির্বিকার ও সর্বপ্রকার পাপানুষ্ঠানে অকুণ্ঠ

প্রতাপাদিত্য যেন মানুষ হয়ে উঠতে পারেননি। মনে রাখা দরকার যে, বইটি রবীন্দ্রনাথের অপরিণত সৃষ্টি, তাই চরিত্রের মধ্যে মানবিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব একেবারেই অনুপস্থিত, কিন্তু যে অকুণ্ঠ নিষ্ঠুরতা মানবচরিত্রকে দৈবের মতোই রহস্যময় করে তোলে প্রতাপাদিত্য তার স্পর্শ থেকেও বঞ্চিত। "তিনি মানুষ; কিন্তু মনুষ্যজনোচিত কোন বৃত্তি তাঁহার নাই। তিনি দৈবের মতো নিষ্করুণ ও অপ্রতিরোধনীয়; দৈবের-মতো রহস্যময় নহেন।"[৭] তাঁর অপ্রশমিত ক্রোধের আগুনে তাঁর পরিবারে যে আগুন জ্বললো, সুরমা বসন্তরায়ের মৃত্যু ও উদয়াদিত্য-বিভার মর্মদাহী জীবনপরিণামে যা গৃহদাহের শোকাবহতা নিয়ে তার পরিবারকে দগ্ধ ধ্বংসস্তূপে পরিণত করলো, তার কোন প্রতিক্রিয়াই তাঁর চিত্তে দেখা যায় না। ব্যক্তিচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বমথিত ক্রমবিকাশের সন্ধান এই অপরিণতির পর্যায়ে দুষ্প্রাপ্য হলেও ভারতীয় রাজধর্ম থেকেও প্রতাপাদিত্য ভ্রষ্ট। যে আত্মস্বার্থবিবর্জিত কল্যাণব্রত ভারতীয় রাজার আদর্শ, প্রতাপাদিত্য নিষ্ঠুরভাবে তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে। মানুষ হিসাবে না হলেও, রাজা হিসাবেও প্রতাপাদিত্য গড়ে উঠতে পারেনি।

'রাজর্ষি'র গোবিন্দমাণিক্য এই দিক দিয়েই প্রতাপাদিত্যের উল্টোপিঠ। তিনি ভাবুক, আত্মসমাহিত ও আধ্যাত্মিক ভাবনাশ্রয়ী। হাসি ও তার সঙ্গে তাঁর অসমবয়সী সখ্য, নিখিল জীবপ্রীতির অনুপ্রেরণায় জীববলির দীর্ঘ ঐতিহ্যের অবলোপ, সিংহাসনে বসে অপরাধী ভ্রাতার দণ্ডবিধান করে সিংহাসন থেকে নেমে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করে অশ্রুবিসর্জন, এবং রাজ্যচ্যুত হয়েও অভিযোগহীন প্রশান্তি নিয়ে রাজ্যত্যাগ ও পরিণামে রাজর্ষির সার্থকতায় উত্তরণ। গোবিন্দমাণিক্য রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় রাজকীয় সত্তার ভারতীয় আদর্শ-সম্মত পরিপূর্ণতার প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। 'পারসোন্যালিটি' বা 'মুক্তপ্রাণের অক্ষুণ্ণ শান্তি'—রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট মানবজীবনসার্থকতা, 'বৌঠাকুরানীর-হাট' ও 'রাজর্ষি' উপন্যাস দুটিতে নায়ক চরিত্রের মধ্যদিয়ে অভিব্যক্ত হ'তে চেয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচিত রীতি এই যে, পরিপূর্ণতা যেমন তিনি সহজ স্বাভাবিকতায় প্রকাশ করেন, তেমনি অপূর্ণ চরিত্রের বিকৃত রাহুগ্রস্ততার তির্যক তাৎপর্যেও তিনি প্রচ্ছন্নভাবে পরিপূর্ণতার ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে 'ঘরেবাইরে'র সন্দীপ ও 'চার অধ্যায়ে'র অতীনের চরিত্রের ক্ষেত্রেও এই রীতি অনুসৃত হয়েছে। প্রতাপাদিত্য যার বিকৃত রূপ, গোবিন্দমাণিক্য তারই প্রকৃত স্বরূপ। রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে,

ইতিহাসের পটেই যখন মানুষের চরিতার্থতা অন্বিষ্ট, সেই পর্যায়ে, প্রতাপাদিত্য ও গোবিন্দমাণিক্য, এই দুই নায়কের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্বেষণের চরিতার্থতায় পৌঁছেছেন। এর পরের পর্বে পট বদলাবে, চিন্তায় আসবে প্রবীণতা, দীর্ঘ ব্যবধানের পরে রবীন্দ্র নায়কচিন্তায় নতুন পথপরিক্রমা শুরু হবে। শুধু নায়কের কল্পনাতেই নয়, উপন্যাসের পরিকল্পনাতেও একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথ আত্মস্বরূপ উপলব্ধিতে সচেষ্ট হবেন, অন্যদিকে তেমনি বাংলা উপন্যাসেরও যথার্থ আধুনিক যুগের উদ্বোধন ঘটবে।

॥ ৭ ॥

"আমরা একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপন্যাসের রসসম্ভোগ করেছি। তখনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নবপর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারেনা।...... ঠিক করতে হলো, এবারকার গল্প বানাতে হবে এ যুগের কারখানা ঘরে, শয়তানের হাতে বিষবৃক্ষের চাষ তখনও হত, এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা; অন্ততঃ গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায়, অলঙ্কারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আব্দার যখন এড়াতে পারলাম না তখন নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি, হাতুড়ির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলাভাষায় আর প্রকাশ পায়নি।......সাহিত্যের নবপর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। এই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে"।[৮]

রচনাবলী সংস্করণের জন্য উত্তরকালে লিখিত 'চোখের বালি'র এই সূচনা অংশটিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশের একটি চমৎকার গতিপথ বিশ্লেষণ ও নির্দেশ করেছেন। নরনারীর প্রেমকে ঘিরে গড়ে ওঠা এই কাহিনীটির কথা বলতে গিয়ে তাঁর মনে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে'র কথা উদিত হয়েছে। 'বিষবৃক্ষে'ও সমাজ-বিগর্হিত তথাকথিত অবৈধ প্রেমের তথা বিবাহিত পুরুষের অন্য রমণীর প্রতি দুর্দমনীয় আসক্তির কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে বঙ্কিমের সমাজনিষ্ঠ মন ও বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও তার আইনসম্মত বৈধতা সমগ্র বিষবৃক্ষ রচনাটিতে একটি সমাজসম্মত প্রেক্ষাপট গড়ে তুলেছিল। তাছাড়া ঘটনাপরম্পরার বিবরণের

সূত্রেই বিষবৃক্ষের আখ্যান বিকশিত হয়েছে, সেখানে মানবচরিত্রের গভীর গহনে লেখক ডুব দিয়ে তার অন্তরের দ্বন্দ্বজটিল স্বরূপটি তুলে এনে পাঠককে দেখাতে পারেননি, হয়ত বা চাননি, কেননা, তখনও পর্যন্ত পশ্চিমী উপন্যাসে ঘটনানির্ভরতাই ছিল উপন্যাসের প্রধান ধর্ম ও শর্ত। কিন্তু নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে একই উপাদান নতুনকালের কারখানা ঘরে আগুনের জ্বলুনি ও হাতুড়ির পিটুনিতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করলো। এ পর্যায়ের মানুষের ছবি হলো অত্যন্ত স্পষ্ট, সাজসজ্জার অলঙ্কারে তার স্বরূপকে আচ্ছন্ন না করে তার আঁতের কথা টেনে বের করা হলো। এভাবেই ঘটলো বাংলা উপন্যাসের যুগমুক্তি ও আধুনিকতার যাত্রারম্ভ। এই যুগমুক্তির সর্বাধিক পরিচয় মিললো 'চোখের বালি'র নায়ক চরিত্র পরিকল্পনায়, পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পূর্ব উপন্যাসেরও নজির ছাপিয়ে এখানে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করলো বাংলা উপন্যাসের সেই নায়ক, যা একই সঙ্গে সমকালীন আধুনিকতার প্রতিনিধি ও উত্তরকালের নায়কদের অগ্রদূত।

সক্রিয়, বীর ও উচ্চবংশসম্ভূত নায়কদের পরিবর্তে যে সাধারণ মানুষের নায়কত্ব আধুনিক উপন্যাসে স্বীকৃত হয়েছে, বাংলা উপন্যাসে 'চোখের বালি'র নায়ক মহেন্দ্র তারই প্রথম সার্থক প্রতিনিধি। অবশ্য মহেন্দ্রকে নায়করূপে গ্রহণ করার আগে তার নায়কত্ব সম্পর্কে আমাদের নিঃসংশয় হয়ে নিতে হবে, কেননা ডঃ সুকুমার সেন বিহারীকেই এই উপন্যাসের নায়করূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, "চোখের বালি"র নায়ক বলিতে যদি কোন ভূমিকা থাকে তো সে বিহারীর।"[৯] এই অভিমত মেনে নিলে সমগ্র "চোখের বালি"র আখ্যানাংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণকারীরূপে বিহারীকে মেনে নিতে হয়। কিন্তু একদিকে যেমন উপন্যাসের মুখ্য সমস্যা, অন্যদিকে তেমনি উপন্যাসে বিবৃত ঘটনাবলী,—উভয় ক্ষেত্রেই বিহারীকে আমরা এই মহান ও বিরাট ভূমিকায় দেখতে পাইনা। সত্য বটে যে, চরিত্রশক্তিতে ও অন্যের প্রীতি উৎপাদনে ও আকর্ষণে এবং সর্বোপরি একধরনের আদর্শবাদী মহত্ত্বে বিহারী মহেন্দ্র অপেক্ষা অনেক চরিত্রোৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু আমরা আধুনিক যুগে নায়ক বলতে শুধুমাত্র বহুগুণান্বিত পুরুষই বোঝাই না। আদর্শ ও বহুগুণান্বিত চরিত্র শ্রদ্ধেয় সন্দেহ নেই, কিন্তু নায়ক-চরিত্রে আমরা রক্তমাংসের মানুষের যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব-সমাকীর্ণ 'মানুষী দুর্বলতা' প্রত্যাশা করি তা সেই শ্রদ্ধেয় চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাছাড়া নিছক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখলেও বিহারীকে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় পুরুষ

বলা যায় না, কেননা, তার দীর্ঘ অনুপস্থিতি যেমন গল্পের গতি ব্যাহত করেনি, তেমনি, রাজলক্ষ্মী-আশা-মহেন্দ্র-বিনোদিনীর জটিল মানসিক আবর্তের কেন্দ্রীয় জটিলতাতেও তার ভূমিকা ততখানি মুখ্য নয়। আসলে মধ্যবিত্তপরিবারের বাঙালী যুবকের অস্থিরচিত্ত প্রণয়বাসনার সূত্রে তার সামাজিক কেন্দ্র থেকে ক্রমবিচ্যুত নিঃসঙ্গ আত্মগহনচারিতারই পূর্বাভাস রচনা করা হয়েছে 'চোখের বালি'তে, এবং মহেন্দ্রই তার মানবিক প্রতিনিধি।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে অবশ্য এই ধরণের নায়কসমস্যা প্রায়শই উত্থাপিত হতে পারে। কেননা, তাঁর রচনার একটি অতিস্বাভাবিক বিশিষ্টতা এই যে, তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রধান রচনাতেই দুটি করে পুরুষ চরিত্র আখ্যানে প্রায় সমপরিমাণ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রায়শই এরা বন্ধুস্থানীয় হয় এবং চরিত্র গৌরবে প্রায় উভয়েই সমপর্যায়ে পৌছোয়। মহেন্দ্র-বিহারী, রমেশ-নলিনাক্ষ, গোরা-বিনয়, শচীশ-শ্রীবিলাস, নিখিলেশ-সন্দীপ এর পর্যায়ক্রমিক উদাহরণ। স্বভাবতই এই সমস্ত ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে যে, আখ্যানের নায়কত্বের যথার্থ দাবীদার কে? মহেন্দ্র-বিহারীর ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের সাধারণ উত্তর অবশ্যই সমগ্র উপন্যাসঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের আপেক্ষিক প্রাধান্যের ওপর নির্ভরশীল। আরো একটা দিক দিয়েও এটি বিচার্য হতে পারে। বিহারী নিঃসন্দেহে নায়ক লক্ষণাক্রান্ত, সে হৃদয়বান, বুদ্ধিমান, বন্ধুবৎসল, মাতৃভক্ত এবং সর্বোপরি অত্যন্ত সংযত ও সমাহিতচিত্ত মানুষ। সমগ্র ঘটনায় মাঝে মাঝে তার আচরণে ও মানসিকতায় সাময়িক বিচ্যুতি দেখা গেলেও, মোটের ওপর সে প্রায় আদর্শচরিত্র মানুষ, তার প্রতি পাঠকের সহজ শ্রদ্ধা বিনোদিনীর মতোই প্রবাহিত হতে চায়, কিন্তু বিহারীকে শ্রদ্ধা করেও যেমন মহেন্দ্রকে নিয়েই বিনোদিনীর জীবনযন্ত্রণা ও জীবনজটিলতা পাকে পাকে গ্রন্থিত হয়ে উঠেছিল, পাঠকের কাছেও তেমনি বিহারীর আদর্শবত্তার পাশে দ্বিধাদীর্ণ মহেন্দ্রই যথেষ্ট বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা উপন্যাসে যে সাধারণ মানুষ তার সমস্ত অপূর্ণতা নিয়েই নায়করূপে বৃত হবে, মহেন্দ্র চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ তারই পরিচয় দিয়েছেন। সাহিত্য, বিশেষত উপন্যাসে, আমরা যে জীবন্ত মানুষের প্রত্যাশা করে থাকি, মহেন্দ্র সেই প্রত্যাশা বিহারী অপেক্ষা বহুগুণে পূরণ করে। মহেন্দ্র চরিত্রের এই অতিসাধারণতা লেখক উপন্যাসের রচনাতেই আভাসিত করেছেন, বিবাহবিষয়ে তার অস্থিরচিত্ততার পরিচয়দান প্রসঙ্গে: "বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে

প্রশ্রয় পাইয়াছে, এইজন্য তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্ছৃঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারেনা।" এই উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছার বেগেই মহেন্দ্র সমগ্র কাহিনীতে ছুটে বেড়িয়েছে। বিবাহে অনিচ্ছা, আশাকে দেখতে যাওয়া, বিহারীর বিবাহে সম্মতি জেনে আশাকে নিজে বিবাহ করার ইচ্ছা, আশাকে নিয়ে তার অসংযত উচ্ছ্বাস, পুত্রস্নেহাতুর মায়ের প্রতি আপেক্ষিক অনাদর, বিনোদিনীর প্রতি প্রাথমিক উপেক্ষা, সাহচর্যে প্রীতিবোধ, আশার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি অনুকূল মানসিকতা, বিনোদিনীর প্রতি প্রীতিবোধ ও আশার প্রতি অকারণ অসন্তোষ প্রকাশ, বিহারীর হিতকারী বন্ধুত্বকে প্রত্যাখ্যান এবং তারপর কখনো গৃহে, কখনো বাসাবাড়ীতে, কখনো গোপনে কখনো প্রকাশ্যে তার অসংযত ইচ্ছার উচ্ছৃঙ্খলতা নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই দুর্দমনীয় ইচ্ছাবেগ একদা তাকে গৃহ ছাড়তে বাধ্য করেছে, এবং বিনোদিনীকে নিয়ে সে পশ্চিমে উধাও হয়েছে। এই প্রবাসে একদিকে তার মধ্যবিত্ত গৃহপালিত সংসারনিষ্ঠ বিবেক, অন্যদিকে বিনোদিনীকে ঘিরে তার কামনার অসংযত ইচ্ছাবেগ বারে বারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে প্রতিহত-প্রত্যাহৃত হয়েছে; এবং এই সমস্ত জটিল ও দ্বন্দ্বসংকুল ঘটনার পরিণতিতে মহেন্দ্র পুনরায় তার পূর্বাবস্থায় স্থিত হয়েছে ও রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর তার সংসারজীবন আবার মধ্যবিত্তের পরিচিত ও নিয়মিত ছন্দে ছন্দিত হতে চেয়েছে। মহেন্দ্র-বিনোদিনী-আশার জীবনে যে আকর্ষণ-বিকর্ষণ, প্রেম ও উপেক্ষার যে দীর্ঘস্থায়ী বিক্ষোভ চলেছিল, একটি বৈরাগ্যধূসর শান্তির মধ্যে তা পরিসমাপ্ত হয়েছে। এই ঘটনার আপাত সাদৃশ্যে স্বাভাবিকভাবেই বঙ্কিমের বিষবৃক্ষের কথা আমাদের মনে এসে পড়ে। স্বয়ং লেখকের মনেও যে এই বইটি বিশেষ সক্রিয় প্রভাব ফেলেছিল, তার প্রমাণ মহেন্দ্র-বিনোদিনীর পাঠচর্চায় 'বিষবৃক্ষে'র পৌনঃপুনিক উল্লেখ ও রচনাবলীর ভূমিকায় 'বিষবৃক্ষে'র প্রসঙ্গ উত্থাপন। নগেন্দ্র ও মহেন্দ্রের মধ্যে একটি আপাত সাদৃশ্য বর্তমান, উভয়েই পত্নীবৎসল, উভয়েই অভাববোধের অভাবে ইচ্ছাবেগে অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল। কিন্তু কুন্দকে ঘিরে নগেন্দ্রর সমস্যা ও বিনোদিনীকে ঘিরে মহেন্দ্রর সমস্যার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুন্দের ব্যক্তিত্ব নেই, তাই তাকে ঘিরে নগেন্দ্রের যে সমস্যা তা প্রধানতই বহিরঙ্গমূলক, তার সমাজিক ও নৈতিক দিকটাই প্রধান। তার সমাধানও হয়েছিল সামাজিকভাবে সমাজবিধি ও নীতি মেনে নিয়ে— বিধবাবিবাহের আইনগত বৈধতা ও সূর্যমুখী কর্তৃক বিবাহ সংঘটনায়। কিন্তু প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী বিনোদিনীকে নিয়ে মহেন্দ্রর সমস্যা

আরো জটিল। যে সমস্ত সূক্ষ্মকারণে মহেন্দ্রের চিত্ত বিনোদিনীতে বহ্নিমুখী পতঙ্গের মতোই ধাবিত হয়েছিল, তা কোন বহির্ঘটনার দ্বারা সাধিত হয়নি। ছোট ছোট আপাততুচ্ছ ও খেয়ালী কার্যকলাপের মধ্যদিয়েই এই বাসনাবেগের ক্রমবিকাশ ঘটেছে ও তার মর্মদাহী বিস্তৃতির দিকে এগিয়েছে; আশার বকলমে চিঠি লেখা, ফোটো তোলার ব্যাপার প্রভৃতি ঘটনা উভয়ের মধ্যেকার সম্পর্ককে ক্রমেই জটিল করে তুলেছে। অবশ্যই এই সম্পর্ক ঘনিয়ে তুলতে পুত্রবধূ আশার প্রতি মাতা রাজলক্ষ্মীর মূঢ় ঈর্ষারও একটি বিরাট অবদান আছে। বিনোদিনী ও আশার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তুলনার চিন্তা ও বিনোদিনীর সহায়তায় আশার ওপর প্রতিশোধগ্রহণ মহেন্দ্র-বিনোদিনীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাইরে থেকে একটি সূক্ষ্ম অথচ সুদৃঢ় প্রেরণারূপে ক্রিয়াশীল থেকেছে। তাছাড়া স্বয়ং বিনোদিনীর শিক্ষিত, বুদ্ধিদীপ্ত, ছলাকলা-নিপুণ আচরণ ও মানসিকতা মহেন্দ্রের এই আত্মসংকট ও সমস্যাকে ক্রমেই ঘনীভূত করে তুলেছে। মহেন্দ্র চরিত্রের আত্মাভিমান-মূঢ়তা, তার ঈর্ষাবোধ ও উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছাবেগ সমগ্র 'চোখের বালি' উপন্যাসে তারমধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব দিয়েছে, যা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে অপ্রাপনীয় ছিল এবং যা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে একাধিক নায়কের মধ্যে সংক্রামিত। মহেন্দ্র কোন ঘটনার স্রষ্টা নয়। যে আপন মনের নিভৃত কোণেও কোনো জটিলতার গ্রন্থিমোচন করতে পারেনা, অথচ তারই ইচ্ছা ও আবেগ তাকে এমনদিকে টেনে নিয়ে যায়, যা প্রধানতঃ তার আত্মসংকট হলেও তার প্রভাবে ও প্রতিক্রিয়ায় একটা গোটা পরিবারে ও অনেকগুলি মানুষের জীবনে বহুবিচিত্র প্রতিফলন ঘটে। ঠিক নিষ্ক্রিয় বলতে যা বোঝায় তা না হলেও, মহেন্দ্র তার আপন মনের গোলোকধাঁধারই এক দিকভ্রান্ত পথিক। আশা, বিনোদিনী, রাজলক্ষ্মী, বিহারী—এই অতি পরিচিত মানুষগুলিকে নিয়ে সে আপন মনের গহনে যে জটিল সতরঞ্চের ছক পেতে বসেছে তার অবিবেচনায় সেই খেলায় সে নিজেই মাৎ হয়ে গেছে। প্রতাপাদিত্য বা গোবিন্দমাণিক্য কিংবা পরবর্তী গোরা ঠিক এই অর্থে রবীন্দ্রনায়ক নয়। আবার রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট পার্সোন্যালিটির আহরণের মানদণ্ডে মহেন্দ্র পড়েনা, কেননা তার সঙ্কটমুক্তি তাকে কোনো বিশেষ বিশ্বাসের সার্থকতায় পৌঁছে দেয়নি। গোবিন্দমাণিক্য, গোরা বা শচীশের মতো সংকটমুক্ত হয়ে সে কোনো আত্মোপলব্ধির শীর্ষদেশে উন্নীত হতে পারেনি; সাধারণ মহেন্দ্র সমগ্র 'চোখের বালি' উপন্যাসে আদ্যন্ত সাধারণই থেকে গেছে। তার মূঢ়তা, ঈর্ষা বা ইচ্ছাবেগের অসংযম

গ্রন্থশেষে সাময়িক গৃহীজীবনের সাধারণ কোঠাতেই তাকে ফেলে রেখেছে। এখানে অনিবার্যভাবেই 'বিষবৃক্ষে'র নায়ক নগেন্দ্রনাথের কথা আমাদের মনে জেগে ওঠে, কেননা, নগেন্দ্র বঙ্কিমী আদর্শসম্মত নায়ক। যে বিশেষ চেতনা বঙ্কিমের নায়কদের চিত্রায়নে ক্রিয়াশীল হয়েছিল, অর্থাৎ ট্র্যাজিক নায়কের সজ্ঞান অথবা অজ্ঞান অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য বিপর্যয়, তা 'চোখের বালি'র মহেন্দ্রর মধ্যে দেখা যায় না। 'বিষবৃক্ষে'র নগেন্দ্র যা থেকে মুক্তি পেয়েছিল এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র গোবিন্দলাল যার চরম প্রতিক্রিয়ায় সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়েছিল, অথবা সীতারামের চরিত্রে যা মানবজীবনে গ্রীক আদর্শের 'নেমেসিসে'র মতোই অভ্রান্তলক্ষ্য অলঙ্ঘনীয় বিশ্ববিধানের মতোই নেমে এসেছিল, মহেন্দ্র চরিত্রে সেই বিপুল বিপর্যয়ের কোন ন্যূনতম ইঙ্গিতও নেই। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনরঙ্গমঞ্চের সফল নাট্যকার, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পার্শ্বচারী চিত্রকর। তাই তাঁর নায়ক 'মহেন্দ্র' জীবনেরই অনুবর্তন করেছে, সাংসারিক জীবনের অতিসাধারণ ভুলভ্রান্তি বা মোহ-মাৎসর্যের শিকার হয়ে আপন কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই বিচ্যুতি বিশ্ববিধানের কোন গভীর অভিপ্রায়ের বিরোধিতা-দোষে অপরাধী নয়, তাই বিশ্ববিধাতার কোনো আঘাতও অদৃশ্য খড্গের মতো তার শির লক্ষ্য করে নেমে আসেনি। ট্র্যাজেডির নায়কের মতো কোনো ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ আঘাত তাকে বিপর্যস্ত করেনি ম্যাক্‌বেথ কিংবা ইদিপাসের মতো। তার চিত্তসংকট তার নিজেরই মধ্যে ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে এবং সমগ্র ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে অসংযত বাসনার গরল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছে। অবশ্য উপন্যাসের শেষাংশে লেখক যে পরিণতির আভাস দিয়েছেন, তাতে মহেন্দ্রকে সংকটমুক্ত অবস্থাতেই আমরা দেখি। অন্নপূর্ণার সঙ্গে চিরকালের জন্য কাশীবাসী হওয়ার প্রাক্কালে আশার বিরূপ মন যখন করুণায় ও বিষাদে আর্দ্র হয়ে উঠেছিল, তখন মহেন্দ্র কর্তৃক বিনোদিনীকে প্রণাম ও উভয়ের পরস্পরের পরস্পরকে মার্জনা করার মধ্যে মহেন্দ্রের এই সংকটমুক্ত মনেরই ছবি দেখা যায়। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, 'বিষবৃক্ষে'র পরিসমাপ্তিতে অসন্তুষ্ট রবীন্দ্রনাথের লেখনিতেই 'মধ্যবর্তিনী' গল্পের সম্ভব হয়েছিল, আর বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'চোখের বালি'র পরিণতি সম্পর্কে সমালোচকের সমস্ত অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছিলেন। " 'চোখের বালি' বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটা নিয়ে আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা

তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত।"[১০] প্রধানতঃ বিনোদিনী চরিত্রের পরিণাম নিয়েই এই মন্তব্য করা হলেও, মহেন্দ্র চরিত্রের প্রসঙ্গেও একথা ষোলোআনা সত্য। আসলে মহেন্দ্র চরিত্র এক ধরণের পরিণতিহীন চরিত্র, যা একান্তভাবেই আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত। আধুনিক সাহিত্যে মানুষ চিরপথিক, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার নিত্যসাক্ষী, জীবনের বিচিত্র ঘাটে ঘাটে তার ভ্রাম্যমাণতা, কিন্তু কোথাও তার কোনো সুস্থির গন্তব্য নেই। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য তাঁর উপন্যাসসাহিত্যে একবারই এই আধুনিক লক্ষণের মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন 'চোখের বালি'তে মহেন্দ্র চরিত্রে, নচেৎ অন্যত্র তিনিও বঙ্কিমের মতোই নিজস্বভাবনাসম্মত এক আদর্শের চিরসন্ধানী, এক মুক্ত প্রাণের অক্ষুণ্ণ শক্তিতে সমৃদ্ধ পার্সোন্যালিটির গুহানিহিত সার্থকতার উন্মুখ অভিমুখী। 'চোখের বালি'ই সার্থকতম অর্থে বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতার যাত্রারম্ভস্থল, মহেন্দ্রই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের নায়কদের যথার্থ উৎস-পুরুষ। অবশ্য, রবীন্দ্রনাথের বাকি উপন্যাসগুলিতে অবশ্যই এক ব্যতিক্রান্ত অধ্যায় দেখা দেবে এবং সেখানে তিনি বারবার তাঁর আদর্শের কক্ষপথে ঘুরে বেড়াবেন। কখনো 'গোরার' পূর্ণতায়, কখনো বা শচীশ-শ্রীবিলাস, নিখিলেশ-সন্দীপ, অমিত-শোভনলালের বৈপরীত্যে তিনি এই আদর্শেরই প্রতিরূপ খুঁজে বেড়াবেন। চরিত্রধর্মের গৌরবে ও আদর্শবত্তায়, তারা সবাই মহেন্দ্রকে ছাড়িয়ে যাবে সত্য কিন্তু বাংলা উপন্যাসের নায়করূপের বিবর্তনে মহেন্দ্র যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে তার পরিচয় ততখানি লাভ করা যাবে না।

প্রকাশকালের বিচারে, 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি'র তিনবছর পরে প্রকাশিত উপন্যাস, কিন্তু উভয় উপন্যাসের আন্তরিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে অনেক সমালোচকই বিস্মিত হয়েছেন এই ভেবে যে, 'চোখের বালি'র অগ্রবর্তী রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে রীতির আশ্রয় ছেড়ে নতুন রীতি গ্রহণ করলেন, অর্থাৎ ঘটনাবর্ণনা ও ঘটনাজাত পরিণতির পথ ছেড়ে 'আঁতের কথা' বলার পথ নিলেন, পরবর্তী রচনা 'নৌকাডুবি'তে তিনি কেমন করে আবার সেই ঘটনানির্ভর পুরাতন রীতিরই অনুবর্তন করলেন। এই বিশেষ কারণেই বাংলা উপন্যাসের এক প্রখ্যাত সমালোচক তাঁর গ্রন্থে 'নৌকাডুবি'র আলোচনাকে 'চোখের বালি'র আগে স্থান দিয়েছেন[১১]। উপন্যাসের রীতিগত কারণে এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত হলেও, নায়ক-চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কিন্তু 'নৌকাডুবি'তে 'চোখের বালি'র বৈশিষ্ট্যেরই অনুবর্তন লক্ষিত হয় এবং 'নৌকাডুবি'র নায়ক রমেশ চরিত্রে 'চোখের বালি'র নায়ক মহেন্দ্র চরিত্রের

বিশিষ্টতাই উদ্বর্তিত হয়ে ভবিষ্যৎ বাংলা উপন্যাসের নায়কের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে।

ট্র্যাজেডি শব্দের পারিভাষিক অর্থের প্রতি সুদৃঢ় নিষ্ঠার ভাব না দেখিয়ে সাধারণভাবে বলা যায় যে 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের নায়ক রমেশের জীবনের ট্র্যাজিক বিড়ম্বনাই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য। 'নৌকাডুবি'র নায়ক আসলে রমেশ। "অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেলা রমেশের জীবনের ট্র্যাজেডিকে নিষ্করুণ করিয়াছে"।[১২] আখ্যানের শুরু থেকেই রমেশের জীবনে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর খেলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। হেমনলিনী-রমেশের যে সম্পর্কের আভাস লেখক একেবারে গ্রন্থারম্ভে দিয়েছেন, একেবারে শুরু থেকেই অষ্ট নানাদৃ ঘটনার মধ্যদিয়ে তার বিরুদ্ধতা করতে শুরু করেছে। হঠাৎ বাবার কলকাতার আগমন, রমেশের দেশে যাওয়া, বাধ্য হয়েই বিবাহে সম্মতিদান, বিবাহ, নৌকাযাত্রা, নৌকাডুবি, চরে কমলার সাক্ষাৎলাভ, একাকী কমলাকে নিয়ে দেশের বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতায় উভয়ের ফিরে আসা—সমস্ত ঘটনাই অদৃষ্টের নিষ্ঠুর বোঝার মতো উপর্যুপরি রমেশের ঘাড়ে এসে পড়েছে। তারপর কমলাকে নিয়ে তার নতুন সমস্যার উদয় হলো কমলার সত্য পরিচয় জেনে। এরপর হেমনলিনী-রমেশের সম্পর্কে যে জটিলতা এলো যোগেন্দ্র, অক্ষয় তাকে আরও জটিলতর করে তুললো। এই জটিলতা থেকে আত্মরক্ষা করতে রমেশ যখন কমলাকে নিয়ে ষ্টিমারে পশ্চিমে পাড়ি দিল, তখন চক্রবর্তী খুড়োর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ও গাজিপুরে বসবাস তার জীবনে নতুন জটিলতা যুক্ত করলো। এখানে কমলার ভ্রান্তিমোচন ও আপন সত্যপরিচয় উপলব্ধি তাকে গৃহত্যাগে বাধ্য করলো এবং কমলা ও হেমনলিনী এই উভয় নারীর থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে রমেশ নীড়হারা পাখীর মতোই উড়ে বেড়াতে লাগলো। এভাবেই যোগেন্দ্রের সঙ্গে তার পুনর্মিলন ঘটলো, আর তারই সঙ্গে সে কাশীতে হেমনলিনীর কাছে ফিরলো। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ফিরতে তার আরো সময় লেগেছিল, কেননা নলিনাক্ষের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহ-সম্বন্ধের কথাবার্তা এখানেও জটিলতা বাড়িয়ে তুলেছিল, অবশেষে কমলা ও নলিনাক্ষের পুনর্মিলনের কথা ঘোষণা করে লেখক অন্তরালবর্তী রমেশ-হেমনলিনীর বিচ্ছেদমুক্ত পুনর্মিলনের আভাস দিলেন। সমগ্র 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের ঘটনা বিশ্লেষণ করলে একটা জিনিস অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে যে, রমেশের জীবন ঘটনানিয়ন্ত্রিত। যে সক্রিয়তা ও আত্মশক্তি থাকলে মানুষ ঘটনার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, সেই সক্রিয়তা ও আত্মশক্তি রমেশের

মধ্যে ছিলনা। সে মেধাবী ছাত্র, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষে সে অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্র, তর্কে তার পটুত্ব আছে, কিন্তু এই আত্মগত মনোবৃত্তিতেই সে নিঃশেষিত; তার ভাবনার জগতের বাইরে কোনো কর্মের জগৎ নেই, ঘটনাপ্রবাহের সে নীরব সাক্ষী মাত্র, ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ন্যূনতম ক্ষমতারও অনধিকারী। পারিভাষিক ট্র্যাজেডি নায়কের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যও যে তার মধ্যে নেই তা নয়; সে দুই নারীর প্রণয়বিন্দুর মধ্যে আন্দোলিত, সে তার সগোত্র যুবকদের থেকে চরিত্রধর্মে উৎকৃষ্ট, উপর্যুপরি ঘটনার প্রতিকূল আঘাতে দিশেহারা। কিন্তু একটি ব্যাপারে সে এই ট্র্যাজেডি নায়কদের সমধর্মী নয়, কেননা সে কোথাও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট ও প্রত্যাঘাতে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি।

তবু 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'—এই দুটি উপন্যাসের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নায়ক চেতনার যে একটি স্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন, তা একদিকে যেমন বঙ্কিম-উত্তর বাংলা উপন্যাসের নায়ক-চিন্তার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করেছে, অন্যদিকে তেমনি এই দুই উপন্যাসেই পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের নায়কদের পূর্বাভাস রচিত হয়েছে। সাহিত্যের সাধারণ বিবর্তন-ধর্মিতায় বিশালচরিত্র নায়ক বা Hero-র ক্রমঅবলুপ্তি একটি সর্বজনীন সাহিত্যিক সত্য। রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই বাংলা উপন্যাসের এই স্বাভাবিক বিবর্তনধারা আত্মপ্রকাশের নবতম পথ খুঁজে পেয়েছে। শুধু শ্রেণীগত পরিচয়ের জন্যই নয়, মধ্যবিত্ত নায়ক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের এই নায়করা যে আপাত-নিষ্ক্রিয় অথচ মননধর্মী দ্বিধাদীর্ণতার পরিচয় দিয়েছে, তা পরবর্তী বাঙালী ঔপন্যাসিকদের কাছে একটি দিগ্‌দর্শনের কাজ করেছে। 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি'—এই দুই উপন্যাস মিলে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তার যথার্থ শক্তি ও প্রকাশক্ষেত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি এই দুই গ্রন্থের দুই নায়ক মহেন্দ্র ও রমেশের মধ্য দিয়েই আধুনিক বাঙালীকে উপন্যাসের নায়কত্বে বৃত করেছেন। অবশ্যই এই দুই নায়কের মধ্যে অনেক অপূর্ণতা আছে, ব্যক্তিত্বের ঋজুতা এই দুজনের ক্ষেত্রেই প্রায় অনুপস্থিত এবং এরা দুজনে কেউই আদর্শ-চরিত্র নয়, তবুও বলতে দ্বিধা নেই যে, আধুনিক উপন্যাসের নায়ক চরিত্রায়ণে, এই দুই চরিত্রেই রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক ঐতিহাসিক তাৎপর্য আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন। ক্রমশঃ যে সমাজ মূল্যবোধের বিভ্রান্তিতে ক্ষয়িষ্ণু হবে, যার মানুষ উত্তরোত্তর বিপর্যয়যোগে নিষ্ক্রিয় ও আত্মগত হয়ে উঠবে, মহেন্দ্র ও রমেশ তাদেরই পূর্বাভাস জানিয়ে দিয়েছে। এর পরে রবীন্দ্রনাথ আরো উপন্যাস লিখেছেন, সাহিত্যিক

উৎকর্ষে তাদের শ্রেষ্ঠতাও নিঃসন্দিগ্ধ। কিন্তু তাঁর পরবর্তী নায়কতালিকায় এই মহেন্দ্র ও রমেশ আর কখনো ফিরে আসেনি। অতঃপর যে নায়কেরা রবীন্দ্র উপন্যাসের শোভাযাত্রার সামিল হবে তারা ব্যক্তিত্বে, চারিত্র্যে ও মননে যথার্থই বিশালতার অধিকারী। তাদের আত্মিক সংকট যেমন তীব্রভাবে দার্শনিক, সমাধানও তেমনি অসাধারণ, তাদের জীবনধারা ও ভাবনার মধ্যে মানবজীবনের অনেক মননজাত প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সাধারণ মানুষের অতিসাধনার জীবনযন্ত্রণার আপাততুচ্ছ অথচ মহৎ সংকটের কোনও সাদৃশ্যই সেখানে প্রতিবিম্বিত হতে পারেনি।

॥ ৮ ॥

'গোরা' উপন্যাস ১৩১৪ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাস থেকে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী' প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে ১৩১৬ বঙ্গাব্দেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং বলা চলে যে 'নৌকডুবি'র অব্যবহিত পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসটি লিখতে সুরু করেন। কিন্তু দুটি রচনার মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য তাদের রচনারীতি প্লটগঠন এবং চরিত্রায়ণে, তা ভাবলে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। তবু যদি 'নৌকাডুবি'র সঙ্গে 'গোরা'র একটি ক্ষীণ সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করতে হয়, তবে বলা দরকার যে, 'নৌকাডুবি'তে রবীন্দ্রনাথ 'গোরা'র একটি অস্পষ্ট পূর্বাভাস রচনা করেছিলেন নলিনাক্ষ চরিত্রে, অবশ্যই দুটি চরিত্রে কোনো তুলনাই হয় না, কেননা নলিনাক্ষ আড়ষ্ট ও যান্ত্রিক এবং গোরা জীবন্ত ও সক্রিয়, তথাপি আদর্শবত্তা ও মাতৃভক্তির দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। কিন্তু 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরা তার স্রষ্টার সমস্ত পূর্বসৃষ্টি ও ভবিষ্যৎ সৃষ্টির সমস্ত নায়কচরিত্রের মধ্যে অসাধারণ-ভাবে স্বতন্ত্র মহিমায় উচ্চশির হয়ে রয়েছে। তার চরিত্রপরিকল্পনার এই অসাধারণত্ব রবীন্দ্রনাথ বারেবারেই তার রূপবর্ণনায় পাঠকদের জানিয়ে দিয়েছেন, 'গোরা'র বিশিষ্টতা পর্যালোচনায় সবার আগে তার সেই বিশিষ্ট রূপের পরিচয়টি গ্রহণ করা সমীচীন।

১. "যে ছিল সভাপতি, তার নাম গৌরমোহন, তাহাকে আত্মীয় বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারিদিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কলেজের পণ্ডিত মশায় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রংটা কিছু উগ্ররকমের, সাদা হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছ'ফুট

লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠো যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো, গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে 'কেরে' বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত ; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো ; চোখের উপর ভ্রূ-রেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গিয়াছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা ; তাহার উপর নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া আছে, অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গোরাকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই। সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।"

২. "গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ। পরনে মোটা ধুতির উপরে ফিতা-বাঁধা জামা ও মোটা চাদর, পায়ে শুঁড় তোলা কটকি জুতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।"

৩. "লোকটাকে দেখিয়া সাহেব কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। এমন ছয় ফুটের বেশি লম্বা, হাড়মোটা মজবুত মানুষ তিনি বাংলাদেশে পূর্বে দেখিয়াছেন বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। ইহার দেহের বর্ণও সাধারণ বাঙালীর মতো নহে। গায়ে একখানা খাকি রংএর পাঞ্জাবী জামা, ধুতি মোটা ও মলিন। হাতে একগাছা বাঁশের লাঠি, চাদরখানাকে মাথায় পাগড়ির মতো বাঁধিয়াছে।"

উদ্ধৃত তিনটি বর্ণনাতেই গোরার অসাধারণত্ব বর্ণিত হয়েছে। তার সহপাঠীদের মধ্যে তার দৈহিক বিশিষ্টতা তাকে যেমন স্বতন্ত্র করেছে, তেমনি সমকালীন যুবকদের মধ্যে তার বেশবাসগত বিশিষ্টতাও তাকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। 'সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই'—গোরা সম্পর্কে এটাই সবচেয়ে বড়ো সত্য। সাহেবের বিস্মিত দৃষ্টির মধ্যস্থতায়ও গোরার এই অসাধারণত্বই প্রদর্শিত হয়েছে। তার দৈহিক স্বাস্থ্য, গাত্রবর্ণ, কণ্ঠস্বর ও বেশভূষা, সর্বত্রই তার এমন একটি পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের বজ্রদৃপ্ত রূপ আঁকা হয়েছে, যার ফলে তাকে বাঙালীদের মধ্যে একেবারে অনন্য বলে সহজেই চেনা যায়। তার আচার আচরণেও সে তার সমকালীন যুগে তার

সমবয়সীদের থেকে পৃথক। তার ধর্মনিষ্ঠা যেমন উৎকট রকমের প্রখর, তার স্বাদেশিক চেতনাও তেমনি সেকালের পক্ষে বিস্ময়করূপে প্রজ্বলন্ত। তার সামাজিক মানুষের প্রতি প্রীতি, পথে ঝাঁকাওয়ালা মুসলমান খানসামার প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ, পল্লীভ্রমণ ও চরঘোষপুরে তার মারামারি, সব কিছুই তার সমকালীন সমবয়স্কদের থেকে পৃথক। শুধু সমকালীনদের থেকেই পৃথক তা নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাসের চরিত্রাবলীর জগতেও গোরা 'রজতগিরির' মতো স্বাতন্ত্র্যে সমুন্নতিতে বিশিষ্ট। সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য, এমন কি সমগ্র বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নায়ক হিসাবে গোরা বিশিষ্ট ; অবশ্য লেখক উপন্যাসের সূচনাতেই গোরার এই স্বাতন্ত্র্যের একটি কারণ নির্দেশ করে রেখেছেন। গোরা জন্মসূত্রে আইরিশম্যান, তার গাত্রবর্ণের উগ্ররকমের শুভ্রতা, তার চওড়া হাড়, কঠিন চোয়াল, দীর্ঘঋজুতা ও বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরের মৌলিক উৎসস্থল সেটি, তবুও অজ্ঞান শৈশব থেকে বাঙালীগৃহে লালিত ও বর্ধিত এই চরিত্রটি তার সমগ্র চারিত্র্যে এই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণভাবে বজায় রাখতে পেরেছিল। আমরা জানি যে, পরিবেশ মানুষের চরিত্রকে কী গভীরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, যা তার জন্মসূত্রে লব্ধ বিশিষ্টতাকেও ছাপিয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'য় এর প্রকৃষ্টতম উদাহরণ আছে, কেননা নির্জন সমুদ্রতীরে বসবাস, কাপালিকের সাহচর্য, তান্ত্রিক পূজার্চনার পরিবেশ, সামগ্রিকভাবে তার সত্তাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছিল, যা নামান্তরে তার চরিত্ররূপে গৃহীত হয়েছিল। গোরার ক্ষেত্রে অনুরূপ ঘটেনি, বিনয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও বিনয়ের মতো চরিত্র তার নয় ; গোরায় রবীন্দ্রনাথের এটাই সবচেয়ে বড়ো প্রকাশের বিষয়। গোরা গোরা বলেই স্বতন্ত্র, তার নেপথ্যে রয়েছে আনন্দময়ীর বিরাট ঔদার্য, যা তার ব্যক্তিত্বের প্রসারণে সর্বাধিক সক্রিয়তা পেয়েছে। গোরার এই বিরাটত্ব বা অসাধারণত্ব আরো স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যখন দেখি যে আনন্দময়ীর সপত্নীপুত্র মহিমের চরিত্র সেকালের আর পাঁচটা সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকের থেকে কোনমতেই পৃথক নয়।

এই গোরা চরিত্রের পরিকল্পনামূলে কোন্ বিশিষ্ট সমকালীন মানুষ রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা না ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়,—সে প্রশ্ন না তুলেও বলা চলে যে, রবীন্দ্রনাথ গোরাতে যেমন একটি বিস্তৃত সামাজিক ঐতিহাসিক পটভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি সেই বিরাট পরিপ্রেক্ষিতের উপযোগী নায়ক-চরিত্রও গড়তে চেয়েছিলেন। অনস্বীকার্য যে, এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য অবিসংবাদিত।

পারসোন্যালিটি বলতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থতই যা বোঝেন, যা কথনোই স্বাতন্ত্র্য বা চরিত্রশক্তি থেকে পৃথক নয়, অথচ যে শক্তি সুদীর্ঘকালীন অনুশীলনের মধ্যদিয়ে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে এবং যার সহায়তায় ক্ষুদ্র মানুষও বিরাট শক্তির মুখোমুখি দাঁড়াতে সমর্থ হয়, তাকে সমীকৃত করতে পারে আপন সত্তার মধ্যে, সেই পারসোন্যালিটিই গোরা চরিত্রে মূর্ত হয়েছে।[১৩] 'চোখের বালি' বা 'নৌকাডুবি'র মতো সাধারণ মানুষের প্রতিবিম্বন নয়, গোরাতে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অসাধারণ মানুষের প্রতিবিম্ব গড়তে চেয়েছেন। প্রথম পর্বে 'রাজর্ষি'তে গোবিন্দমাণিক্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় রাজাদর্শের প্রকৃষ্টরূপ খুঁজতে চেয়েছিলেন। 'গোরা'তে সেটিকেই তিনি সাধারণভাবে মানবিক ক্ষেত্রে খুঁজলেন, গোরা তাই মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা, পারসোন্যালিটির প্রতীক-স্থল।

গোরার এই অভিনবত্ব, অসাধারণত্ব, বিরাটত্ব ভালো বোঝা যায়, বিনয়ের সঙ্গে তার প্রতিতুলনায়। ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, সমগ্র উপন্যাসটিতে বিনয়ের উপস্থিতি গোরার চেয়ে বেশি। বিশেষ করে, গোরার কারাবাসের দীর্ঘ সময়টিতে বিনয়ই উপন্যাসের প্রধান কেন্দ্রীয় চরিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে দেখা যায় যে, বিনয় তার বিস্তৃত উপস্থিতি নিয়েও কিন্তু পাঠকের মনে তেমন কোন স্থায়ী দাগ কাটতে পারেনি। বিনয়ের প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমেই যে মূল্যায়ন স্থিরীকৃত হয়ে যায়, তা এই যে, বিনয় গোরার অনুচর, সহযোগী, ছায়ামাত্র। তার মুখে আমরা যেন গোরারই প্রতিধ্বনি শুনি। এজন্য ললিতার কিছু কিছু কটাক্ষ অসহ্য হলেও সত্য বলেই প্রতিবাদযোগ্য নয়। অথচ উপন্যাসে বিনয়কে গোরার চেয়ে কোন অংশে কম সমস্যার জটিলতায় পড়তে হয়নি। পরেশবাবুদের গৃহে যাতায়াত, ললিতার সঙ্গে প্রণয়, তাদের বিবাহ নিয়ে সামাজিক তর্কবিতর্কের ঘূর্ণাবর্ত, গোরার সঙ্গে আবাল্য বন্ধুত্বে সাময়িক বিচ্ছেদ—বিনয়ের জীবনের সংকট মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু বিনয়কে মোটামুটিভাবে সাধারণ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির আদর্শেই গড়ে তোলা হয়েছে, অথচ, তুলনামূলকভাবে গোরার জীবনে প্রত্যক্ষ সংকটের তেমন কোন জটিলতা এসে পড়েনি, তাকে সদাসর্বদা সংগ্রাম করতে হয়েছে মতবাদের তরফ থেকে। অবশ্য বাল্যবন্ধু বিনয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য বিচ্ছেদ তাকে অস্থির করেছে। আবার সারারাত্রি জাগরণের পর সূর্যোদয়ে সে আত্মস্থ হয়েছে। আসলে সমগ্র উপন্যাসে লেখক তার আত্মিক শক্তির বিকাশের দিকটিকেই বেশি স্পষ্ট করে

দেখিয়েছেন। তার চরিত্রের সক্রিয়তা আছে, তবে তা যতোটা পরিমাণে চিন্তা-তর্ক কিংবা মতবাদ বিনিময় ও গঠনে, ততখানি কর্মক্ষেত্রে নয়। অবশ্য একথা আমরা মোটেই ভুলে যাচ্ছি না যে তার দেশদর্শন, দেশের মানুষকে কাছে থেকে দেখার বাসনা বা আরো কিছু কিছু ব্যাপারে সে কর্মক্ষেত্রে সক্রিয়। একজন সমালোচক গোরা চরিত্রের পর্যালোচনায় তাই যথার্থই বলেছেন: "গোরা একটি বিরাট মানব, মহাকাব্যের নায়কের মধ্যে যে শক্তি, তেজও প্রতিভ ।থাকা উচিত তাহা তাহার চরিত্রে খুব বেশি করিয়াই আছে। কেবল মহাকাব্যে যে বিরাট সংঘর্ষের চিত্র দেওয়া হইয়া থাকে, এই উপন্যাসে সেইরূপ কিছুই নাই। গোরার বিরুদ্ধে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তাহার সমকক্ষ, যাহার সঙ্গে তাহার সত্যিকার বিরোধ হইতে পারে।"[১৪] গোরা চরিত্রের বিপুল তেজ, শক্তি ও প্রতিভার উপযুক্ত বিপক্ষতা 'পানু বাবু' বা ঐ ধরণের কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে যে অসম্ভব, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর গোরা যে চরিত্র মাহাত্ম্যে মহাকাব্যিক, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কেননা মহাকাব্যের বীর নায়কদের মতোই গোরা তর্কবীর। তার চরিত্রের এই তর্কবীরত্ব নেহাৎ কথার কথা নয়, যে সামাজিক অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমিকা 'গোরা' উপন্যাসের উপজীব্য তার তর্কমুখর সংক্ষুব্ধ আবহাওয়ায় তর্কবীর যথার্থ বীরপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য সে তর্ক যদি নিষ্প্রাণ যুক্তির প্রয়োগ-চমৎকারিত্বেই সীমাবদ্ধ না থেকে তার জীবনের সমগ্র ধ্যান ও কল্পনার অঙ্গীভূত হয়ে উঠতে পারে। গোরার তর্কবীরত্ব ও মহাকাব্যিক নায়কের বীরত্বের সমতুল্য, কেননা তা একাধারে তার ব্যক্তি-সত্তার প্রধান ভিত্তি, আশ্রয়স্থল ও প্রকাশ, অন্যদিকে সমগ্র জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একীভূত। মহাকাব্যের নায়ক যেমন একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও জাতিগত উভয় ধারণারই প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, গোরার মধ্যেও তার পূর্ণতম প্রকাশ লক্ষ্য করে আমরা তার বিরাটত্বের সম্যক পরিচয় পাই। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সমালোচকের আর একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য আমাদের মতের সহায়ক হবে। তিনি গোরার তর্কবীরত্ব সম্পর্কে বলেছেন:

"গোরা তর্ক করে, কিন্তু তাহার মধ্যে যুক্তি অল্প। তাহার সকল যুক্তি আসে উপমার মারফতে। তাহার কাছে কোন যুক্তি শো শুধু আকারহীন মত নয়, তাহা রূপবিশিষ্ট চিত্র, তাহা কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত, গোরা কোন আলোচনায় যোগ দিলেই, চিত্রের উপর চিত্র, উপমার পর উপমা দিয়া

যায় ; কারণ তাহার যুক্তিগুলি সে শুধু ভাবিয়া ঠিক করে নাই, সে তাহাদিগকে প্রাণ দিয়া অনুভব করিয়াছে, সে মনশ্চক্ষে তাহাদিগকে দেখিয়াছে ; তাহারা তাহার কাছে একান্ত সত্য।"[১৫]

সুতরাং গোরার তর্ক কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীর তর্কবিলাস নয়, তা তার আত্মিক শক্তিরই প্রকাশ। মনে রাখা দরকার যে, সে যে সময়কার লোক, সেই সময়ে কেশব সেনের বক্তৃতায় দীক্ষিত বাঙালীর মন চঞ্চল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন সাহিত্যের অধিদেবতা। সমগ্র সামাজিক ও সারস্বত পরিমণ্ডল তখন উদ্দীপ্ত ভাবকণিকায় পরিপূর্ণ। এই তর্কপ্রাণ মানসিকতা দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আরো একটি অনন্য চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। সে 'শেষের কবিতা'র অমিত রায়। তার সঙ্গে গোরার তার্কিকতার তুলনা করলেই উভয়ের ব্যক্তিগত ও যুগগত, উভয় বৈশিষ্ট্যই স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে। গোরা ও অমিত উভয়েই আপন আপন ক্ষেত্রে অনন্য, তাদের স্রষ্টিকর্তা স্বয়ং তাদের এই অনন্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন :

"গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না কিন্তু তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।" আর অমিত বিষয়ে তাঁর মন্তব্য :

"ওর চেহারাতেই একটি বিশেষ ছাঁদ আছে। পাঁচজনের মধ্যে ও যে কোন একজন মাত্র নয়, ও হলো একেবারে পঞ্চম, অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে।"

এই দুই অনন্য যুগপ্রতিনিধির চিত্র আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একজনকে করেছেন মহাকাব্যিক মহিমামণ্ডিত নায়ককুলের উত্তরসূরী, অপরজনকে বানিয়েছেন যুগোচিত উচ্ছলতার অনুরূপ, কিছুটা লঘুতার সঙ্গে। গোরার কাজের অন্ত নেই, দেশ, জাতি-সমাজ-ধর্মের বিপুল তরঙ্গভঙ্গে অক্লান্ত সাঁতারুর মতো সে সমাধানের তটভূমির দিকে সদা অগ্রসর ; আর অমিতের হাতে কোন কাজই নেই, তাই তার মতবাদ হলো কাজ করাটা একটা কুসংস্কার। গোরার বেশভূষা ও অমিতের বেশভূষার তুলনা করলে একটা সাদৃশ্য উভয়-ক্ষেত্রেই চোখে পড়ে যে, সমকালীন পাশ্চাত্য বেশভূষাপ্রীতির বিরুদ্ধে দুজনেই বিদ্রোহী। কিন্তু গোরার বেশভূষা যেখানে অন্তরের সত্য-পিপাসার ভিত্তিভূমি থেকে পরিকল্পিত হয়েছে, অমিতের পোষাক সেখানে কবির ভাষায়—"একে ঠিক সাজ বলা যায় না, এ হচ্ছে ওর একধরণের উচ্চহাসি।" যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ক্রমভঙ্গুর মূল্যবোধ ও অন্তঃসারশূন্য সিনিক যুগের প্রতিনিধি অমিত রায় ; আর গোরার মধ্যে সেই যুগেরই প্রতিফলন :

"গোরা সেই যুগের বাঙালী, যে সমাজ-সংস্কার করিতে চায়, ইংরেজ তাড়াইতে চায়, ভারতবর্ষকে উপলব্ধি করিতে চায়—সে ঘোরতর ব্রাহ্মবিরোধী ভুল হোক, ভ্রান্ত হোক, একটা বিশ্বাসের দ্বারা সে চালিত। যে উপাদানে বিধাতা বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ প্রভৃতিকে তৈয়ারী করিয়াছিলেন, তাহারা সেই উপাদানের মানুষ।"[১৬]

এই সমাজসংস্কার-প্রয়াস, ইংরাজ-বিতাড়নে আগ্রহ বা ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধির অভীপ্সা—সমস্ত কিছুই গোরার জীবনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর বলা চলে যে, সমগ্র গোরাচরিত্রের উদ্বর্তন চরিতার্থ হয়েছে ভারতবর্ষের স্বরূপ উপলব্ধির অভ্রভেদী আত্মআবিষ্কারে। গোরার কর্ম, তর্ক, জেদ ও দৃঢ়তার সমস্ত পথই শেষ পর্যন্ত এসে মিশে গেছে এই মহতী চেতনায়।

"গোরা কহিল, মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই। তুমি শুধু কল্যাণের প্রতিমা, তুমি আমার ভারতবর্ষ।"

এই উপলব্ধি যেমন একদিকে গোরার চেতনাকে মুক্তি দিল, আনন্দময়ীর পায়ের তলাতেই সে ভারতবর্ষের সত্যস্বরূপ ও আশ্রয়টিকে দেখতে পেল, অন্যদিকে তেমনি তার মানবিক পরিপূর্ণতা ঘটলো সুচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুর পদপ্রান্তে প্রণত হয়ে। মুক্ত ধর্মবুদ্ধির দরুণ আপন সম্প্রদায় থেকেও বিবিক্ত পরেশবাবুর মধ্যেই গোরা তার মুক্ত আত্মার আদর্শস্থল দেখতে পেলো। কিন্তু শুষ্ক বৈরাগ্যে সে সেই মুক্তির পথে যাত্রা করলো না, সুচরিতার প্রেমের সাহচর্যকে সে বরণ করে নিল। এখানেই গোরা চরিত্রে আদর্শ উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক উৎকর্ষের চূড়ান্তও সাধিত হয়ে গেল। লেখক বলেছেন:

"এই বলিয়া গোরা তাহার দিকে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া গেল, সুচরিতা চৌকি হইতে উঠিয়া গিয়া নিজের হস্ত তাহার হাতে স্থাপন করিল, তখন গোরা সুচরিতাকে লইয়া—পরেশকে প্রণাম করিল।"

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারাবাহিকতার মধ্যে যদি কোনো পর্ববিন্যাসের সুযোগ থাকে তবে 'গোরা' নিঃসন্দেহে তাঁর দ্বিতীয় পর্বের শীর্ষভূমি। প্রথমপর্বে ইতিহাসের পটে ধরা মানুষের স্বরূপ খুঁজেছেন কবি প্রতাপাদিত্যের বিকৃত সত্তা ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রকৃত সত্তার বিপরীত তুলনাভূমিতে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রভাবনা সেখানে চরিতার্থ হয়েছে গোবিন্দমাণিক্যের রাজর্ষিস্বভাব ও

সত্তায়। অতঃপর সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর যে অবতরণ ও প্রসারণ, তার চমৎকৃতি ও সমুন্নতি গোরায়। এখানে গোরার ঠিক পূর্বজ কেউ আছে কিনা বলা শক্ত, কেননা বিহারী বা নলিনাক্ষের চরিত্রে বিশিষ্ট গুণের অবস্থান দেখা গেলেও, গোরার মহিমা, তীক্ষ্ণতা, ব্যাপ্তি ও বিরাটত্বের কোনো পূর্বরূপই তাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। উনিশ শতকের বাংলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে যে বিরাট আদর্শের অনুসন্ধান শুরু হয়েছিল, গোরায় তা যেন চরিতার্থ হয়েছে। যে স্বাদেশিক চেতনা উনিশ শতকের শেষাংশ থেকে বঙ্কিমের কল্পনায় উদ্ভাসিত হয়েছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে যার ক্রমপ্রসার লক্ষ্য করা যায়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় যার একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা গড়ে উঠেছিল এবং বিশ শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে যা শতধারায় উৎসারিত হয়েছিল, সেই বিশিষ্ট চেতনার প্রেরণাবশেই 'আনন্দমঠ' থেকে 'গোরা' পর্যন্ত বাঙালী মনীষায় কল্পনার একটি ক্রমবিকাশ ও পরিণতির চিহ্ন পর্যায়ক্রমে ধরা পড়েছে। এই স্তরে স্বাদেশিক চেতনা অনেকটাই ছিল জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমথিত। 'গোরা'তে এই চেতনার একই সঙ্গে পূর্ণতাসাধন ও উত্তীর্ণ হওয়ার বিবরণ রয়েছে। গোরার সামগ্রিক জীবনসাধনার কেন্দ্রীয় যে স্বাদেশিক চেতনা, তার সঙ্গে জাতীয়তাবাদী মানসিকতা সর্বত্রই সহগামী। অথচ উপন্যাসের শেষে গোরার যে আত্মমুক্তি তাতে এই জাতীয়তাবাদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্কেতও ব্যঞ্জিত হয়েছে। গোরার রবীন্দ্রভাবনা স্বাদেশিক ও জাতীয়তাবাদ থেকে যেন সর্বদেশীয় ও আন্তর্জাতিকতাবাদী হয়ে উঠতে চেয়েছে। অবশ্যই উপন্যাসে তা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়নি, আনন্দময়ীর মধ্যে ভারতবর্ষের সত্যস্বরূপের সন্ধানলাভ ও সর্বসাম্প্রদায়িক পরেশবাবুর চরণে প্রণতি জানানোয় গোরার চরিত্রের পূর্ণবিকাশই দেখানো হয়েছে, তার আধ্যাত্মিক সংকটের নিরসন ঘটানো হয়েছে, আর বাংলা উপন্যাসের মাঝারি চরিত্রের ভীড়ে এক উন্নতশীর্ষ রজতগিরি-সন্নিভ বিরাটের বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এ চরিত্র সর্ব দেশের সাহিত্যেই বিরল, কেননা জাতীয় জীবন ও ব্যক্তিগত কল্পনার এমন তুঙ্গী মুহূর্ত সাধারণত সুলভ নয়। বাংলা উপন্যাসেও গোরা বিশিষ্ট, কিন্তু বিরল ও ব্যতিক্রান্ত। লেখকের কল্পনাও তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা ও ঐশ্বর্য নিয়ে এক অখণ্ড রূপনির্মাণে এখানে ব্রতী হয়েছে ও চরিতার্থতা অর্জন করেছে। পারসোন্যালিটির পরিপূর্ণতা গোরাতেই আয়ত্তে এসেছে।

॥ ৯ ॥

প্রমথ চৌধুরী-সম্পাদিত 'সবুজপত্র' ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয় ও প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য রচনার সঙ্গে প্রতি সংখ্যায় একটি করে গল্পও প্রকাশ করেন। সাতমাসে সাতটি গল্প প্রকাশ হবার পর অষ্টম মাস থেকে 'চতুরঙ্গ'র চারটি অঙ্গ পরপর প্রকাশিত হয় অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত। গ্রন্থাকারে 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালের ভাদ্রমাসে। এই ১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসেই রবীন্দ্রনাথের আর একটি উপন্যাস 'ঘরে বাইরে' প্রকাশিত হয়, যদিও তা রচনাকালের দিক দিয়ে 'চতুরঙ্গে'র পরবর্তী। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' রবীন্দ্রনাথের জোড়া উপন্যাস, কিন্তু দুটির বিষয়বস্তুতে পার্থক্য দুস্তর। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে যেমন, সমগ্র বিশ্বসাহিত্যের উপন্যাসজগতেও তেমনি এটি একটি লক্ষণীয় মোড় ঘোরার সময়। গোরা পর্যন্ত যদি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্যায় ধরা হয়, তবে 'চতুরঙ্গ' থেকে তার তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা।

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস তার পূর্ববর্তী ধারা ও রূপ থেকেও অনেকখানি স্বতন্ত্র ও পরিবর্তিত হয়ে গেছে। 'গোরা' পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে রাবীন্দ্রিক স্বাতন্ত্র্য থাকলেও, সাধারণভাবে উপন্যাসের যে একটি নিরূপিত রূপ ও রীতি প্রচলিত ছিল, সেখানে তা-ই গৃহীত হয়ে এসেছে। সেখানে বিবৃতি ও বিস্তৃতিকেই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান উপাদানরূপে গ্রহণ করা হয়েছে, যা বিষয়বিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ-উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' থেকেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে একটি বিশিষ্টতার সংযোজন ঘটলো, বিবৃতি ও বিস্তৃতির পরিবর্তে সংকেত, ইঙ্গিত এবং সংক্ষিপ্ততাই প্রধান উপাদানরূপে গৃহীত হলো। অবশ্য এই পরিবর্তন শুধু যে বাংলা সাহিত্যেই ঘটেছে তা নয়, গোটা পৃথিবীর উপন্যাসজগতেই এই সময়ে এই পরিবর্তনের লক্ষণগুলি বিদ্যমান ছিল। প্রত্যক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্ব-উপন্যাসের সান্নিধ্যে এসেই এই পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন, না কি আপন বিশ্বমনীষার নিগূঢ় গুণেই তিনি এই পরিবর্তনের ধারাটিকে সহজ অনুভূতির উপলব্ধিতে পেয়েছিলেন, তা সঠিক করে বলা শক্ত। একজন বিদগ্ধ সমালোচকের রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বিশ্বব্যাপী এই দিকপরিবর্তনের রেখাচিত্রটি স্মরণ করা যেতে পারে :

"১৯১৪ সালে মার্সেল প্রুস্তের 'আ লা বেশার্শ দ্য তাঁ পাদ্যু'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যে চাঞ্চল্য আনলো।·········১৯১৪

সালে প্রথম মহাযুদ্ধের কামান গর্জে উঠলো বটে, কিন্তু বিশ্ব উপন্যাসের পক্ষেও এই বৎসর এক ক্রান্তিকাল, এই বৎসরেই জেমস্ জয়েস তাঁর 'ইউলিসিস' লেখা শুরু করেন, সারা করেন ১৯২২ সালে। ......১৯১৫ সালে ডরোথি রিচার্ডসনের 'পয়েন্টেড্ রুফস্' প্রকাশিত হল বটে, কিন্তু এই উপন্যাসও ১৯১৪ সালেই বিকশিত। জয়েস যদি সাহিত্যে আত্মোক্তি প্রবাহ (monologue) ব্যবহার করে থাকেন, তবে আধুনিককালের চৈতন্যপ্রবাহ (stream of consciousness) ডরোথি রিচার্ডসনেরই অবদান।.......…পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, ১৯১৪ সালেই চতুরঙ্গ সূচিত এবং ১৯১৫ সালের প্রথমদিকে সমাপ্ত। .... মনে হয় ১৯১৪ সাল যেন বিশ্বমানবের অন্তরে বাইরে এক বিপুল বিপ্লব নিয়ে দেখা দিয়েছিল—তা কেবল যুদ্ধ-সীমান্তেই নয়, সাহিত্য-সীমান্তেও বটে। সে বিপ্লবের দুন্দুভি ইউরোপে বসে শুনেছিলেন প্রুস্ত-জয়েস-ডরোথি এন আর, বাংলাদেশে বসে শুনেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাই 'চতুরঙ্গে' রবীন্দ্রনাথ নতুনকালের উপন্যাসই লিখেছেন 'চোখের বালি' কিংবা গোরার অনুবর্তন করেননি।"[১৭]

এই নতুনকালের উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ তাই মানুষের যে রূপ ও স্বরূপ দেখেছেন ও দেখিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের। তাঁর চরিত্রায়ণ, বিশেষ করে উপন্যাসের নায়ক-ভাবনাও এই বিশিষ্ট নতুনত্বের আলোকে আলোকিত হয়ে নব কলেবর ধারণ করেছে। রবীন্দ্রউপন্যাসে জোড়া পুরুষ চরিত্রের প্রাদুর্ভাব প্রথম থেকেই। নগেন্দ্র ও মহেন্দ্র 'করুণা'য়, প্রতাপাদিত্য ও উদয়াদিত্য 'বৌঠাকুরানীর হাটে', গোবিন্দমাণিক্য ও রঘুপতি 'রাজর্ষি'তে, মহেন্দ্র ও বিহারী 'চোখের বালি'তে, রমেশ ও নলিনাক্ষ 'নৌকাডুবি'তে কিংবা গোরা ও বিনয় 'গোরা'তে—সব কখানি উপন্যাসেই এই বিশিষ্টতা ধরা দিয়েছে। অবশ্য দুটি করে পুরুষচরিত্র প্রাধান্য পেলেও প্রতাপাদিত্য গোবিন্দমাণিক্য বা গোরার মতো নায়কত্ব অবিসংবাদিতভাবে একজনের উপরই অর্পিত হয়েছে, সেখানে দ্বিমতের বা দ্বিধার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি। সমালোচক কখনোই নায়ককে খুঁজে নিতে ভুল করেননি; কিন্তু 'চতুরঙ্গ' থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের যে নতুন পর্যায়ের সূচনা হলো, সেখানে নায়কভাবনায় কিছুটা দ্বিধা দেখা দিল, জোড়া পুরুষ চরিত্রের মধ্যে আর কিন্তু পূর্বের মতো নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলা গেল না যে ইনিই নায়ক, অন্যজন

নয়। লেখকের স্পষ্ট অভিমুখিতা সত্ত্বেও পাঠকের মনে আখ্যানের নায়ক সম্পর্কে একটি দ্বিধা অনিবার্যভাবেই ছায়া ফেলতে লাগলো এবং নতুনকালের রচনার উপযোগী নতুন ধরণের বিচারের মাপকাঠির সহযোগে বলতে হলো যে, এই জোড়া-চরিত্রের উভয়েই নায়ক। একজন যদি হন বহিরঙ্গে, অপরজন অন্তরঙ্গে, একজন যদি সচেতন ঔপন্যাসিকের চেতনায়, অপরজন অবচেতন কবিমনের প্রেরণায়। বাস্তবতার বোধ যেমন এই সময় থেকেই ক্রমে বহিরঙ্গের ঘটনাবহুলতা ছেড়ে অন্তরঙ্গের গহন জটিলতায় পথ বদল করে নিতে শুরু করেছিল, নায়কচরিত্রের পরিকল্পনাতেও তেমনি তারই প্রতিফলন পড়েছিল।

একথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে মনে হয় 'চতুরঙ্গে'র নায়ক বিচার করতে গিয়ে। 'চতুরঙ্গে'র মূল উপজীব্য কি?—এই প্রশ্নের সফল উত্তরের উপরেই এর নায়কের স্বরূপ-সন্ধানের সমাধানটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে। সমালোচকের মনেও তাই এই উপন্যাসের মৌলভাবনা সম্পর্কে সসংশয় প্রশ্ন জেগেছে:

> "প্রশ্ন জাগে, 'চতুরঙ্গ' কি শচীশের পূর্ণতার কাহিনী, না জীবনের কাছে দামিনীর প্রত্যাবর্তনের এক সকরুণ ইতিহাস? হয়ত এর উত্তর নির্দ্বিধায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও দিতে পারতেন না"[১৮]

যদি শচীশের আত্মিক সাধনা ও তার পূর্ণতা উপলব্ধির কাহিনীই 'চতুরঙ্গে'র মুখ্য হয় তবে শচীশ অবশ্যই নায়ক, কিন্তু যদি জীবনের কাছে দামিনীর প্রত্যাবর্তন এর মুখ্য হয়, তবে দামিনীর 'জীবন' শ্রীবিলাসও এর নায়কপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে। মনে রাখা দরকার যে উপন্যাসের ঘটনার কেন্দ্রীয় প্রাণপুরুষই নায়ক এবং যার অনস্তিত্বে কাহিনী এগোতে পারে না, তাই 'চতুরঙ্গে' একই সঙ্গে শচীশ ও শ্রীবিলাস,—তারা পরস্পর স্বাতন্ত্র্যে ও পরস্পরের পরিপূরকতায় এই উপন্যাসের নায়করূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে। গোটা কাহিনীটি শ্রীবিলাসের আত্মকথন বলেই সে কোথাও নিজে প্রকট হয়ে ওঠেনি, আর বন্ধুত্বে, গুণগ্রাহিতায় ও পরমসহিষ্ণুতায় সে শচীশের ছায়া-সহচর বলেই গ্রন্থে শচীশ এতো উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত; শ্রীবিলাসের মুখে তার রূপের কথা আমাদের স্বাভাবিকভাবেই গোরার কথা মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ নতুনকালের কথা লিখতে গিয়ে ঠিক পূর্ববর্তী কালটিকে একেবারে ভুলতে পারেননি। শচীশের বিশিষ্ট রূপ ও সাধনার মধ্যে যেন তারই একটি স্বল্প-পরিবর্তিত অনুবর্তন আছে। যেমন রূপের বর্ণনায়:

> "শচীশকে দেখিলে মনে হয় যেন একটা জ্যোতিষ্ক—তার চোখ

জ্বলিতেছে, তার লম্বা সরু আঙুলগুলি যেন আগুনের শিখা, আর গায়ের রং যেন রং নহে, তাহা আভা"।

গোরার রজতগিরির মতোই শচীশের এই জ্যোতিষ্করূপ তার স্বাতন্ত্র্যই ঘোষণা করে। তাছাড়া, গোরার মতো শচীশের সাধনাও আত্মউপলব্ধির সাধনা। গোরা তার আত্মার স্বরূপকে স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে খুঁজতে চেষ্টা করেছিল এবং সবশেষে সবকিছু উত্তীর্ণ হয়েই তাকে পুরোপুরি লাভ করতে পেরেছিল। শচীশের সাধনার মধ্যেও তার অনুরূপতা আছে। জ্যাঠামশায়ের জ্ঞানভিত্তিক কর্মযোগে কিংবা লীলানন্দ স্বামীর ভাবভিত্তিক রসযোগে সে নিজস্বরূপকে জানতে চেয়েছিল এবং সবশেষে তার যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে তাতেও তার সাধনার সমাধান ও সন্ধান-সমাপ্তির এক অস্তিবাচক ইঙ্গিত আছে। তার সাধনার ইতিহাসটি সংক্ষেপে এই রকম :

> "নিরীশ্বর কর্মযোগ ছিল নিছক অরূপের সন্ধান, ভক্তিযোগে ছিল প্রত্যক্ষরূপের সন্ধান, আর এখন? শচীশ এখন হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছে যে, রূপেও নয়, অরূপেও নয়, রূপারূপের সমন্বয়ের মধ্যেই সার্থকতার সন্ধান করিতে হইবে। তাহার মতে তিনি অরূপ হইতে রূপের দিকে নামিতেছেন, তাই সাধককে রূপ হইতে অরূপের দিকে উঠিতে হইবে, তবে তো মাঝপথে দুজনের মিলন হইবার সম্ভাবনা"।[১৯]

এই সাধনাই শচীশকে চির-পথিক বৈরাগী করে তুলেছে। তাই কাহিনীর শেষের দিকে তার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মরুভূমির পথিককে মরীচিকার প্রান্তে এক আধবার যেমন চোখে পড়ে, শচীশকে এক আধবার তেমনি পদ্মার চরে দেখা যায়। রৌদ্রভাস্বর বৈরাগ্যের বিরাট পটভূমিতে শচীশকে আর বদ্ধ জীব বলে মনে হয় না। সে যেন আপনার পূর্ণতর রূপের ছায়ামাত্র। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গী ও লীলানন্দ স্বামীর শিষ্য উভয়েই সংসারী জীব; কিন্তু তৃতীয় স্তরের শচীশ নিতান্তই সংসারাতীত।[২০] কিন্তু উপন্যাসে বৈরাগ্যের স্থান কোথায়? জীবনই ত তার উপজীব্য। আর সেই জীবন সংসারের শতবন্ধনকে স্বীকার করেই আপন আত্মার চরিতার্থতায় সমুদ্ভাসিত। গোরার মুক্ত জীবনবোধেও তার জীবনসাথী হিসাবে সুচরিতা সংসারের সীমাতেই তাকে ধরে রেখেছে। তাই শচীশের পূর্ণতার সাধনা উপন্যাসের অন্যতম উপজীব্য হলেও, একতম নয়; শচীশ

বিশিষ্ট ও স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল হলেও, জীবনের যোগ্য প্রতিনিধি নয়। তার মধ্যে নায়কযোগ্য গুণপনার অভাব না থাকলেও, পরিপূর্ণ উপন্যাসের নায়ক সে হতে পারেনি। তার সাধনায় সাংসারিকতায় যে অপূর্ণতা, তার যোগ্য পরিপূরক শ্রীবিলাস, সে দামিনীর জীবনের কাছে ফিরে আসবার একমাত্র অবলম্বন, সে নিজেই জীবনের বাস্তবিক রূপ। 'শেষের কবিতা'য় শোভনলালের মধ্য দিয়ে, সুখ দুঃখ ভালোমন্দে মেশানো অসীম ক্ষমায় জীবনের যে রূপ রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এঁকেছেন, শ্রীবিলাস তারই পূর্বাভাস। শচীশের বহিরঙ্গচাঞ্চল্য, তার সাধনামার্গের ঘন ঘন পরিবর্তন, তার সক্রিয়তা যেমন সত্য, তেমনি সত্য নীরব, নিষ্ক্রিয় ও সর্বাশ্রয়ধর্মী শ্রীবিলাসের শান্ত গভীরতা। সে শচীশের সহচর, কিন্তু ছায়া নয়, সে তার সখা ও সম্পূরক। 'গোরা'র বিনয় আর শ্রীবিলাসে এখানেই মৌলিক তফাৎ, তাই 'গোরা'র বিনয় চরিত্র যথেষ্ট জীবনধর্মী হলেও, গোরার নায়কত্ব নিঃসন্দিগ্ধ ; কিন্তু 'চতুরঙ্গে' শচীশের পাশে শ্রীবিলাসও তার আপন ব্যক্তিত্বের মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

একটা প্রশ্ন এখানে স্বতই জাগে যে, 'চতুরঙ্গে' একদিকে যেমন উপন্যাসের আঙ্গিকে এলো লক্ষণীয় পরিবর্তন, অন্যদিকে তেমনি নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনাতেও এলো ঐক্যের বদলে দ্বিধা, তার কারণ কি এবং তা কি নিতান্তই অনিবার্য? একথা অবশ্যই সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা কখনোই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্লটের সংহতি দেখতে পাইনা, তবুও 'গোরা' পর্যন্ত উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি তাঁর স্বকীয় ধরণের প্লট নির্মাণে সার্থক হয়েছিলেন। বহিরঙ্গ বাস্তবতার বদলে অন্তরঙ্গ বাস্তবতায় যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির বাঁক ফেরা, সেটা স্বীকার করে নিয়েই একথা নিশ্চিন্তে বলা যায়, এর একটা প্রধান কারণ কবির মনে বিশ্বাসের স্পষ্ট চেতনা। বিশেষ করে 'গোরা'র প্রসঙ্গ তুলে বলা চলে যে, কবির ধ্যানকল্পনায় যে সুমহান ঐক্যবোধ ছিল, উপন্যাসে তাই গঠনগত সুষমা ও নায়কগত ঐক্য এনে দিয়েছে। অশনে বসনে স্বদেশী, শিক্ষায় দীক্ষায় স্বদেশী—এই বিশিষ্ট ভাবকেন্দ্রে সুস্থিত থেকেই উনিশ শতকের 'আনন্দমঠ' থেকে বিশ শতকের 'গোরা' পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক মানসিকতা চলে আসছিল, ছোটখাটো দু'একটি ব্যতিক্রম সঙ্গে নিয়ে। তাই কবিকল্পনায় গঠনগত ও নায়কগত পরিকল্পনায় কোনো দ্বিধারই অবকাশ ছিল না। কিন্তু ১৯১৪ সালে বিশ্বব্যাপী ভাবপরিবর্তনের যে উল্টোপাল্টা হাওয়া বইতে শুরু করে এবং যার স্পষ্ট প্রভাবেই ইউরোপীয় সাহিত্যে আসে নতুন রীতি ও ভাবনার জোয়ার, দূরে বসেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনের তারবিহীন টেলিগ্রাফে

তার সঙ্কেত ধরতে পেরেছিলেন। তাই যেমন 'চতুরঙ্গে'র চার অঙ্গের মধ্যে ঐক্য গড়ে উঠেছে কিনা, এ প্রশ্ন নানাজনের মনে জেগেছে, তেমনি শচীশের সাধনাই এর প্রধান উপজীব্য কিনা,—এ সংশয়ও অনেকের মনে জেগেছে। 'গোরা'তেও গোরার জীবনসাধনা ও তার পূর্ণতার ইতিহাস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শচীশের মতো অস্পষ্ট সাঙ্কেতিকতায় তাকে পরিব্যাপ্ত করা হয়নি। গোরার প্রসন্ন সূর্যালোকিত পরিবেশে সমাজ পরিবেশের সঙ্গে কর্মের যোগে ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নায়ক-চরিত্রের হৃদয়-শতদলের এক একটি পাপড়ি মেলে ধরেছেন ও পরিণামে তার শুদ্ধ, মুক্ত, পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপটিকে জীবন্ত ও সক্রিয় রূপেই সকলের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। সেখানে ধ্যান ও জীবন, তত্ত্ব ও বাস্তবতা গোরার মধ্যেই ঐক্য-সংহতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তাই সাধনাক্ষেত্র ও জীবনক্ষেত্র, উভয় ক্ষেত্রেই গোরার অবিসংবাদী কেন্দ্রীয়তা গৃহীত হতে কোনো বাধা জাগেনা। কিন্তু 'চতুরঙ্গ' পর্বে রবীন্দ্রনাথের মনেই দ্বিধা ছিল। এই দ্বিধার একটা পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায় গ্রন্থাকারে বইটির প্রকাশে বিলম্ব ঘটাতে, কেননা 'ঘরে বাইরে'র আগে রচিত হয়েও এটি এই অন্তর্নিহিত দ্বিধার জন্যই পরে প্রকাশিত। এই দ্বিধা শুধু উপন্যাসের আঙ্গিকেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তা তার অন্তরেও স্বাক্ষর রেখেছে। সাধনার পূর্ণতা আর জীবনের পূর্ণতা তাই এখানে একরূপে সমীকৃত হতে পারেনি। শচীশের মধ্যে সাধনার পদযাত্রা আর শ্রীবিলাসে জীবনের পরিক্রমা—এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথকে সমাধান করতে হয়েছে। আর এই দ্বিধাগ্রস্ততা বা দ্বৈত-নায়কত্বের পরিকল্পনা 'চতুরঙ্গে'ই একটি বিশিষ্ট ব্যতিক্রান্ত অধ্যায় হয়ে থাকেনি, তা পরবর্তী উপন্যাসগুলিতেও সংক্রামিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'র নিখিলেশ ও সন্দীপ, 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় ও শোভনলাল কিংবা 'যোগাযোগে'র বিপ্রদাস ও মধুসূদন এই ভাবনারই উত্তরচিন্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে চিন্তাগত সাদৃশ্যে 'শেষের কবিতা'র দ্বিধাই 'চতুরঙ্গে'র সদৃশ, অপর দুটিতে দ্বিধার সঙ্গে প্রতিতুলনারও একটা স্পষ্ট অভিপ্রায় লক্ষ্য করা যায়।

॥ ১০ ॥

রচনাকালের দিক দিয়ে কিছুটা পরবর্তী হলেও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে 'চতুরঙ্গে'র কয়েকমাস আগেই প্রকাশিত হয়। 'সবুজপত্র' প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রতি সংখ্যাতেই একটি করে ছোটগল্প পত্রিকায় প্রকাশ করেন। প্রথম বছরে বারো মাসে বারোটি গল্প প্রকাশের পর দ্বিতীয় বছরের গোড়া থেকেই তিনি ধারাবাহিকভাবে এই রচনাটি প্রকাশ

করতে শুরু করেন। বইটি রচনা ও প্রকাশের কালে সেকালের নানামতের মানুষ এর সপক্ষে ও বিপক্ষে তর্কে ও আলোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন। 'ঘরে-বাইরে'-তে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন রাজনীতি সম্পর্কে এমনই মনোভাব ও মতামত প্রকাশ করেন, যাতে সমগ্র দেশের চিন্তাক্ষেত্রে একটি আলোড়ন ঘটে যায়।

'সবুজপত্র' পত্রিকার প্রকাশ বাংলা দেশে চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে এক নবজীবনের ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল। পত্রিকার মুখপত্রে প্রমথ চৌধুরী জানান,—

> "যে জীবনী শক্তির আবির্ভাবের কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে শক্তি আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ হয়নি, তা হয় দূর দেশ হতে নয় দূর কাল হতে, অর্থাৎ বাইরে থেকে এসেছে। সে শক্তি এখনো আমাদের সমাজে ও মনে বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে। সে শক্তিকে নিজের আয়ত্তাধীন করতে না পারলে তার সাহায্যে আমরা সাহিত্যে ফুল কিংবা জীবনে ফল পাবো না; এই নতুন প্রাণকে সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে হলে প্রথমে লোকের মনে তা প্রতিফলিত করা দরকার। অথচ ইয়োরোপের প্রবল ঝাঁকুনিতে আমাদের অধিকাংশ লোকের মন ঘুলিয়ে গেছে, সেই মনকে স্বচ্ছ করতে না পারলে তাতে কিছুই প্রতিবিম্বিত হবে না। বর্তমানের চঞ্চল এবং বিক্ষিপ্ত মনোভাব সকলকে যদি প্রথমে মানস-দর্পণে সংক্ষিপ্ত ও সংহত করে প্রতিবিম্বিত করে নিতে পারি, তবেই তা পরে সাহিত্যে-দর্পণে প্রতিফলিত হবে।"

দূর দেশ অথবা দূর কাল থেকে ভেসে-আসা ভাবনা তখন বাঙালীর চেতনাকে চঞ্চল ও মথিত করে তুলেছিল, বিদেশী সাহিত্যের নব যুগোচিত প্রেরণায় পুরাতন মূল্যবোধের ভঙ্গুরতা প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল আর নতুন মূল্যবোধের দিগন্তও তখন খুব স্পষ্টরূপে চোখের সামনে ধরা দেয়নি; তাই প্রশ্নমনস্কতার মধ্যেই এই নতুন যুগের ভাবনা মুক্তি পেতে চাইছিল। তখন প্রশ্ন জেগেছিল অনেকগুলি—এতদিনের প্রচলিত মূল্যবোধের কতখানি আজ স্বীকার্য, নারীর অধিকারের সীমা কতখানি প্রসারিত, নতুন নতুন বৈপ্লবিক ভাবনাকে আমরা কি পরিমাণেই বা আত্মস্থ করে নিতে পারি। সেকালের অগ্রগণ্য লেখক হিসাবে রবীন্দ্রনাথকেই এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর-সন্ধানে তৎপর হতে হলো ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সেই প্রচেষ্টাই রূপায়িত হলো।

'ঘরে বাইরে'র প্রধান তিন চরিত্র—বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ। বইটির নামকরণের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায় যে, বিমলাই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। সমকালীন সাহিত্য ও সমাজের নারীমুক্তির পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বিমলার মধ্য দিয়ে সংসার ও সমাজে নারীর যথার্থ স্থানটিকে নিরূপণ করতে প্রবৃত্ত হলেন। ঘরে না বাইরে, নারীর যথার্থ অবস্থিতি কোথায়,—উপন্যাসে এটাই ছিল তাঁর প্রধান আলোচ্য। কিন্তু সমকালীন রাজনৈতিক উগ্রতার প্রতি তাঁর আন্তরিক অনীহা এই উপন্যাসে একটি নতুন উৎস দিয়ে প্রবেশ করে রচনার মৌলিক অভিপ্রায়টিকে টলিয়ে দিয়েছে এবং সন্দীপ ও নিখিলেশ, উভয় চরিত্রের মধ্য দিয়েই রাজনীতি সম্পর্কিত তাঁর বিপরীতমুখী মনোভাব প্রকাশ পেয়ে এটির বৈচিত্র্য বৃদ্ধি করেছে। উপন্যাসে তাই প্রচলিত অর্থে নায়ক-চরিত্র নেই বলাই সঙ্গত, কেননা নায়িকা বিমলাই এর প্রধান কেন্দ্রীয় চালিকাশক্তি, যার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রবর্তনাই উপন্যাসটির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করেছে পূর্বাপর। কিন্তু তার বিপরীত চরিত্র হিসাবে নিখিলেশ ও সন্দীপ উভয়কেই আক্ষরিক অর্থে নায়ক বলে গ্রহণ করা যুক্তির খাতিরে স্বীকার্য। এই উভয় চরিত্রে লেখক তাঁর মানসিকতার দুটি পরস্পর-বিপরীত ধারণা ও আদর্শের প্রতীক গড়েছেন। সন্দীপ স্বভাবতই এ্যানার্কিস্ট, তার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব নীতিজ্ঞানের মর্যাদা লঙ্ঘন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না, তার নিঃসঙ্কোচ বস্তুতন্ত্রতা আদর্শবাদের ক্ষীণ প্রলেপেরও অপেক্ষা রাখে না; আর নিখিলেশ ঠিক তার বিপরীত মেরুর বাসিন্দা, সে শান্ত অচঞ্চলতার সঙ্গে আপন রুচি ও আদর্শের মিশ্রণে জীবনের কল্যাণের রূপটিকেই গড়ে নিতে চায়, সে অকারণে নীতিজ্ঞান লঙ্ঘন করেনা, তার প্রতিটি আচরণেই আদর্শবাদের একটি স্নিগ্ধ আবরণ দেওয়া থাকে।

'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটি রচনারীতিতে খানিকটা অভিনব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী'র মতো এখানেও উপন্যাসের প্রধান চরিত্রত্রয় তাদের জবানিতে এই 'কাহিনী' এগিয়ে নিয়ে গেছে। স্বভাবতই তাই কোন চরিত্র সম্পর্কে তার নিজের মন্তব্য অথবা অন্যের মন্তব্যই তাকে বুঝবার একমাত্র উপায়। সন্দীপ ও নিখিলেশ সম্পর্কে কোনো ধারণা গড়ে তুলতে হলে তাদের নিজেদের বক্তব্য বা অপরের মন্তব্যই এক্ষেত্রে একমাত্র পথপ্রদর্শক, ঘটনার গতিপথ ধরে চরিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এখানে ততোটা সহজ নয়।

বিতর্কিত চরিত্র হলেও, সন্দীপই 'ঘরে বাইরে'র প্রধান পুরুষ চরিত্র। তার প্রচণ্ডতা নিয়ে সে এমনই ধূমকেতুর মতো উপন্যাসের আকাশে তার

অগ্নিময় দ্যুতিবিস্তার করেছে, যাকে কোনো মতেই অগ্রাহ্য বা অস্বীকার করা যায় না। তার বিচিত্র মতপ্রকাশ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, নীতিবিজ্ঞান-বর্জিত বলিষ্ঠ জীবনভোগবাদিতা, ভাষা ব্যবহারের স্বকীয়তা তাকে এই উপন্যাসে একটি আশ্চর্য বিশিষ্টতা দান করেছে; তার স্বার্থপরতা, অর্থলোলুপতা, কামনার স্থূলতীব্রতা—সব কিছু সত্ত্বেও, তার আকর্ষণী শক্তির কাছে পাঠকচিত্তও বিমলার মতো অসংকোচে আত্মসমর্পণে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। প্রথমে তার নিজের ও অপরের মন্তব্য থেকে তার সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করে নেওয়া যাক,—

১। "যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেটাই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটাই যথার্থ আমার, এই হল সহজ জগতের শিক্ষা"। (সন্দীপ)

২। "স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসেই তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এমন দ্রুত বেগে সচল যে আর একজনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করার ফাঁক পাওয়া যায় না"। (বিমলা)

৩। "ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি সন্দীপ হচ্ছে আইডিয়ার যাদুকর। সত্যকে আবিষ্কার করার ওর কোনো প্রয়োজন নেই। সত্যের ভেল্কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ"। (নিখিলেশ)

৪। "ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারেনা। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে, 'সত্যকে পেয়েছি', তার এক সৃষ্টির সঙ্গে আর এক সৃষ্টির যতোই বিরোধ থাক"। (নিখিলেশ)

সন্দীপের নিজের এবং বিমলা ও নিখিলেশের উক্তিগুলির মধ্য দিয়ে সন্দীপ চরিত্রের মর্মসত্যটি ধরা পড়ে। সন্দীপের ও বিমলার উক্তির মধ্যে তার বিশিষ্টতা স্পষ্ট; সে প্রচণ্ড শক্তিমান, তার কর্মযোগ ও ভাবনার মধ্যে এমনই একটা তীব্র বেগ আছে, যা তাকে সমস্ত বিচার-বিতর্কের বাইরে রেখে দিতে অন্যকে বাধ্য করে। রঘুপতি, মহেন্দ্র কিংবা গোরার মতো তার মনের গতিও একমুখী, তার ভাবনা-চিন্তার সোজা পথযাত্রায় সে কোনো বাধাকেই স্বীকার করতে রাজী নয়। এই প্রচণ্ডতা, তীব্রতা ও গতিময়তাই সন্দীপ চরিত্রকে এমন সক্রিয় করে তুলেছে, যা নিখিলেশের শান্ত স্নিগ্ধতার পাশে যেন অধিকতর দীপ্তিমান বলে মনে হয়েছে। তবে একমুখীনতার মধ্যেও লেখক

কিন্তু একটি দ্বিধার সুযোগ এনে দিয়েছেন, যার দ্বন্দ্বে বিক্ষত হয়েই সে ব্যক্তিগত মহিমাও অর্জন করেছে। এই দ্বিধাকে সে 'কিন্তু' নামে অভিহিত করে বলেছে,

"এতদিন পরে সন্দীপের নির্মল জীবনে একটি 'কিন্তু' এসে ঢুকেছে, রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেছি, সে নিতান্ত ফাঁকি নয়। তার দেনা চুকিয়ে না নিলে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্বনাশী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা"।

তাই অর্থের প্রতি লোলুপতা থাকলেও, যাবার মুখে সে বিমলাকে টাকা ও গয়নার বাক্স ফেরৎ দিয়ে গেছে, এই "কিন্তু" হয়ত সন্দীপের সেই চিত্তবৃত্তি, নীতিশাস্ত্রে যার নাম বিবেক, আর সাধারণভাবে যার যোগে রক্তমাংসের শরীরী দেহধারী জীব 'মানুষ' নামের যোগ্যতা পায়। যে প্রচণ্ড এ্যানার্কিষ্ট শক্তির অধিকার থেকে সন্দীপ তার জীবনে নীতি, আদর্শ প্রভৃতির একটি নতুন অভিধান প্রণয়ন করেছিল, 'সর্বনাশী কিন্তু'র প্রভাবে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে শাশ্বত মানবলোকে উত্তীর্ণ হলো। সন্দীপের রাজনৈতিক মতবাদকে অস্বীকার ও ব্যঙ্গ করলেও, তার দেশভক্তির মধ্যে ভণ্ডামির আভাস দেখলেও, বিমলাকে দেশলক্ষ্মী রূপে ঘোষণা করার মধ্যে তার ছদ্মবেশী কামনার ভূমিকাটিকে স্পষ্ট করে দেখালেও, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই চরিত্রটির শক্তিকে অস্বীকার বা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। সন্দীপ চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রচণ্ড শক্তির সেই রূপটাই দেখিয়েছেন কল্যাণের স্পর্শরিক্ত হয়ে যা পূর্ণতা পেতে পারলো না। সন্দীপের মধ্যকার প্রচণ্ড বেগ ভাঙনের কাজেই ব্যয়িত ও ক্ষয়িত হলো, গড়ার কাজে লাগলোনা। সন্দীপের এই অপূর্ণ দিকটির পরিপূর্ণতা আনতেই রবীন্দ্রনাথ নিখিলেশের চরিত্রের শান্ত কল্যাণময় আদর্শটিকে অনির্বাণ প্রদীপের অকম্পিত শিখার মতোই জ্বালিয়ে তুলেছেন। নিখিল সন্দীপের পরিপূরক; সন্দীপে গতি নিখিলেশে স্থিতি, সন্দীপে দাহ নিখিলেশে দীপ্তি, সন্দীপে বেগ নিখিলেশে সংযম, সন্দীপে শক্তি নিখিলেশে শান্তি, বিমলাকে কেন্দ্র করে— 'ঘরেবাইরে'তে যে ঝড় উঠেছিল, এই দুই চরিত্র, তার গতিবেগ বর্ধন ও নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে প্রচণ্ড হলেও শেষ পর্যন্ত সর্বনাশী হতে দেয়নি।

নিখিলেশ চরিত্রটি সন্দীপের বিপরীত এবং রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভাবাদর্শের প্রতিনিধি; তার সম্পর্কেও বিভিন্ন মন্তব্য থেকে একটি চরিত্রলিপি গড়ে তোলা যায়।—

১। "পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সবচেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়তো সেই জোর নেই।" (নিখিলেশ)

২। "আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল, ও রকম পুরুষ মানুষ আর দ্বিতীয় দেখিনি, ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল"। (সন্দীপ)

৩। "আমি বিশ্বাস হারাবোনা, আমি অপেক্ষা করবো" (নিখিলেশ)

বিমলা, সন্দীপ ও নিখিলেশের এই তিনটি উক্তির মধ্য দিয়ে নিখিলেশের চরিত্রটিকে স্পষ্ট ধরা যায়। বিমলা-নিখিলেশের সুখী-সন্তৃপ্ত অবিচ্ছিন্নগতিতে প্রবাহিত দাম্পত্য প্রেমে সন্দীপ কোন বিশেষ শূন্যস্থান দিয়ে অনুপ্রবেশে সমর্থ হয়েছিল, বিমলার মন্তব্যে তার পরিচয় মেলে। আর সন্দীপ নিখিলেশ সম্পর্কে যে মতপ্রকাশ করেছে, তাতে একদিকে যেমন নিখিলেশ চরিত্র স্পষ্ট হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি বিমলাকে অত সহজে সন্দীপের কুক্ষিগত করার একটি নির্দিষ্ট কারণও দেওয়া হয়েছে; কবি ও প্রেমিক-নিখিলেশ তার মহৎ আইডিয়ার প্রবর্তনাতেই জীবনের পথে চলতে চেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সে পথভ্রষ্ট হয়নি। তার নিজের মন্তব্যে এই পথচলার আলোকবর্তিকাটি চিহ্নিত হয়েছে এবং বিশ্বাসের ধ্রুব তারাটিকে মনের আকাশে অক্ষয় জ্যোতির্ময় করে স্থাপন করেই নিখিলেশ নির্ভয়ে জীবনপথের পথিকবৃত্তি গ্রহণ করেছে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে নিখিলেশ চরিত্রমহত্ত্বে মণ্ডিত হলেও, তা আদর্শচরিত্র। 'গোরা'র পরেশবাবুর মতোই সে অনেকটাই সুখে বিগতস্পৃহ ও দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, স্থৈর্যের প্রতিমূর্তি। অথচ সাহিত্যে আদর্শচরিত্রের চেয়ে রক্তমাংসের ভুলভ্রান্তিতে ভরা মানুষই অধিকতর কাম্য। তাই 'ঘরে বাইরে'তে অপেক্ষাকৃত আদর্শহীন সন্দীপই বেশী জীবন্ত, তুলনায় নিখিলেশ আদর্শবাদী হলেও নীরক্ত। তবু এই জীবন্ত ও আদর্শ উভয় চরিত্রকে ঘিরেই রবীন্দ্রনাথের নায়কচিন্তা পরিপূর্ণরূপে দীপিত হয়েছে। সন্দীপে যার অভাব, নিখিলেশে তারই স্বভাব, আবার নিখিলেশে যার ঘাটতি, সন্দীপে তারই পরিপূরণ—উভয়ের দেওয়া-নেওয়া ও পরিপূরণেই রবীন্দ্রনাথের নায়ক-ভাবনার পূর্ণায়ন। তাই, এই উপন্যাসে দুই প্রধান পুরুষচরিত্র নায়ক-প্রতিনায়ক, নায়ক-খলনায়ক, Hero ও Mock-Hero বা নায়ক ও অন্যতম নায়ক নয়;—তারা উভয়ের সমবায়েই একটা গোটা নায়কচিন্তার পূর্ণরূপায়ণ। 'চতুরঙ্গ' থেকে এর স্পষ্ট সূচনা, 'ঘরে বাইরে' থেকে 'শেষের কবিতায়' তার সম্পূর্ণীভবন। অবশ্য 'যোগাযোগ' উপন্যাসে এই যাত্রাপথে কিছুটা ব্যতিক্রান্ত অধ্যায়ের স্বাক্ষর আছে।

॥ ১১ ॥

'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরের' পর 'প্রবাসী 'ও' বিচিত্রা' পত্রিকায় ক্রমশঃ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের পর অল্প সময়ের ব্যবধানে 'যোগাযোগ' ও 'শেষের কবিতা' উপন্যাস দুটি প্রকাশিত হয়। 'ঘরে-বাইরে' থেকে 'যোগাযোগে'র মধ্যে প্রায় পনেরো বছরের ব্যবধান; এই পনেরো বছর রবীন্দ্রনাথ কথা-সাহিত্যে বিশেষ নিরুৎসুক; কেন না শুধু উপন্যাসের ক্ষেত্রেই নয়, ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিক্ষমতা এ পর্যায়ে খুবই কৃপণ। এই বিস্তৃত পর্বে বাংলার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস নানা বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গে উত্তাল ও উদ্‌বেল; বিপ্লববাদের প্রসারের সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হওয়া, চট্টগ্রাম বিদ্রো:হর গোপন প্রস্তুতি, চরকা ও হিন্দুমুসলমান সম্প্রীতি ও বিরোধ, সব মিলে এই পর্বে বাংলাদেশের অবস্থা আন্দোলনমুখর, রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত পলিটিকস্ থেকে দূরে সরে সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োজিত।

'ঘরে বাইরে' থেকে 'যোগাযোগ'—রবীন্দ্র-মানসেরও এক আশ্চর্য উদ্বর্তন। রাজনৈতিক বাক্‌বিতণ্ডা বা মতাদর্শঘটিত বিতর্ক-চঞ্চলতা নেই, পরিবর্তে এই পর্বে তাঁর চিরন্তন কবিস্বভাবের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে সমস্ত মুখে একটি বেদনার সকরুণ ধৈর্যের ভাব নিয়ে রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডের মতোই এক আশ্চর্য নারীচরিত্র কুমুদিনী। নূরনগরের জমিদার চাটুজ্যেবংশের প্রদীপশিখা বিপ্রদাসের শিক্ষায় আলোকিত এই কুমুদিনীর জীবনের এক চরম বেদনার ইতিহাস এই 'যোগাযোগ'। শিল্পের সূক্ষ্ম রুচির সঙ্গে স্থূল ভোগসর্বস্ব কামনার যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব যুগযুগান্তর ধরে বিশ্বসাহিত্যে বেদনার সকরুণ ও ক্ষতবিক্ষত ইতিবৃত্ত রচনা করে এসেছে 'যোগাযোগ'-এ রবীন্দ্রনাথ যেন তারই এক নবরূপ সৃষ্টি করলেন। ব্যবসায়ের দৌলতে হঠাৎ-ধনী, একদা চাটুজ্যেদের প্রজা, ঘোষাল বংশের ধনগর্বিত নবীন-মহারাজা মধুসূদন তার পূর্বপুরুষের অপমানিত দারিদ্র্যের প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন কুমুদিনীকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে বিপ্রদাসকে বাধ্য করে। বয়সের অসমতা, রুচির অসমতা সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত বিপ্রদাস এ বিবাহে সম্মত হয়। কুমু ও মধুসূদনের অসম দাম্পত্যজীবন, তাদের দুটি ভিন্ন প্যাটার্নের জীবনবোধের দ্বন্দ্বেই এই কাহিনীটি সমাকীর্ণ। কুমু-মধুসূদনের এই অসম দাম্পত্যজীবন ও কুমুর বিড়ম্বনা সম্পর্কে মতির মার মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,—

"এক রকমের জাতিভেদ আছে যা সমাজের নয়, যা রক্তের, সে জাত কিছুতেই ভাঙা যায় না। এই যে রক্তগত জাতের

অসামঞ্জস্য এতে মেয়েকে যেমন মর্মান্তিক করে মারে, পুরুষকে এমন নয়।"

এই রক্তগত জাতিভেদের যে অসামঞ্জস্য, তারই মর্মান্তিক শরে বিক্ষত কুমুদিনীর কাহিনীই 'যোগাযোগের' মুখ্য বিষয়। স্বভাবতই নায়ক চরিত্র বলতে যা বোঝায়, তার যথার্থ রূপ এধরনের রচনায় পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় 'যোগাযোগে'র সমস্যা কিছুটা স্বতন্ত্র প্রকৃতির। একেবারে শুরু থেকে 'ঘরে বাইরে' পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাসে যে বিষয় ও সমস্যাগুলি রূপায়িত হয়ে এসেছে, তাতে সামাজিক বিধিনিয়ম বা ধর্মীয় আচার-সংস্কারের পটেই মানবজীবনের দ্বন্দ্ব প্রদর্শিত হয়েছে। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি' বা 'গোরা' বিশিষ্টভাবে সমাজ প্রতিবেশে-প্রতিষ্ঠিত, 'চতুরঙ্গ' থেকে অবশ্য সমস্যার মূল ব্যক্তিমানসের গহন গভীরে সংস্থাপিত হয়েছে। তবুও, সেখানকার সমস্যাগুলিরও একটি বহিরঙ্গ রূপ বা চেহারা আছে। শচীশের সাধনা ও শ্রীবিলাসের সহিষ্ণুতা, বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব বা নিখিলেশ ও সন্দীপের নিজ নিজ জীবনবৃত্তে পরিক্রমা; কিন্তু 'যোগাযোগে' রবীন্দ্রনাথ এক আশ্চর্য সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন যার মূল প্রেরণা হয়ত ভারতবর্ষীয় বিবাহের কেন্দ্রে নিহিত, কিন্তু তার যথার্থ চেহারা আধুনিকতার মধ্যেই প্রতিফলিত। কুমুর সমস্যাই তাঁর লক্ষ্য—একদিকে ক্ষয়িষ্ণু আভিজাত্যের রুচিবিনম্র শিক্ষা-দীক্ষা ও চিরায়ত সতীত্বের একটি আধ্যাত্মিক আদর্শ, অন্যদিকে নবোদ্ভূত বণিক সভ্যতার স্থূল অধিকারলোলুপ বৃত্তিসর্বস্বতার কঠোর বৈপরীত্য; একদিকে চাটুজ্যেবংশের বিপ্রদাস, অন্যদিকে ঘোষাল-বংশের মধুসূদন—এই দুইএর মাঝে দোলায়মানা রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ডটি রবীন্দ্র উপন্যাসে এক অভিনব জিজ্ঞাসা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। সাধারণভাবে কুমু এর নায়িকা এবং বিপরীত চরিত্র মধুসূদন নায়কতার দাবীদার। কিন্তু লেখকের দ্বিধাগ্রস্ত মন বিপ্রদাসের মধ্যেও জীবনাদর্শের সন্ধান পেয়েছে। এখানেও তাই বিপ্রদাসের মধ্যে যা স্বভাব, মধুসূদনে তারই অভাব; আবার মধুসূদনে যার অস্তিত্ব, বিপ্রদাসে তার নাস্তিত্ব। প্রবাসীতে প্রথম-প্রকাশের কালে কবি যে 'তিনপুরুষ' নামকরণ করেছিলেন, তাতে হয়তো এক সুদূর-প্রসারী সামাজিক ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁর কল্পনাকে উজ্জীবিত করে থাকবে। চাটুজ্যেদের ক্ষয়ে-যাওয়া ধন হলেও উদার আভিজাত্য ছিল: আর মধুসূদনের জমে-ওঠা ধন থাকলেও আভিজাত্যের একান্তই অভাব ছিল। অথচ রবীন্দ্রনাথ ভালো করেই জানেন যে দুয়ের যথার্থ সম্মিলনেই মনুষ্যত্বের চরিতার্থতা।

তাই হয়ত তৃতীয়পুরুষ অবিনাশ ঘোষালের মধ্যেই তার সম্পূর্ণতা তিনি কল্পনা করেছিলেন, যেখানে ধনের ধারের উগ্রতা আভিজাত্যের সংযোজনে মহিমময় হয়ে উঠবে, তাই 'যোগাযোগে' রবীন্দ্রনাথের নায়ক-চেতনা বিপ্রদাস ও মধুসূদনের দ্বিধাবিভক্ত সত্তায় রূপ নিয়েছে।

বিপ্রদাস ও মধুসূদন সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন জগতের প্রতিনিধি, উভয়ের বর্ণনাতেও এই স্বাতন্ত্র্য পরিদৃশ্যমান। মোতির মার মুখ দিয়ে বিপ্রদাসের বর্ণনা এইভাবে করা হয়েছে,—

"যেন মহাভারত থেকে ভীষ্ম নেমে এলেন, বীরের মত তেজস্বী মূর্তি, তাপসের মত শান্ত মুখশ্রী, তার সঙ্গে একটি বিষাদের নম্রতা।"

আর মধুসূদনের সম্পর্কে লেখকের উক্তি,—

"মধুসূদন দেখতে কুশ্রী নয়, কিন্তু বড়ো কঠিন। কালো মুখের মধ্যে যেটা প্রথমেই চোখে পড়ে সে হচ্ছে পাখীর চঞ্চুর মতো মস্তবড় খাড়া নাক, ঠোঁটের সামনে পর্যন্ত ঝুলে পড়ে যেন পাহারা দিচ্ছে। প্রশস্ত গড়ানে কপাল ঘন ভ্রূর উপর বাধাপ্রাপ্ত স্রোতের মতো স্ফীত, সেই ভ্রূর ছায়াতলে সঙ্কীর্ণ তির্যক চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। গোঁফ দাড়ি কামানো, ঠোঁট চাপা, চিবুক ভারি। কড়াচুল কাফ্রীদের মতো কোঁকড়া, মাথার তেলো ঘেঁসে ছাঁটা, আঁটসাট শরীর, বেঁটে, মাথায় প্রায় কুমুদিনীর সমান, হাত দুটো লোমশ ও দেহের তুলনায় খাটো। সবসুদ্ধ মনে হয় মানুষটা একেবারে নিরেট। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বদাই কি একটা প্রতিজ্ঞা যেন গুলি পাকিয়ে আছে।… দেখলেই বোঝা যায় বাজে কথা, বাজে বিষয়, বাজে মানুষের প্রতি মন দেবার ওর একটুও অবকাশ নেই।"

স্পষ্টই এই দুই চরিত্রের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর আপন মনের সমর্থন ও বিদ্রূপকে উজাড় করে দিয়েছেন। 'ঘরে বাইরে'তে যেমন নিখিলেশ ও সন্দীপ, উভয় চরিত্রের বর্ণনায় নিখিলেশের প্রতি তাঁর স্পষ্ট পক্ষপাত ধরা পড়ে, এ ক্ষেত্রেও বিপ্রদাসের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কিন্তু 'ঘরেবাইরে'তে যেমন সমর্থন না পেয়েও আপন প্রচণ্ড শক্তিশালিতায় সন্দীপ সহজেই নিখিলেশকে ছাপিয়ে গেছে, এখানেও সেই রকম দ্বিধায়, দ্বন্দ্বে, পৌরুষে, প্রচণ্ডতায়, অভিমানে ও হীনম্মন্যতায়, ঐশ্বর্যের নগ্ন অহঙ্কারে ও আত্মম্ভরিতায় মধুসূদন বিপ্রদাসকে ছাপিয়ে গেছে। সে সত্যিই 'যোগাযোগে'র নায়কপদবাচ্য। কেননা ট্র্যাজেডির একটি সূক্ষ্ম আবরণ চারিদিক থেকে ঘিরে রেখে

তাকে মহান করেছে। তার অসংখ্য দোষ থাকলেও, সহস্র হীনতার মধ্যেও, তার শক্তির প্রচণ্ডতা আমাদের স্তম্ভিত করে। যেমন স্তম্ভিত করে শেক্‌সপীয়রের রাজা ম্যাকবেথ বা মধুসূদনের রাবণ চরিত্র।

মধুসূদন স্বনির্মিত মানুষ, এককালে তাদের অবস্থা ভালো থাকলেও, মধুসূদন অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকেই তার জীবনসংগ্রাম শুরু করে, এবং কর্মদক্ষতা, পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং তীক্ষ্ণ ব্যবসাবুদ্ধির দ্বারা তার নিজ জীবনেই সে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। কুমুদিনীকে বিয়ে করা এক হিসাবে তার ঐশ্বর্য ও গৌরবের প্রচারপত্র-স্বরূপ। অতীত অপমানের প্রতিশোধ স্পৃহায় সে একদিকে যেমন চাটুজ্যেবংশের বিপ্রদাসকে ঋণের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে, অন্যদিকে তেমনি সবদিক দিয়ে বেমানান হয়েও সে কুমুদিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অসহায় বিপ্রদাস এ বিবাহে মত দিয়েছে আর দাদার মন্ত্রশিষ্যা কুমু এ বিবাহের মধ্যেই তার কল্পনার রাজপুত্রকে বরণ করে নেবার দুশ্চর আধ্যাত্মিক শক্তিতে সঞ্জীবিত হতে চেয়েছে। কিন্তু বাস্তবের ক্ষেত্রে কুমু-মধুসূদনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি, তার শিক্ষা, রুচি ও মানসতা বারবার মধুসূদনের রূঢ়তায় প্রতিহত হয়ে শেষ পর্যন্ত তার মনের চারপাশে একটি কঠিন ঔদাসীন্যের আবরণ তুলে দিলে। আর এরই ফলে শুরু হলো মধুসূদনের তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বময় জীবন-পরিক্রমা। একদিকে তার ব্যবসাবুদ্ধি ও সহজাত প্রভুত্বকামিতা, অন্যদিকে হীনম্মন্যতা ও কুমুর প্রতি তার মনে অননুভূতপূর্ব এক স্নিগ্ধ আকর্ষণবোধ, এই দুইয়ের মধ্যস্থলে আন্দোলিত তার চিত্তভূমি 'যোগাযোগ' উপন্যাসে এক তীব্র অন্তর্জ্বালাময় অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই বিশেষ প্রেক্ষিতে দেখলে, মধুসূদনের চরিত্রে ট্র্যাজিক নায়কের লক্ষণও ধরা পড়ে। কেননা, প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এই মানুষটির মধ্যেকার শূন্যতাই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। বাইরে যে মধুসূদন সমগ্র ঘোষাল পরিবারের সর্বময় কর্তা, যার ভয়ে বাড়ীশুদ্ধ সমস্ত মানুষ তটস্থ, একটি মেয়ের কাছে তার প্রভুত্বের পৌনঃপুনিক পরাজয়ে তার চেতনায় যে তীব্র দাহ—তা এক কথায় নিসংশয়ে ট্র্যাজিকধর্মী; আসলে কুমুদিনী ও মধুসূদন শুধু আলাদা ব্যক্তিই নয়, তাদের ব্যক্তিত্ব ও জীবনবোধের প্যাটার্ন সম্পূর্ণ পৃথক। এই অসমচরিত্রদ্বয়ের মিলনের স্বাভাবিক ফলস্বরূপই এই বিসদৃশতার সৃষ্টি হয়েছে। শেক্সপীয়রের 'টেম্পেষ্ট' নাটকের নায়িকা মিরান্দার সঙ্গে জান্তবশক্তির দেহীরূপ ক্যালিবানের মিলন সংঘটিত হলে, কল্পনায় যে অসামঞ্জস্য আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মধুসূদন ও কুমুদিনীর মিলনে যেন তারই

প্রতিফলন ঘটেছে। তাই শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ বা মধুসূদনের রাবণের মতোই, 'যোগাযোগে'র মধুসূদন অপরাধী হয়েও ট্র্যাজিক বেদনায় আমাদের দৃষ্টি ও সহানুভূতি কেড়ে নিতে সক্ষম হয়। মধুসূদন কুমুদিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল আপন প্রভুত্বের বিজ্ঞাপন হিসাবে, কিন্তু 'রজনীগন্ধার পুষ্পদণ্ড' কুমুদিনীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য ও মাধুর্য নিশ্চয়ই তার অন্তরের কোনো অজানা গোপন গভীরে দোলা দিয়েছিল। হয়ত বিবাহের পরেই ব্যবসায়ের প্রভূত লাভ তার বণিক মনোবৃত্তিতে কুমুদিনীর লক্ষ্মী স্বভাবটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছিল; তবু সমস্ত উপন্যাসে তার উগ্র অহমিকা, অপরকে তুচ্ছ করা প্রখর আত্মস্তর ব্যক্তিত্বের মধ্যেও কোথাও কোথাও কুমুদিনীর জন্য একটি স্নিগ্ধ মানসতা তার মনের কোনে সংগোপনে বাসা বেঁধে ছিল, তাই তার আচরণে বৈপরীত্যের এত সমাবেশ। ক্রুদ্ধ গর্জনে কুমুদিনীকে তিরস্কার করেই বিনীত প্রার্থনায় সে বারবার তাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে চেয়েছে, নবীনের ছেলে হাবলুর সঙ্গে অসম স্নেহের প্রতিযোগিতায় অনায়াসে নেমে পড়েছে, আর সাজানো জ্যোতিষীর বানানো কথায় বিশ্বাস জানিয়ে তার ব্যগ্র মন কুমুদিনীমুখী হয়েছে। বলা যেতে পারে মধুসূদনের একক হৃদয়েই প্রেম ও প্রতাপের সুরাসুরের দ্বন্দ্ব অবিরাম ঘটে গেছে, আর সেই সংঘর্ষের সমস্ত যন্ত্রণা ও ক্ষতচিহ্ন নিয়ে মধুসূদন ফুটে উঠেছে ট্র্যাজেডির নায়কের মতোই। এই ট্র্যাজেডি আরও ঘনীভূত হয়েছে কুমুদিনীর প্রত্যাবর্তনে, কেননা যে কুমুদিনীকে মধুসূদন বিবাহসূত্রে গৃহিণী হিসাবে পেয়েছিল, এ কুমুদিনী সে নয়। এর মধ্যেকার শূন্যতা কোন্ পূর্ণতার স্বাদ দেবে! তার বাকী জীবনটা এই শূন্যতার সতীদেহ কাঁধে করেই বিভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতে হবে, আর তাতেই হয়ত তার প্রায়শ্চিত্ত, কিন্তু তার বেদনার অপরিসীমতা তো অসংশয়।

মধুসূদন ছাড়াও এই উপন্যাসে বিপ্রদাস চরিত্রটিকে ঘিরে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা নিজস্ব কক্ষপথে আবর্তিত হয়েছে। 'চোখের বালি'র বিহারীর মধ্য থেকে যে আত্মসমাহিত ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় দানা বাঁধতে চেয়েছিল, বিপ্রদাস যেন তারই পরিপূর্ণরূপ। বিপ্রদাস চাটুজ্যেপরিবারের ক্ষয়িষ্ণু উত্তরাধিকারী, তার ঐশ্বর্য গেছে কিন্তু আভিজাত্য আছে। তার শিক্ষা, রুচি, মানসিকতা সবই এক হারিয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের স্মৃতি বহন করে চলেছে। মোতির মার মুগ্ধ সপ্রশংস চোখে-ধরা "মহাভারতের ভীষ্ম" বিপ্রদাস চরিত্রে এই উপন্যাসে মধুসূদনের একটি বিপরীত ভূমিকা সৃজন করেছে; একদিকে নবার্জিত ঐশ্বর্যের দম্ভ অন্যদিকে ঐতিহ্যাশ্রয়ী আভিজাত্য,

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই দুইয়ের মিলনেই মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা। 'তিনপুরুষ' নামের মধ্যেই এক সঙ্কেত লুকিয়ে ছিল, কেননা তৃতীয় পুরুষে গিয়ে মধুসূদনের ঐশ্বর্য থেকে দম্ভের বাষ্পটুকু উবে যাবে এবং বিপ্রদাসের আভিজাত্যবোধ, রুচি, ও মানসতা কুমুদিনীর মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হবে। তখন দুয়ের মিলনে গড়ে উঠবে রাবীন্দ্রিক কল্পনার বরপুত্র। তাই একা মধুসূদন 'যোগাযোগের' নায়ক নয়, বিপ্রদাসের সহযোগেই এই উপন্যাসের নায়কত্ববোধ সুসম্পূর্ণ হয়েছে। সন্দীপ-নিখিলেশ, শচীশ-শ্রীবিলাসের মতোই বিপ্রদাস-মধুসূদনের যুগল নায়কত্বেই 'যোগাযোগে'র নায়ক-চেতনা সম্পূর্ণবৃত্ত হতে পেরেছে, আর এরই অগ্রস্থিতি ঘটেছে—'শেষের কবিতা'য়, যেখানে অমিত রায়ের সপ্রাণ চঞ্চলতার পাশে শান্ত শোভনলাল তার বিরল আবির্ভাব ও উল্লেখেও অনায়াসেই যুগল-নায়কত্বের সম্মানে ভূষিত হয়েছে। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বা ব্যতিক্রান্ত অধ্যায় নয়, 'গোরা'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তথা বাংলা উপন্যাসের নায়ক-কল্পনা এমনই একটি সমুন্নত শীর্ষভূমি স্পর্শ করেছে, যার পরে আর উপরে ওঠা যায়না। তাই তার পরবর্তী স্তর থেকেই এসেছে এই একাধিক নায়কের কল্পনা, বা খণ্ড ব্যক্তিত্বের চেতনা যা ক্রমশ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস থেকে শরৎচন্দ্রে গিয়ে ক্রমে পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের চরিত্রলক্ষণ হিসাবে পরিগৃহীত হয়েছে। মহাকাব্যিক নায়কের মৃত্যু ঘটেছে এবং সেই বিরাটত্বের খণ্ড খণ্ড চেতনা সাহিত্যময় ছড়িয়ে গেছে। এর ফলেই দেখা দিয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিক শিথিলতা, কেননা লেখকের কল্পনা কোনো একটি কেন্দ্রীয় চরিত্রের কেন্দ্রে গভীরভাবে স্থিত না হয়ে বিকেন্দ্রিত হয়ে ইতস্তত ঘুরে বেড়িয়েছে আর অনিবার্যভাবেই প্লটের সংহতিও বিকেন্দ্রিত হয়ে শিথিল হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় পর্বের উপন্যাস থেকেই সমগ্র বাংলা উপন্যাসের এই চরিত্রলক্ষণ ও পথনির্দেশ স্থিরীকৃত হয়ে গেছে।

॥ ১২ ॥

'শেষের কবিতা' রবীন্দ্রনাথের শেষ তাৎপর্যপূর্ণ উপন্যাস। শুধু তাৎপর্যের দিক দিয়েই নয়, উপন্যাসের আকৃতি-আয়তনের দিক দিয়েও 'শেষের কবিতা'য় রবীন্দ্রনাথ পূর্ণ উপন্যাস রচনা করতে চেয়েছেন শেষবারের মতো, কেননা পরবর্তী তিনটি বই, 'দুই বোন.' 'মালঞ্চ' ও 'চার অধ্যায়' আকৃতি, আয়তন বা ঔপন্যাসিক চারিত্র, সমস্ত দিক দিয়েই বেশ কিছুটা হীনপ্রভ। 'মালঞ্চ' ও 'দুইবোনে' দুই নারীতত্ত্বেরই সটীক ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়াস লক্ষিত হয়, আর 'চার অধ্যায়' বিতর্কিত রাজনৈতিকতার স্বরূপ দর্শনের স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে

রচিত। অবশ্য লেখক যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, তাই সব কটি ক্ষেত্রেই, উদ্দেশ্যের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে একটি রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ঔদার্য ও প্রসন্নতা পরিব্যাপ্ত, সমস্ত দ্বিধা-সংকোচের ঊর্ধ্বচারী মানবমনের এক গহনগভীর চিরন্তন রূপই ধরা পড়েছে।

'শেষের কবিতা'র নানামুখী তাৎপর্যের একটি প্রধান তাৎপর্য এর নায়ক অমিত চরিত্রের বিশিষ্ট রূপায়ণ। আপাতদৃষ্টিতে চরিত্রটি রবীন্দ্রসাহিত্যে অভিনব হলেও, গভীর বিশ্লেষণে একে পারম্পর্যবিহীন বলে বোধ হয় না। লেখক তাঁর বর্ণনায় তার যে রূপ ও চারিত্র প্রদর্শন করেছেন, তাতে শুধু রবীন্দ্রসাহিত্যেই নয়, অমিতর সমকালীন যুবকদের মধ্যেও তার অনন্যতা স্পষ্ট। লেখকের বর্ণনা থেকে বিষয়টি লক্ষ্য করা যাক,—

'অমিতর নেশাই হলো স্টাইল, কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশভূষায়, ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে, পাঁচজনের মধ্যে ও যেকোনো একজন মাত্র নয়। ও হলো একেবারে পঞ্চম। অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ কামানো চাঁচা মাজা চিকন পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তিভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া, চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরী হয়না; মনটা যেন একরকমের চকমকি যে ঠুক করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা প্রায়ই পরেনা। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়, পাঞ্জাবী পরে, তবে বাঁ কাঁধ বোতাম ডানদিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু'ভাগ করা, কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনী ছিটের এক ছোট থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁক ঘড়ি; পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ করা কটকি জুতো; বাইরে যখন যায়, একটা পাটকরা পাড়ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে। বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানী লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা কাজ করা। একে ঠিক সাজ বলে না, এ হচ্ছে ওর একধরনের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝিনে, যারা বোঝে তারা বলে—কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিস্‌টিংগুইশড্' নিজেকে অপরূপ করবার শখও নেই, কিন্তু ফ্যাসনকে বিদ্রূপ করার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত।'

অমিতর এই বর্ণনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সে একটি

অসাধারণ মানুষ। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মাপে তার বিচার বা যাচাই করলে, তা সঠিক হবে না। রবীন্দ্রউপন্যাসে নায়ক চরিত্ররা বঙ্কিমের মতো রাজকীয় বা জমিদারী-অসাধারণত্বের অধিকারী না হলেও, তাদের ঠিক সাধারণ বলা যায় না, কেননা তাদের বিত্তগৌরব ও বুদ্ধিগৌরব দুইই কিছুটা অসাধারণ গোছের। এটা সত্যই যে, বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিবর্তনে নায়কচরিত্র ক্রমশঃ তার ঐশ্বর্য ও আভিজাত্যের উচ্চচূড়া থেকে নেমে সাধারণ সমতল স্তরের দিকে অভিমুখিতা পেয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ বলতে যে বিশেষ শ্রেণীগত ও চরিত্রগত বিশিষ্টতা বোঝায়, রবীন্দ্রউপন্যাসের নায়করা ঠিক সে ধরণের নয়। প্রথমপর্বের ইতিহাস থেকে নেওয়া মানুষের কথা বাদ দিলেও, গোরা, শচীশ, সন্দীপ-নিখিলেশ বা বিপ্রদাস-মধুসূদনকে কোন অর্থেই ঠিক সাধারণ বলা চলে না। এদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য, চরিত্রের দাহ ও দীপ্তি প্রতিবেশী চরিত্রের বর্ণনায় ও তুলনায় চমৎকারভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বতোভাবে সমধর্মা হলেও বিনয়ের তুলনায় গোরার বিশিষ্টতা ও বিশালতা কারো চোখ এড়ায় না। আর শ্রীবিলাসের জবানিতেই তো শচীশের জ্যোতিষ্ক দীপ্তির পরিপূর্ণ ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পেয়েছে। বিমলার চোখে সন্দীপের দীপ্ত প্রাণাবেগ কিংবা নিখিলেশের সমাহিতচিত্ত ও ভাবস্থৈর্য এই অসাধারণত্বেরই ইঙ্গিতবহ; মোতির মার চোখে বা নবীন প্রভৃতির পাশে বিপ্রদাস ও মধুসূদনের অসাধারণত্বও স্বতঃপ্রকাশিত। তাই অনায়াসেই বলা বলে যে 'চোখের বালি'র মহেন্দ্র কিংবা 'নৌকাডুবি'র রমেশ ছাড়া মোটামুটিভাবে সাধারণ চরিত্রলক্ষণাক্রান্ত মানুষ রবীন্দ্র উপন্যাসে অন্য কোথাও নায়কত্বে বৃত হয়নি।

গোরার প্রসঙ্গ আলোচনায় যেমন অনিবার্যভাবেই অমিতর কথা এসে পড়ে, অমিতর প্রসঙ্গেও তেমনি গোরার উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। গোরার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের একটি প্রধান উপাদান ছিল তার ইউরোপীয় উৎসজাত বিশাল চেহারা, যা তার 'রজতগিরি' নামের যথার্থ প্রেরণাস্থল, তার মজবুত হাড়, বাঘের থাবার মতো হাতের মুঠো, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর, গাত্রবর্ণ, দীর্ঘ উন্নত ঋজুদেহ— সব কিছুই তাকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র করে তুলতে সবিশেষ সহযোগিতা করেছে। অমিত কিন্তু এ দিক দিয়ে কোনো অসাধারণত্বের আশীর্বাদধন্য হয়নি। তার চেহারা আর পাঁচটা বাঙালী যুবকের থেকে বিশেষ স্বতন্ত্র নয়। তাই বাধ্য হয়েই তাকে স্বাতন্ত্র্য আনতে হয়েছে পোষাকের অভিনব নির্বাচন-কুশলতায়। তার বর্ণনায় লেখক একটি কথা বারবার জানিয়েছেন যে, তার বয়সে ও তার সমাজে যে রকম বেশভূষা সর্বজনপ্রচলিত, অমিত যেন ইচ্ছে

করেই তাকে উপেক্ষা করে ও ছাপিয়ে যেতে চায়। তার সমস্ত পোশাকচর্চার মধ্যে যে ব্যঙ্গের উচ্চহাসির কথা লেখক উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, অসাধারণত্ব বা ডিস্‌টিংগুইশড্‌ চরিত্রের বীজ নিহিত আছে।

শুধু বেশভূষা বা স্টাইলচর্চাতেই নয়, সব বিষয়েই সে অসাধারণ। শিলং-পাহাড়ে ছুটিতে গিয়ে সে সঙ্গে নেয় সুনীতি চাটুজ্যের ভাষাতত্ত্বের ইংরেজী বই, রবি ঠাকুরের সর্ববাদিসম্মত মহাকবিত্বের প্রতিবাদে পকেট থেকে নিবারণ চক্রবর্তীর কবিতা বার করে সে জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক নবীন আগন্তুক রূপে নিজকে পরিচিত করতে ব্যস্ত হয়। তার স্বসমাজীয় ও স্বগোত্রীয় মানুষের সঙ্গে রুচিতে, বুদ্ধিতে, পছন্দে ও ব্যবহারে তার নিত্য বিবোধ ঘনিয়ে ওঠে। তার অসংখ্য উজ্জ্বল বাক্যবন্ধেও প্রচলিত সাধারণ মানসিকতার বদলে থাকে এক আশ্চর্য অসাধারণতা, যাকে লেখক চকমকি পাথরের সঙ্গে উপমিত করেছেন। 'শেষের কবিতা'র যে কোনো পাতায় অমিতর যে কোনো একটি কথার ওপর নজর দিলেই এ সত্য আবিষ্কার করা সহজ হবে।

এ হেন অমিত রায়ের জীবনে শিলংপাহাড়ের আকস্মিক মোটর দুর্ঘটনাসূত্রে লাবণ্যের সঙ্গে পরিচয় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো। শুধু অমিতরই বা কেন, লাবণ্যের জীবনেও এই পরিচয় এমনই একটি গভীর অর্থের সূচনা করলো, যা উপন্যাসকে গতিময় ও উভয়ের জীবনকে ছন্দময় করে তুললো। উভয়ের জীবনেই প্রেম সম্পর্কে দুটি ভিন্নমুখী ধারণা এতকাল কার্যকর ছিল। "লাবণ্যের ছিল শোভনলালের প্রতি উপেক্ষা, আর এই উপেক্ষার কারণ প্রেমের সহিত অপরিচয়। অমিতর ছিল কেটির প্রতি বিতৃষ্ণা, আর এই বিতৃষ্ণার কারণ প্রেমের ছলনার সহিত অতি পরিচয়।"[২১] এই অসাধারণ মানস পরিস্থিতিতে অমিত ও লাবণ্যের প্রেম, তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিময় গূঢ়চারী কল্পনা-সমৃদ্ধ গতিচাঞ্চল্য নিয়ে এক নতুন তাৎপর্য ও মাত্রার সংযোজন করেছে। ফলে দুটি চরিত্রই দীর্ঘদিনের অজ্ঞাত অনাস্বাদিত প্রেমের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে জীবনের গতিপথে এক নতুন পাথেয়ের সন্ধান পেয়ে ধন্য মেনেছে। অমিতর কাব্যময় ভাবনাবিলাস, প্রেমের অভিনব তত্ত্বমাহাত্ম্য বর্ণনা, লাবণ্যকে ঘিরে অপরিমিত উচ্ছ্বাসের অবারিত আত্মপ্রকাশ অমিত চরিত্রের ব্যঙ্গধর্মী কৌতুকপ্রবণ কথাবিলাসী চেতনায় এক আশ্চর্য মাধুর্য ও মানসপরিণতির সূচনা করেছে। লাবণ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার সান্নিধ্য ও প্রেমের স্পর্শে অমিত যেন নিজেকে একটু একটু করে গড়ে তুলেছে। প্রেমের এই স্পর্শমণির প্রভাবে মানবজীবনের বিকাশ ও পারসোন্যালিটীর পূর্ণায়ন রবীন্দ্রচিন্তার একটি চিরন্তন ভাবকেন্দ্র।

গোরাতেও আমরা এরই আভাস ও পরিচয় পেয়েছি। প্রচণ্ড শক্তিধর গোরা যখন বিশুদ্ধ যুক্তি ও তর্কের গোলাকধাঁধায় ঘুরছিল, তখন সুচরিতার স্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব ও প্রেমের মাধুরী তাকে গোটা মানুষের রূপ দিয়েছে। তাই রচনার শেষাংশে পরেশবাবুর পায়ে যে গোরা প্রণাম জানিয়েছে, তাতে তার পাশে হাত ধরে ছিল সুচরিতা। অমিতর ক্ষেত্রেও তার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বিশুদ্ধ বুদ্ধিচর্চার মধ্য দিয়ে যখন একটি ব্যঙ্গধর্মী সিনিসিজমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন লাবণ্যের সান্নিধ্য তার চৈতন্যকে প্রেমের স্নিগ্ধতায় অভিষিক্ত করে তাকে সুস্থির ও কেন্দ্রসংহত করে তুলেছিল।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের মূলে বোধহয় এই তত্ত্বই সর্বাধিক কার্যকর হয়েছিল, যা তাঁর অনেক নাটকেরও মুখ্যবস্তু। নারীর মধ্যদিয়ে বিচিত্র রসময় প্রাণের প্রবর্তনা যদি পুরুষের কর্মশক্তিতে সহায়তা করে, তবেই পুরুষের শক্তির চরিতার্থতা ও পৌরুষের সিদ্ধি। অমিতর মধ্যেও এই একই সত্য। লাবণ্যের সংস্পর্শ সৃষ্টিছাড়া অমিতর মনকে সৃষ্টিমুখী করেছে। তার অহেতুক ব্যঙ্গবিলাস থেকে তাকে মুক্তি দিয়েছে আর কেটিকে পুনরায় কেতকী থেকে কেয়ায় পরিণত করে অমিত সেই নবার্জিত শক্তিরই প্রমাণপত্র দাখিল করেছে। একেবারে সূচনাপর্বে লেখক অমিত-চরিত রচনায় বলেছিলেন,—

> "কোনমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক, তাদের দর্শন মেলে পথেঘাটে, অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবী, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে—সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে। হাতে কিছুই রাখেনা।"

এই 'বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী' 'নির্জলা যৌবন' লাবণ্যের স্নিগ্ধ মাধুর্যে স্থিত হতে পেরেছিল। রবিঠাকুরের প্রতিস্পর্ধী নিবারণ চক্রবর্তী রবীন্দ্র-সমুদ্রেই নুনের পুতুলের মতো নিমজ্জিত ও বিগলিত হয়ে চরিতার্থতা পেল। তার শেষের কবিতায় তাই সে লিখেছে—

"লভিয়াছি চিরস্পর্শখানি।
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়াছ আপনি।
জীবন আঁধার হল সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউল দীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।"

এই পরম উপলব্ধিতেই অমিত সার্থক, তার অ-সাধারণ ব্যক্তিত্ব অসাধারণ

মহত্ত্বে সমুত্তীর্ণ, যৌবনের নির্জলা যৌবনত্ব প্রেমের ছোঁয়ায় জীবনানুগ, জীবনাশ্রিত ও জীবননিষ্ঠ।

আগেই বলা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে দুই নায়কের একটি অভিনব ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। শচীশের সঙ্গে শ্রীবিলাসের মতো অমিতর সঙ্গে শোভনলালকেও 'শেষের কবিতা'য় এই রীতির ধারাবাহিকতা বলা যেতে পারে। অবশ্য 'চতুরঙ্গে' শ্রীবিলাস অনেকটা জায়গা জুড়ে প্রত্যক্ষভাবে অবস্থান করেছে, তুলনায় এখানে শোভনলাল কাহিনীর মধ্যে প্রায় অনুপস্থিত। উল্লেখে ও পূর্বস্মৃতিকথনে তার অস্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে ও অল্পঅংশে তার প্রত্যক্ষ উপস্থিতির ইঙ্গিত আছে। কিন্তু লাবণ্যের শেষের কবিতায় তার যে স্বভাব ও স্বরূপ আভাসিত হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনায়ক-চিন্তারই প্রক্ষেপ ঘটেছে বলা চলে। শোভনলালের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও স্বভাব যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে লাবণ্যের এই কথাগুলিতে,—

"উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্ল পক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালে কৃষ্ণপক্ষ রাতে
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।"

'অসীম ক্ষমায়' 'ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি' দেখবার দুর্লভ ক্ষমতা নিয়ে প্রতীক্ষমাণ শোভনলাল 'শেষের কবিতায়' আর একটি তাৎপর্যময় নায়কত্ব নিয়ে অবস্থান করেছে। অমিত ও শোভনলাল এই দুই নায়কই তাদের জীবন-দীপে লাবণ্যের অনির্বাণ দীপ্তি থেকে আলো জ্বেলে জীবনপথের পথিক হয়েছে।

॥ ১৩ ॥

রবীন্দ্রনাথের শেষ তিনটি উপন্যাস তাঁর নায়ক চরিত্রের ক্রমবিবর্তন ও বিকাশের আলোচনায় ততখানি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কেননা, 'দুইবোন' বা 'মালঞ্চ' দুটি উপন্যাসেরই বক্তব্য মূলত নারী-চরিত্র-কেন্দ্রিক। সংসারে 'প্রিয়াজাতীয়' ও 'মাতৃজাতীয়', এই দুই নারীর প্রবর্তনা জীবনে কি রকম,

তারই ফলশ্রুতি এই রচনা দুটি। দুই নারীতত্ত্ব রবীন্দ্রভাবনার একটি দীর্ঘকাল-লালিত চিন্তা ও পূর্ববর্তী অনেক রচনাতেই তার প্রক্ষেপ ঘটেছে। লক্ষ্মী ও উর্বশী, পুরাণের এই দুই প্রতীকে কবি একে 'বলাকা'র কাব্যবিষয় করেছিলেন। আদিত্য কিংবা শশাঙ্কর জীবনে নীরজা-সরলা বা শর্মিলা-ঊর্মিমালার প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় সমস্ত চিত্রই এই তত্ত্বভাবনার আলোকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তাই যে ধারাপথে গোরা, শচীশ বা অমিত চরিত্র এগিয়েছে, যে পথে মহেন্দ্র, রমেশ প্রভৃতিরা পদচারণা করেছে, তাতে আদিত্য ও শশাঙ্ক নতুন কিছু যোজনা করতে সক্ষম হয়নি।

'চার অধ্যায়ে'র অতীন্দ্র সম্পর্কে অবশ্য একথা পুরোপুরি বলা চলে না। উপন্যাস হিসাবে 'চার অধ্যায়' কতটুকু চরিতার্থ, রবীন্দ্রনাথের পরিণত শিল্পবোধ এতে কতখানি সিদ্ধিলাভ করেছে, তা সমালোচকদের বিতর্কিত মতানৈক্যের মধ্যে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে রয়েছে। 'রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাস সাহিত্যে 'চার অধ্যায়' দুর্বলতম সংযোজন।'[২২] কিন্তু আমাদের কাছে উপন্যাসটির একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য রয়েছে, যা রবীন্দ্রনাথের নায়কভাবনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। প্রথম পর্যায়ের দুটি উপন্যাসে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষিতে' প্রতাপাদিত্য ও গোবিন্দমাণিক্য চরিত্র দুটিতে রবীন্দ্রভাবনার পূর্ণমনুষ্যত্ব বা পারসোন্যালিটীর বিকৃত ও প্রকৃত রূপ প্রদর্শিত হয়েছিল। রাজা হিসাবেই অবশ্য এখানে মনুষ্যত্বের আদর্শ খোঁজা হয়েছিল। কেননা, ইতিহাসের পটে ছিল কাহিনী দুটির সংস্থাপনা। অতীন্দ্রের ক্ষেত্রেও মনুষ্যত্ব তথা পারসোন্যালিটীর অসম্পূর্ণতা বা বিকৃতির প্রকাশ চমৎকারভাবে ফুটেছে। সর্বতোভাবে গুণসম্পন্ন যুবক অতীন্দ্র সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে আপন চরিত্র ক্ষেত্রটি থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে। এলার ভালোবাসা একদিকে যেমন তাকে তার আপন অন্ধকার অতলতার বিবরমুক্ত করতে চেয়েছে, অন্যদিকে বিপ্লববাদের শপথ ও শৃঙ্খলা তেমনি তাকে টেনে রেখেছে তার অকৃতার্থ জীবনের খুঁটিতে। যৌবনের প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, রুচি ও সংস্কৃতির প্রাণরসে পরিপূর্ণ পুষ্টি নিয়েও গ্রন্থের শেষে তার শোচনীয় অবক্ষয় ও অপমৃত্যু দেখে আমাদের মনে যে বেদনা জাগে, তা এই বিকৃত মনুষ্যত্বের ব্যর্থতার বেদনা। গোরা কিংবা অমিতর মতোই অতীন্দ্রও ছিল প্রচণ্ড শক্তিধর। গোরা ও অমিতর সুচরিতা ও লাবণ্যের মতো তার জীবনেও প্রাণরসের পাত্র নিয়ে এসেছিল এলা। কিন্তু যে সামাজিক পরিবেশ গোরা বা অমিতকে দিগ্‌ভ্রষ্ট হওয়া থেকে আটকেছিল, অতীন্দ্রের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। তাই

পরিপূর্ণ সম্ভাবনা নিয়েও সে সমকালীন রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে পড়ে জীবনের সমুদ্রে তলিয়ে গেল, তাকে উত্তরণ করতে পারলো না। একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অতীন সন্দীপ নয়। সন্দীপের প্রচণ্ড শক্তি ও বাগ্মিতা প্রভৃতি অসাধারণত্ব স্বীকার করলেও তার চরিত্রের লুব্ধ মনোবৃত্তি তাকে সমুন্নতি দিতে পারেনি। কাহিনীর শেষে বিমলার গয়না ফিরিয়ে দেওয়া তার বিবেকের উদ্বোধন কি না তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। কিন্তু অতীন সম্পর্কে একটা কথা সর্বত্রই স্পষ্ট যে, সে তার হীনতা, অধঃপতনের চিন্তায় সম্পূর্ণ সচেতন। সন্দীপের হীনতা তার উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতায় সর্বদা আবৃত, আর অতীনের বেদনা তার প্রতিটি বাক্যেই ব্যক্ত। রবীন্দ্র-উপন্যাসে অতীন্দ্র তাই শেষ তাৎপর্যময় নায়ক, যার অচরিতার্থতা ও বিকৃতি, বিবেকের অনিঃশেষ ও অনবচ্ছিন্ন দংশন তার অবক্ষয় ও অপমৃত্যু সত্ত্বেও তাকে আমাদের চোখে উজ্জ্বলতা দান করেছে।

॥ ১৪ ॥

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির যথাসম্ভব বিস্তৃত আলোচনা অন্তে আমরা রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়ক চরিত্র, পরিকল্পনার মৌলিকতা ও তাদের ক্রমবিকাশের রূপরেখাটির একটি মোটামুটি পরিচয় লাভ করতে এতক্ষণ সচেষ্ট ছিলাম। সূত্রাকারে এই আলোচনাকে বিন্যস্ত করলে আমরা দেখতে পাই :

১। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো রবীন্দ্রনাথও তাঁর উপন্যাসের মধ্যস্থতায় মনুষ্যত্ব সম্পর্কে আপন চিন্তাগত একটি আদর্শকেই উপলব্ধি ও প্রকাশ করতে চেয়েছেন, এটিকে ব্যক্তির মুক্তপ্রাণের অক্ষুণ্ণ শাস্তি অর্জন বা পারসোন্যালিটী অঙ্গীকার বলে প্রকাশ করা চলে।

২। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসাবলীকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করে প্রতিটি শ্রেণীর মধ্য দিয়ে এই অনুসন্ধানের ক্রমবিকাশের পথটি যতদূর সম্ভব স্পষ্ট ও উপলব্ধিগম্য করার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩। প্রথম পর্বে ইতিহাসের পটে গোবিন্দমাণিক্য ও প্রতাপাদিত্যের মধ্যস্থতায় তাঁর আদর্শের প্রকৃত ও বিকৃত রূপটিকে চিহ্নিত ও চিত্রিত করে পার্সোন্যালিটীর অঙ্গীকারের প্রথম ধাপটি অতিক্রম করা হয়েছে।

৪। দ্বিতীয় পর্বে মহেন্দ্রের মধ্যে সাধারণ মানুষের নায়কত্ব স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যৎ উপন্যাসের নায়কচিন্তার পথটি উন্মুক্ত করা হলেও নলিনাক্ষের অনতিস্পষ্ট চরিত্রায়ণে এবং গোরার উজ্জ্বল, উদার, বিপুল, বিশাল ও প্রসারিত

ব্যক্তিত্ব ও উপলব্ধিতে পারসোন্যালিটী অঙ্গীকারের সর্বোচ্চ স্তরটি রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন।

৫। 'চতুরঙ্গ' থেকে তৃতীয় পর্বের উপন্যাসে নায়ক—চেতনার দ্বিধা আধুনিক নায়ক-চেতনার পথটিকে ভাবনায় ও উপন্যাসের রূপায়ণে যথার্থই বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশের স্পষ্ট পথরেখাটি আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে। শচীশ-শ্রীবিলাস, সন্দীপ-নিখিলেশ, অমিত-শোভনলাল এরই প্রমাণস্থল।

৬। একেবারে শেষ পর্যায়ের ক্ষুদ্রতর ও শিল্পমূল্যে দীন উপন্যাসত্রয়ীর মধ্যে 'চার অধ্যায়ে' অসম্পূর্ণতা সত্বেও রবীন্দ্রনাথের পারসোন্যালিটি চেতনা বিকৃতির ব্যর্থতার তির্যক ইঙ্গিতধর্মিতায় আপন বক্তব্যেই নিবিষ্ট থেকেছে।

উৎস নির্দেশ

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।

২। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (৩য়)।

৩। ঐ — ঐ

৪। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।

৫। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (৩য়)।

৬। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।

৭। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ।

৮। রবীন্দ্রনাথ—সূচনা, চোখের বালি (পশ্চিমবঙ্গ সরকার)।

৯। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (৩য়)।

১০। বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ : কথা সাহিত্য' গ্রন্থে উদ্ধৃত।

১১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।

১২। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (৩য়)।

১৩। "Personality is neither individuality nor character, it is the soul in the process of culture, the little man responding to the challenge of the Supreme Power." (Tagore : A Study—D. P. Mukherjee)

১৪। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—রবীন্দ্রনাথ।

১৫। ঐ — ঐ

১৬। প্রমথনাথ বিশী—বাংলা সাহিত্যের নরনারী।

১৭। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ

১৮। ঐ — ঐ

১৯। প্রমথনাথ বিশী—বাংলা সাহিত্যের নরনারী।

২০। ঐ — ঐ

২১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।

২২। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়—কথাকোবিদ রবীন্দ্রনাথ।

শরৎচন্দ্র

॥ ১ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা উপন্যাস-জগতে শরৎচন্দ্রই সেই লেখক, যাঁর হাতে উপন্যাস তার যথার্থ পথনির্দেশ খুঁজে পেয়েছে। অবশ্য ইতিহাসের দিক দিয়ে দেখলে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যবর্তীরূপে গ্রহণ করা চলে। কিন্তু বাংলা ছোটগল্পে প্রতিভার মৌলিক স্বাক্ষর মুদ্রিত করলেও তাঁর উপন্যাসে সেই মৌলিকতা কোথাও স্বাক্ষর রাখেনি। তাঁর রচনায় উনিশ শতকীয় সামাজিক পারিবারিক জীবনালেখ্য গড়ে তোলবার প্রয়াস দেখা গেলেও, তাতে ইতিহাসের ক্রমবিকাশের রূপটি স্পষ্ট নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বা তাঁর অনুসারীরা উপন্যাসের যে জগৎ গড়ে তুলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে তার স্বাভাবিক বিকাশের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং বহিরঙ্গ বাস্তবতা থেকে উপন্যাসকে নিয়ে গিয়েছিলেন অন্তরঙ্গ-বাস্তবতার জগতে। প্রভাতকুমারের রচনায় এই স্বাভাবিক বিকাশের কোন উল্লেখযোগ্য দিকচিহ্ন ছিল না। তিনি ছোটগল্পে যে সহজ জীবনের অন্তরঙ্গ কথা বলতে চেয়েছিলেন, উপন্যাসে তাকেই বৃহদাকারে পরিবেশন করেছেন। অথচ, ছোটগল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। উপন্যাসগুলি শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তালিকারূপেই গণ্য হয়। এর স্বাভাবিক কারণ এই যে, ছোটগল্প ও উপন্যাসের প্রকৃতিগত তফাৎটা প্রভাতকুমারের ঠিক বোধগম্য ছিল না। তিনি ছোটগল্প ও উপন্যাস উভয়কেই সমপর্যায়ভুক্ত করেছিলেন। তাই, যা ছোটগল্পে সার্থক, উপন্যাস তারই জন্য অসার্থক হয়েছে।

এরই ফলে বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ধারাপথে রবীন্দ্রনাথের পর শরৎচন্দ্রই অবিসংবাদিতভাবে গৃহীত হয়ে যান। সাহিত্যে তাঁর প্রথম আত্মপ্রকাশে এই আবির্ভাব স্পষ্টত অনুভূত না হলেও, তাঁর রচনাবলীর পর্যায়ক্রমিক প্রকাশের পরই এ সত্য পাঠক ও সমালোচককুলে গ্রাহ্য হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র,—বাংলা উপন্যাসের একটি স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথ পরিক্রমার চিহ্ন স্পষ্টভাবে সকলের কাছে ধরা পড়ে। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকরীতি,—উপন্যাসের এই দুটি বিশিষ্ট পটেই এই বিবর্তনরেখা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিষয়বিন্যাসে, বিষয়ভাবনায় ও চরিত্রচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশিষ্ট ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন,

তা ছিল বিশেষরূপেই সমাজনীতিনির্ভর দৃষ্টিকোণের ফসল। একটি পরিপূর্ণ নিটোল নৈয়ায়িক শৃঙ্খলামণ্ডিত কাহিনীবৃত্ত গড়ে তোলাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অম্বিষ্ট। তাঁর চরিত্ররাও তাই এর একটা আদর্শের প্রতীকিত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে ও স্বয়ং লেখক সমাজবিন্যাসের সনাতন ধারার মূল্যবোধগুলিকে সযত্নে অক্ষুন্ন রেখে তাঁর চরিত্রাবলীর জীবনবৃত্ত রচনা করতে চেয়েছেন। রাজা-মহারাজা, সম্রাট-বাদশাহ বা ধনী জমিদার বংশের মানুষই তাই বঙ্কিমের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে, যাদের ওপর সংসারযাত্রা, সমাজনীতি ও সমাজস্থিতি নির্ভর করে বলে তিনি মনে করতেন। আর এই নীতিনিয়ন্ত্রিত, মহাকাব্যিক জীবনবিন্যাসের দরুণই তাঁর রচনায় আঙ্গিকের দৃঢ়বদ্ধ রূপটিও পরিপূর্ণ শিল্পসুষমা নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের অদ্বৈত সামঞ্জস্যই বঙ্কিমী উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আপন স্বভাবের মৌলিকতায় বঙ্কিমচন্দ্রের পথ থেকে স্বতই সরে এসেছিলেন। তিনি যে জীবনের ছবি আঁকলেন তাতেও অভিজাতদের ভীড় দেখা গেল বটে, কিন্তু জীবননিরীক্ষায় তাঁর পদ্ধতি হলো সম্পূর্ণ অভিনব ও পৃথক। তিনি কোন প্রথানিবিষ্ট বা সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক নীতিনির্ভর দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখতে চাইলেন না। বরং তাঁর কাছে ব্যক্তিগত মানুষের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যই অধিকতর সত্য বলে স্বীকৃত হলো। 'চোখের বালি'র প্রসঙ্গে তিনি যে 'আঁতের কথা' উদ্ঘাটনের কথা বললেন, তাতেই রবীন্দ্রনাথের এই নবনিরীক্ষার মনোভাবটি সুস্পষ্ট হয়েছে। চরিত্রগুলির সামাজিক পরিচয়টাই তার প্রধান পরিচয় নয়। ব্যক্তিপরিচয়ের মধ্যেই তাদের স্বকীয় সত্তার পূর্ণ পরিচয়—এটিই রাবীন্দ্রিক জীবনসমীক্ষার মর্মকথা। এরই স্বাভাবিক ফলস্বরূপ রবীন্দ্র-উপন্যাস কাহিনীমুখ্য না হয়ে, হয়ে উঠলো চরিত্রমুখ্য। আর তারই ফলে আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এলো লক্ষণীয় পরিবর্তন। বৃত্তনির্ভর রচনার মধ্যে যে নৈয়ায়িক চরিত্র-শৃঙ্খলার দৃঢ় বন্ধন, তা এক্ষেত্রে অনুপস্থিত হলো এবং পরিবর্তে দেখা দিল বিশ্লেষণধর্মিতা। যাকে শিথিল আঙ্গিকের রচনা বলে বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের রচনাতেই তার সূত্রপাত। তাছাড়া কিছু রচনায়, 'গোরা' ও 'ঘরে বাইরে'তে, ব্যক্তিসমস্যার সূত্রে সমাজের যে বিস্তৃত বিচার ও জিজ্ঞাসার মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, তাও বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে এক নতুন সংযোজন।

রবীন্দ্রসাহিত্যের এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়েই বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। 'চোখের বালি' উপন্যাসকে আপন উপন্যাসরচনার

আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে শরৎচন্দ্র কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথকে আপন গুরুরূপে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই স্বীকৃতির মধ্যেই তাঁর মৌলিকতা ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে ধরা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীয় মানুষের জীবন নয়, রবীন্দ্রনাথের পথে সাধারণ মানুষের আরো কাছাকাছি তাঁর কল্পনাদৃষ্টি নেমে এসেছে। সামাজিক, পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চেনামহলেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক পদচারণা সীমাবদ্ধ থেকেছে। এই চেনাবৃত্তেই তাঁর পুরাতনের অনুবর্তন ও নতুনের উদ্বোধন, উভয় মনোবৃত্তিই ক্রিয়াশীল রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সামাজিক নীতিনিয়মশাসিত জীবনকে একদিকে যেমন তিনি অনেকক্ষেত্রেই মেনে নিয়েছেন, তবু নতুনত্ব ও পুরাতনত্ব, এই দুইয়ের ভাব-সম্মিলনে গঠিত শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে অননুভূত-পূর্ব মৌলিকতা ও আধুনিক জীবনদৃষ্টি দেখা যায়, তারই ফলে তিনি সার্থকভাবে রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের উত্তরসাধক হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে সমর্থ হয়েছেন। বাংলা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্র তাঁর অননুভূতপূর্ব মৌলিকতার জোরেই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। "নিষিদ্ধ সমাজ-বিগর্হিত প্রেমের বিশ্লেষণে, আমাদের সামাজিক রীতিনীতি ও চিরাগত সংস্কারগুলির তীব্র, তীক্ষ্ম সমালোচনা, স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সম্পর্কের নির্ভীক পুনর্বিচারে, তিনি যে সাহসিকতার, যে অকুণ্ঠিত সহানুভূতি ও উদার মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তিনি বাঙালীর মনের সংকীর্ণ গণ্ডী বহুদূর ছাড়াইয়া অতি আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সহিত আত্মীয়তা স্থাপন করিয়াছেন।"[১]

॥ ২ ॥

শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর কালানুক্রমিক তালিকাটি নিম্নরূপ :—

মন্দির—১৩০৯	বড়দিদি—১৩১৪
কাশীনাথ—১৩১৯	বিরাজ বৌ—১৩২০
অনুপমার প্রেম—১৩২০	আলো ও ছায়া—ঐ
পথ নির্দেশ—ঐ	পণ্ডিতমশাই—১৩২১
মেজদিদি—১৩২১	দর্পচূর্ণ—ঐ
আঁধারে আলো—ঐ	পল্লীসমাজ—১৩২২
শ্রীকান্ত (১ম)—১৩২২	বৈকুণ্ঠের উইল—১৩২৩
দেবদাস—১৩২৩	অরক্ষণীয়া—ঐ

নিষ্কৃতি—ঐ	স্বামী—১৩২৪
দত্তা—১৩২৪	শ্রীকান্ত (২য়)—ঐ
গৃহদাহ—ঐ	বিলাসী- } ১৩২৫
	মামলার ফল— } ১৩২৫
ছবি—১৩২৬	দেনা পাওনা—১৩২৭
বামুনের মেয়ে—১৩২৭	শ্রীকান্ত (৩য়) ঐ
পথের দাবী—১৩২৯	মহেশ—১৩২৯
অভাগীর স্বর্গ—ঐ	নববিধান—১৩৩০
হরিলক্ষ্মী— } ১৩৩২	শেষ প্রশ্ন—১৩৩৪
পরেশ— } ১৩৩২	
শ্রীকান্ত (৪র্থ)—১৩৩৮	শুভদা—১৩৪৫
শেষের পরিচয়—১৩৪৬	

১৩০৯ থেকে ১৩৪৬, এই দীর্ঘ ৩৭ বৎসর কালসীমাকে শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য সাধনার যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। অবশ্য শুধুমাত্র ছোটগল্প, বড়গল্প বা উপন্যাসই নয়, এই কালসীমার মধ্যে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ, বাল্যস্মৃতিকথা বা নিজকাহিনীর নাট্যরূপও রচনা করেছিলেন। এই সুদীর্ঘ কালসীমায় রবীন্দ্রনাথেরও অনেকগুলি উপন্যাস রচিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্রের রচনাবলীর কালানুক্রমিক পরিচয় থেকে জানা যায় যে, যদিও ১৩০৯ সনে 'মন্দির' গল্প রচনায় তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত, তবুও বলা যায় যে, ১৩২২ সনেই তাঁর স্বকীয় প্রভিতার স্বাতন্ত্র্য সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বছরেই তিনি রচনা করেন শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব ও পল্লীসমাজ, তাঁর অপর চারিত্র্যলক্ষণযুক্ত রচনা 'চরিত্রহীন' ১৩২০-তে আংশিকভাবে প্রকাশিত হলেও, গ্রন্থাকারে তা প্রকাশিত হয় ১৩২৪ সনে। এই রচনাটি ছাড়া ১৩২২-এর পূর্বে রচিত গল্প ও উপন্যাসগুলিতে শরৎচন্দ্রের মৌলিকতা অল্প-স্বল্প প্রকাশ পেলেও শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে ও পল্লীসমাজেই রবীন্দ্র-পরবর্তী দিক্‌নির্দেশক কথাসাহিত্যিক হিসাবে বাঙালী পাঠক-সমাজ তাঁকে নিঃসংশয়ে চিনে নিতে সক্ষম হন। তাঁর সমাজদৃষ্টি, নারী সম্পর্কে স্বতন্ত্র মূল্যবোধ, প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, উপন্যাসের প্রকরণগত বিশিষ্টতা,—সব কিছুই এই সময় থেকেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাই শরৎ-সাহিত্যের যাত্রারম্ভ এই পর্ব থেকেই ধরা বিধেয়। শরৎচন্দ্রীয়

উপন্যাসের নায়কের বিশিষ্টতা নির্ধারণের জন্য এই পর্ব থেকেই রচিত উপন্যাসগুলির পরিচয় গ্রহণ আবশ্যক।

অনেকগুলি গল্প-উপন্যাস রচনা করলেও, শরৎচন্দ্রের সব কটি রচনাই কিন্তু সমান উৎকর্ষ লাভ করেনি। চরিত্র-পরিকল্পনা কিংবা গল্পগ্রন্থনের দিক দিয়ে তাঁর অনেকগুলি রচনাই কিছুটা পরস্পর-সদৃশ। সামাজিক প্রতিবেশ রচনা, গ্রামজীবনের অন্ধ সংস্কার ও বিশ্বাস, দলাদলি, পরশ্রীকাতরতা, নারীর মহীয়সী মূর্তির চেতনা, তাদের সক্রিয়তা, পুরুষের নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্য ও সংসার-অনভিজ্ঞ স্বভাব,—তাঁর প্রায় সবগুলি রচনাতেই অল্পবিস্তর পরিলক্ষিত হয়েছে। তাই শরৎসাহিত্যে শাশ্বত নারীপুরুষের আদর্শই বারেবারে পরিকল্পিত ও রূপায়িত হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রের পুরুষপ্রকৃতি তত্ত্বের মতোই শরৎসাহিত্যে নারীপুরুষের পরস্পর সম্পর্কের চিত্রগুলি চিত্রিত হয়েছে। তাঁর সাহিত্যে নারীচরিত্রের আপেক্ষিক সক্রিয়তা ও প্রাধান্য এই বিশেষ কারণেই চোখে পড়ে। কেননা, তাঁর পুরুষেরা প্রায়শই নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন। দৈনন্দিন সাংসারিকতায় আবদ্ধ হলেও শরৎচন্দ্রের পুরুষ চরিত্রের অধিকাংশই সংসারের বিচারে খাপছাড়া। তারা মনোবৃত্তিতে ভবঘুরে—বাউণ্ডুলের গোত্রভুক্ত। কোন বন্ধনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে গ্রন্থিযুক্ত হয়ে থাকা বা সাংসারিক লাভক্ষতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হয়ে থাকা তাদের চরিত্রধর্ম নয়। তাদের এই সংসার-বিরাগী কেন্দ্রাতিগ প্রকৃতিকে সংসারের কেন্দ্রভূমিতে ধরে রাখতে চেয়েছে কেন্দ্রাভিগ নারীপ্রকৃতি।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়কচরিত্রের বিচারে শরৎচন্দ্রীয় পুরুষচরিত্রের এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির কথা মনে রাখা দরকার। উদাসীনতা, সাংসারিক হিসাববুদ্ধির অভাব, নির্লিপ্ত প্রশান্তি, আন্তরিক বৈরাগ্য, পরোপচিকীর্ষা, মহৎ আদর্শবোধ, অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা-নির্বাহ, অনিকেত ভবঘুরে মনোবৃত্তি,—এইগুলিকে শরৎসাহিত্যের সব কটি নায়ক-চারিত্রের সাধারণ লক্ষণ হিসাবেই গণ্য করা চলে। তাই শরৎচন্দ্রের নায়ক-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও বিকাশের পর্যালোচনায় তাঁর সব কটি রচনার স্বতন্ত্র আলোচনা অনাবশ্যক। কেননা তাতে পুনরুক্তির সম্ভাবনা সমধিক। তাই তাঁর রচনাবলী থেকে কয়েকটি প্রতিনিধি-স্থানীয় চরিত্রকে নির্বাচন করে নিয়ে তাদের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলেই শরৎচন্দ্রীয় নায়ক-চরিত্রের সামগ্রিক পরিচয়টি লাভ করা সম্ভবপর হবে।

তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের নায়কচরিত্রের বিশ্লেষণের রীতির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নায়ক চরিত্রের বিচার-রীতি কিছুটা পৃথক হতে বাধ্য।

এর প্রধান কারণ এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের মতো শরৎ-কথাসাহিত্যের নায়ক-চরিত্র-পরিকল্পনায় কোন বিশেষ আদর্শ-চেতনার ক্রমবিকাশের স্তর-পরম্পরাটি লক্ষ্য করা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মাধ্যমে তাঁর স্বকল্পিত ও স্বনির্দিষ্ট আদর্শ চরিত্রের ক্রমবিকাশের সূত্রে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন বা রবীন্দ্রনাথ তাঁর নায়কদের মধ্য দিয়ে তাঁর পার্সোনালিটি-চিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখাতে চেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র তেমন কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছকে তাঁর সৃষ্ট নায়ক চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করেন নি। আসলে ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের যে দৃঢ়মূল সম্পর্কের ভিত্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ তাঁদের চরিত্র পরিকল্পনার মৌলিক প্রেরণাভূমিটি খুঁজে পেয়েছিলেন, শরৎচন্দ্র জীবনকে সেরূপে দেখেননি। উনিশ শতকীয় জীবনচর্চার যে বিশিষ্ট বোধ বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের চেতনাকে উদ্বোধিত করেছিল, তার সাক্ষাৎ শরৎচন্দ্রে আমরা মোটেই পাই না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভূমিতে গীতার নিষ্কাম ধর্মতত্ত্ব ও পশ্চিমী হিতবাদ-উপযোগবাদের যে গভীর অনুপ্রবেশ হয়েছিল, তারই সাক্ষাৎ প্রেরণায় তিনি তাঁর নায়ক চরিত্রগুলির পরিকল্পনা করতে পেরেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উনিশ শতকীয় এই বিশিষ্ট চিন্তা-চেতনার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল বিশাল পারিবারিক ঐতিহ্য, যা তাঁর সামনে নায়ক চরিত্রের একটি স্থিরাদর্শ স্থাপন করতে পেরেছিল। শরৎচন্দ্র ছিলেন এই দুই-ধরণের বোধ থেকেই বঞ্চিত। উনিশ শতকের শেষার্ধে জন্মগ্রহণ করলেও, তাঁর চেতনায় উনিশ শতকীয় এই বিশাল ভাবনাগুলির মোটেই ছায়াপাত হয়নি। অত্যন্ত সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে অভাব-অনটন, দুঃখদৈন্য ও দীনতাহীনতার সঙ্গে নিত্য পরিচয় ও নানাস্থানে ভেসে ভেসে বেড়াবার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সূত্রে তিনি জীবন সম্পর্কে যে বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছিলেন, শরৎচন্দ্রীয় নায়কবৃন্দ তারই চমকপ্রদ প্রকাশস্থল।

শ্রীকান্তকে শরৎচন্দ্রের প্রতিনিধি-স্থানীয় উপন্যাস হিসাবে গ্রহণ করে তার নায়ক শ্রীকান্তকেই তাঁর নায়ক-প্রতিনিধিরূপে গণ্য করা মোটেই অসমীচীন নয়। ১৩২২, ১৩২৪, ১৩২৭ ও ১৩৩৮—এই চারটি ভিন্ন ভিন্ন বছরে শ্রীকান্তের চারটি খণ্ড পর্যায়ক্রমে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আগেই বলেছি যে, ইতিহাসের সন তারিখের বিচারে ১৩০৯ সনে তাঁর সাহিত্যসাধনার সূচনা লক্ষিত হলেও, শরৎচন্দ্রের আত্মস্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত বিশিষ্টতা ১৩২২ সনেই তাঁর রচনায় মুদ্রিত হয়েছিল এবং শ্রীকান্তের প্রথম পর্ব এই বছরেই আত্মপ্রকাশ

করে। শরৎচন্দ্রের শেষ দুটি প্রকাশিত উপন্যাস শুভদা (১৩৫৪) ও শেষের পরিচয় (১৩৪৬) শ্রীকান্তের চতুর্থ পর্বের (১৩৩৮) সাত-আট বছর পরে প্রকাশিত হলেও, এক হিসাবে চতুর্থ খণ্ড শ্রীকান্তই শরৎচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। কেননা 'শুভদা' অনেক পূর্ববর্তী রচনা ও 'শেষের পরিচয়' গ্রন্থে তাঁর অসমাপ্ত লেখাটি সম্পূর্ণ করেন শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে এই দুটি উপন্যাস শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, 'শ্রীকান্তই' শরৎচন্দ্রের একমাত্র উপন্যাস যার চারটি খণ্ডে বিধৃত শ্রীকান্ত চরিত্রের বিচিত্র ক্রমবিকাশের মধ্যেই তাঁর নায়ক চরিত্র পরিকল্পনার সব কয়টি বৈশিষ্ট্যই ধরা দিয়েছে। এই চারটি খণ্ড রচনার ফাঁকে ফাঁকেই এসেছে 'পল্লীসমাজ', 'চরিত্রহীন', 'দেনাপাওনা', 'গৃহদাহ' প্রভৃতির মতো উপন্যাসগুলি, যার মধ্যে 'রমেশ', 'সতীশ', 'উপেন্দ্র' 'জীবানন্দ' 'মহিম' ও 'সুরেশে'র মতো শরৎচন্দ্রীয় নায়কেরা আত্মপ্রকাশ করেছে। এই চরিত্রগুলি যেন সূর্যমণ্ডলীর গ্রহানুচর, তারা সবাই সূর্যকে ঘিরে প্রদক্ষিণরত ও সূর্যের আলোয় আলোকিত। শ্রীকান্ত যেন চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও জীবনভাবনায় এই সব কয়টি নায়কের সারাৎসার। বাকিরা সকলেই খণ্ড খণ্ড বা আংশিকভাবে শরৎচন্দ্রীয় নায়কের লক্ষণাক্রান্ত। এজন্য শরৎ সাহিত্যের নায়ক চরিত্রের বিশিষ্টতা ও বিকাশের পর্যায়ক্রমিক আলোচনায় শ্রীকান্তের আনুপূর্বিক পর্যালোচনাই শরৎচন্দ্রীয় নায়ক চরিত্রের সামগ্রিক পর্যালোচনার রূপ পরিগ্রহ করে।

শরৎ সাহিত্যে চিত্রিত নারী যেমন চিরন্তনী, পুরুষ চরিত্রগুলিও তেমনি চিরন্তন পুরুষ-স্বভাব-লক্ষণ-সমৃদ্ধ। এ সম্বন্ধে রসিক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধার করা চলে :

'পুরুষের মন উদাসীন, বৈরাগীজাতীয় ; তাহার জীবনটাই কেবল ভবঘুরে নয়, তাহার মনটাও ভবঘুরে—সকল পুরুষেরই মন ভবঘুরে। সংসার চক্রে পুরুষ কেন্দ্রাতিগ শক্তি, কেন্দ্রাভিগ নারী তাহাকে টানিয়া রাখিতে চাহিতেছে। —আর এই দুই শক্তি মিলিয়া সংসারচক্রের আবর্তন করিতেছে।······নারী দাতা, পুরুষ গ্রহীতা, নারী সক্রিয়, পুরুষ নিষ্ক্রিয়, নারী শক্তি, পুরুষ নির্বিকার। এই মৌলিক তত্ত্বটি অবলম্বন করিয়াই শাস্ত্রকারকে তাহার দর্শন-শাস্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইয়াছে।

'শ্রীকান্ত' ও রাজলক্ষ্মী চরিত্র অবলম্বনে শরৎচন্দ্র এই মৌলিক তত্ত্বটাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।'[২]

বিশিষ্টভাবে শ্রীকান্তচরিত্রটির মধ্যে এই শাশ্বত-পুরুষ স্বভাবের পরিচয় উদ্ঘাটিত হলেও, শরৎচন্দ্রের প্রায় সব কটি পুরুষচরিত্রেই এই বিশিষ্টতা অল্পবিস্তর লক্ষ্য করা যায়। এজন্য শরৎ-সাহিত্যের নায়ক-লক্ষণ শ্রীকান্তেই সর্বাধিক স্পষ্ট। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়, তবে তা ব্যতিক্রম বলেই নিয়মের প্রমাণ দেয়।

চারখণ্ডে সমাপ্ত 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ডের সূচনাতেই চরিত্রটির বিশেষত্ব ও চরিত্রটির প্রতি লেখকের এই বিশেষ মানসিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১. "আমার এই ভবঘুরে জীবনের অপরাহ্লবেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে আসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে। ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই তো বুড়া হইলাম।·· মনে হইতেছে হয়তো ভগবান যাহাকে তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টির মাঝখানটিতে টান দেন, তাহাকে ভালোছেলে হইয়া এগজামিন পাশ করিবার সুবিধাও করিয়া দেন না।·· বুদ্ধি তাহাকে হয়তো কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলেনা। তারপর সেই মন্দ ছেলেটা যে কেমন করিয়া অনাদর-অবহেলায় মন্দের আকর্ষণে মন্দ হইয়া, ধাক্কা খাইয়া, ঠোকর খাইয়া অজ্ঞাতসারে অবশেষে একদিন অপযশের ঝুলি কাঁধে করিয়া কোথায় সরিয়া পড়ে, সুদীর্ঘদিন তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।"—প্রথম পর্ব।

২. "এই ছন্নছাড়া জীবনের যে অধ্যায়টা সেদিন রাজলক্ষ্মীর কাছে শেষ বিদায়ের ক্ষণে চোখের জলের ভিতর দিয়া শেষ করিয়া আসিয়াছিলাম, মনে করি নাই তাহার ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিবার জন্য আমার ডাক পড়িবে।···তাই আজ এই ভ্রষ্ট জীবনের বিশৃঙ্খল ঘটনার শতচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলা আর একবার বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি"—দ্বিতীয় পর্ব।

৩. "একদিন যে ভ্রমণকাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টানিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছিলাম, আবার একদিন তাহাকেই নিজের হাতে উদ্ঘাটিত করিবার আমার প্রবৃত্তি ছিল না।"—তৃতীয় পর্ব।

৪. "এতকাল জীবনটা কাটিল উপগ্রহের মতো। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরি, না পাইলাম তাহার কাছে আসিবার অধিকার, না পাইলাম দূরে যাইবার অনুমতি। অধীন নই। নিজেকে স্বাধীন

বলিবার জোর নাই। এমনি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে?"—চতুর্থ খণ্ড।

১৩২২ থেকে ১৩৩৭—শরৎচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের দীপ্ত ও পরিণত পর্যায় থেকে তাঁর জীবন ও সাহিত্যের একেবারে শেষ ও অন্তিম পর্যায়। তাঁর গোটা সাহিত্যজীবনের নায়কপ্রতিনিধির জীবনদৃষ্টি আশ্চর্য স্বচ্ছভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে এই চারটি খণ্ডের সূচনাংশে। লক্ষণীয় যে, এই চারটি খণ্ডের প্রতিটিতে নায়ক তার নিজ জীবনবৃত্তকে 'ভবঘুরে', 'ছন্নছাড়া', 'উপগ্রহ' প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। সব কটিতেই নিজ জীবন সম্পর্কে তার এক এক অনিকেত অনির্দেশ্য অনির্দিষ্টতার উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। শাস্ত্রসম্মত পুরুষ-সত্তার নিষ্ক্রিয় উদাসীনতার এ যেন এক জীবন্ত বিগ্রহ। তার এই স্বভাব কোন বিশেষ ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জাত নয়। এ তার স্বভাবের মধ্যে শিকড় গেড়ে আছে। "ছেলেবেলা হইতে এমন করিয়াই তো বুড়া হইলাম—" শ্রীকান্তর জীবনের আনুপূর্বিকতায় এই বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। এই উদাসীন বৈরাগ্যের প্রবর্তনাতেই সে একদা অপযশের ঝুলি কাঁধে সকলের অজ্ঞাতসারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু তার কোন গন্তব্য নেই, তাই 'ছন্নছাড়া' জীবনের শতচ্ছিন্ন গ্রন্থির সূত্র যোজনা করতে সে পুনরায় লোকসমক্ষে আবির্ভূত হয়। আবার তার স্বভাবের টানে সে তার জীবনপথের ভ্রমণ-কাহিনীর মাঝখানে অকস্মাৎ যবনিকা টেনে উধাও হয়, কিন্তু পুনরায় সে নিজের 'উপগ্রহবৃত্তি' অনুভব করে বিস্মিত, বিষণ্ণ ও ব্যথিত হয়, উপগ্রহের মতোই সে আপাত-স্বাধীন হলেও, পুরোপুরি স্বাধীন নয়। আপন জীবন কক্ষপথের পরিক্রমায় এই অনির্দিষ্ট চলমানতার দিকে তাকিয়েই তার শেষপ্রশ্ন উচ্চারিত।

অবশ্য শরৎচন্দ্র শুধুমাত্র এই স্বভাববৈশিষ্ট্যের ওপরেই শ্রীকান্ত চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ রহস্যের উৎস-নির্দেশ করেন নি; বরং শ্রীকান্তের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায়, বিচিত্রতর মানবচরিত্রাভিজ্ঞতায় একে জীবন্ত ও গ্রাহ্য করে তুলতে পেরেছেন। শ্রীকান্তের জীবন তার ছেলেবেলাতেই এমন কতকগুলি আশ্চর্য ও অভাবনীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিল এবং এমন কতকগুলি মানুষের সান্নিধ্যে সে এসেছিল, যা তার স্বভাবসুলভ উদাসীনতা, প্রকৃতিগত বৈরাগ্যের সূত্রটিতে টান দিয়ে তার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিল। ইন্দ্রনাথের সাহচর্যে এবং অন্নদাদিদি ও তার বেদে জীবনের সংস্পর্শে এসে শ্রীকান্তের জীবনের মর্মমূলে যে গভীর দাগ পড়েছে, তার আলোতেই তার

জীবনপথ পরিক্রমা ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত হয়েছে। একজন সমালোচক যথার্থই বলেছেন,

> "এক একজন লোক আছে যাহারা সর্বদা রাস্তায় জিনিস কুড়াইয়া পায়। শ্রীকান্ত তাহার জীবনযাত্রার প্রারম্ভেই অতি অবজ্ঞাত আবেষ্টনের মধ্যে যে রত্ন কুড়াইয়া পাইয়াছে তাহা তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের পাথেয় হইয়াছে।"[৩]

শ্রীকান্ত এদিক দিয়ে সত্যিই ভাগ্যবান—বাল্যজীবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত, জীবনের পথে সে নানারকম মানুষের সংস্পর্শে এসেছে। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, নতুনদা, অভয়া, রোহিণীদা, নন্দমিস্ত্রী, টগর বৈষ্ণবী, অভয়ার স্বামী, সুনন্দা, স্বামী বজ্রানন্দ, গহর, কমললতা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি নানাজনের সংস্পর্শে এসে সে তার জীবনের পাঠশালার পাঠগ্রহণ করেছে। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছিন্নসূত্র দিয়েই সে তার জীবনের শতচ্ছিন্ন গ্রন্থিগুলোর সূত্র যোজনা করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। অতি বাল্যকাল থেকেই তার এই আহ্বান পর্বের শুরু। স্কুলের ফুটবলম্যাচ উপলক্ষে মারামারিকে অবলম্বন করে সে তার জীবনের প্রথম, অবিস্মরণীয় ও উজ্জ্বলতম রত্নটিকে আয়ত্ত করেছিল। কল্পনাপ্রবণতার সঙ্গে দুঃসাহসিকতা, সহজ বিশ্বাসের সঙ্গে সংস্কারমুক্ত মন, মানবিকতাবোধ ও পরোপচিকীর্ষা, নির্লিপ্ত উদাসীনতা ও অসীম বৈরাগ্য—ইন্দ্রনাথের চরিত্রের এই বহুবিচিত্র বিশিষ্টতাগুলি অত্যন্ত বাল্যকালেই শ্রীকান্তের মানসিক ভিত্তিভূমিটিকে গড়ে তুলেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল অন্নদাদিদির অতুলনীয় নারীত্ব ও সতীত্ব, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতোই তার আপাত মালিন্যের অন্তরালবর্তী জ্যোতির্ময়ী স্বরূপ। শুধু এরাই নয় জীবনের উল্টোপিঠও শ্রীকান্ত বাল্যকালেই দেখেছিল,—নতুনদার মধ্যে অখণ্ড স্বার্থপরতার উৎকট নিদর্শন। এই সমস্ত কিছুর মিলনে মিশ্রণে, ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়, টানা-পোড়েনে যে মন শ্রীকান্তের গড়ে উঠেছিল, তা ভবঘুরের, ছন্নছাড়ার, উপগ্রহের, উদাসীনের, নিষ্ক্রিয়ের, বৈরাগীর। বাল্যকালের এই শিক্ষার পরীক্ষা হয়েছে শ্রীকান্তের সারাজীবনব্যাপী ঘটনায়। কুমার বাহাদুরের শিকার পার্টিতে শ্রীকান্ত যখন পিয়ারীর অন্তরালে আপন বাল্যসঙ্গিনী ও প্রণয়িনী রাজলক্ষ্মীর সাক্ষাৎ পেল, তখন থেকেই তার এই জীবনপথ-পরিক্রমা যথার্থই শুরু হলো। কখনো কাছে এসে, কখনো দূরে সরে গিয়ে, কখনো বা দেশান্তরী হয়ে শ্রীকান্ত তার জীবনপথপরিক্রমায় একটি সুস্থির স্বাভাবিকতা আনতে চেয়ে বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে। চারখণ্ডের বিস্তৃত পটে, লেখক-

জীবনের প্রায় কুড়ি বৎসর ব্যাপী সাধনা ও চেষ্টায় অকৃতার্থ জীবনের এই পথিকবৃত্তি শেষ পর্যন্ত কোন গন্তব্যে উপনীত হতে পারেনি। তাই ছন্নছাড়া জীবনের অপরাহ্নে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে "এমনি করিয়াই কি চিরজীবন কাটিবে ?"

'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বে জীবনের অপরাহ্ণবেলায় দাঁড়িয়ে অতীতের দিকে চেয়ে শ্রীকান্ত মন্তব্য করেছে, "ছেলেবেলা হইতে এমনি করিয়াই তো বুড়া হইলাম।" তার এই বুড়া বয়সের মানসিকতা, প্রৌঢ় দার্শনিকতা উপন্যাসের প্রতিটি পর্বেই তার ভাবনার মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। এক ধরনের উদ্যমহীন চিন্তাশীলতাই এই প্রৌঢ় মানসিকতার লক্ষণ ; কিন্তু সত্যিই কি শ্রীকান্ত তার চতুর্থ পর্বের কাহিনীক্ষেত্রেও বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কবি সমালোচক প্রমথনাথ বিশী এক আশ্চর্য তথ্য ও তত্ত্বের উদ্ঘাটন করেছেন।[৪] কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনা ও ইঙ্গিতের সহায়তায় তিনি দেখিয়েছেন যে, চতুর্থপর্বে কমললতা বৃত্তান্তের সময়ে শ্রীকান্তের বয়স বড়জোর বত্রিশের কাছাকাছি। দৈহিক বয়সের হিসাবে এটিকে বার্ধক্য তো নয়ই, এমনকি প্রৌঢ়ত্বও বলা যায় না। এ বয়স যৌবনের রক্তরাগে রঞ্জিত, অথচ শ্রীকান্ত সায়াহ্নের সূর্যাস্তের গোধূলির আলো আঁধারিতে ম্রিয়মাণ ও আচ্ছন্ন। শ্রীকান্তের এই অকাল-প্রৌঢ়তার স্বরূপ খুঁজতে গিয়ে তিনি যুগান্তের ক্লান্তিকেই দেখতে পেয়েছেন, যা উনিশ শতকের জ্ঞানপ্রবুদ্ধ কর্মৈষণার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াবশেই ক্লান্ত, স্তিমিত, ম্লান ও নিরুদ্যম।

> "গত শতাব্দীতে ধর্মসাধনায়, রাষ্ট্রসাধনায়, শিল্পে এবং সাহিত্যে বাঙালী যে নৈপুণ্য ও দিগ্দর্শন প্রদর্শন করিয়াছিল, সে ক্ষমতা যেন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল—সে যেন মনের মধ্যে অপরাহ্নের ক্লান্তিজনিত একটা নৈরাশ্যের ভাব অনুভব করিতে শুরু করিয়াছিল। সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় ঠিক এই সময়টিতে।··· শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ পুরুষচরিত্র উক্ত ভাবের প্রতীক। শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের অধিকাংশই বহুলপরিমাণে নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, লক্ষ্য সম্বন্ধে অচেতন। ঘটনার তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়া যাওয়াই যেন তাহাদের ধর্ম। বুদ্ধিতে তাহারা ক্ষীণ নহে। ধীশক্তিও তাহাদের প্রচুর—কেবল যে উদ্যম থাকিলে, উদ্দেশ্য থাকিলে, লক্ষ্য সম্বন্ধে চৈতন্য থাকিলে জীবন সার্থক হইয়া ওঠে, তাহারই অভাব। এ বিষয়ে শ্রীকান্ত শরৎ-সাহিত্যের পুরুষগণের প্রতিনিধি এবং বাঙালীসমাজের প্রতীক।"[৫]

এ জন্যই অমরনাথ, সীতারাম বা প্রতাপ কিংবা শচীশ বা গোরার মতো চরিত্র শরৎসাহিত্যে অপ্রাপণীয়, কেননা তারা বিগত শতাব্দী ও যুগের প্রতিনিধি। এই নিরুদ্যম কর্মহীনতার ব্যতিক্রান্ত অথচ তির্যক প্রকাশ অমিত রায়ের মধ্যে, আর স্বাভাবিক ও সর্বজনীন মুক্তি শ্রীকান্তে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র যে পথনির্দেশকের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তাঁর অন্যতম কারণ স্বকাল ও সমাজের চরিত্রধর্মের যথাযথ স্বরূপটি তাঁর রচনায় পূর্ণমাত্রায় ইঙ্গিতগর্ভ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীকান্তই এর সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত ও বিশদ উদাহরণ। তার স্বভাববৈশিষ্ট্যগুলিই তাঁর অন্যান্য রচনার পুরুষচরিত্রের মৌলিক স্বভাবের উৎসস্থল। মহিম, সুরেশ, জীবানন্দ বা সতীশ, উপেন্দ্রের মধ্যে যে উদাসীনতা ও বৈরাগ্যের প্রকাশ ঘটেছে, তা শ্রীকান্তেরই সমধর্মী। "··· বুদ্ধি তাহাকে হয়ত কিছু দেন, কিন্তু বিষয়ী লোকেরা তাহাকে সুবুদ্ধি বলে না"—বলে প্রথম পর্বে শ্রীকান্ত আত্ম-স্বভাবের বর্ণনা দিয়েছে। 'বিরাজ বৌ'-এর নীলাম্বর কিংবা 'বৈকুণ্ঠের উইলে'র গোকুল অথবা 'নিষ্কৃতি'র গিরিশের মধ্যে তারই বিচিত্র পরিস্থিতিতে প্রকাশ ঘটেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র দুটি একটি আদর্শ চরিত্রের পরিকল্পনাও করেছেন। যেমন, 'পল্লীসমাজে'র রমেশ কিংবা 'বিপ্রদাসে'র নামচরিত্র—সেখানেও শ্রীকান্তের মৌলিক লক্ষণগুলি স্পষ্ট ও বহুলভাবে উপস্থিত। শরৎ-সাহিত্যের কয়েকটি প্রধান পুরুষ এবং নায়ক চরিত্রের বিশ্লেষণ করে এই বিষয়টি আরো ভালোভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে।

'গৃহদাহ' উপন্যাসের মহিম ও সুরেশ, শরৎচন্দ্রের নায়ক-পদবাচ্য পুরুষ চরিত্রগুলির মধ্যে শ্রীকান্তের পরেই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই চরিত্র দুটি সম্বন্ধে একজন মনস্বী সমালোচকের অভিমত আমরা প্রথমেই উল্লেখ করবো :

> "সুরেশ বাহিরে অসংযত, উচ্ছ্বসিত-প্রবৃত্তির দাস। কিন্তু তাহার উদ্দাম ভোগলোলুপতার অন্তরালে রহিয়াছে চরম বৈরাগ্য। মহিমের চরিত্রের বাহিরের আবরণটা নির্বিকার ঔদাসীন্যে ভরা। কিন্তু কঠোর সংযমের পশ্চাতে রহিয়াছে অনমনীয় কর্তব্যপরায়ণতা।··· অন্তরে বাহিরে সে একান্তভাবে একাকী ; কাহাকেও সে তাহার চিন্তার, কল্পনার সঙ্গী করিতে পারে না। জীবনকে সে ভোগ করিতে চাহে না, সহ্য করিতে চায়। তাহার সম্বল উচ্ছ্বসিত প্রবৃত্তি নহে, অবিচলিত ধৈর্য।"[৬]

'গৃহদাহ' উপন্যাসের নায়িকা অচলা ও তার দোলাচল-চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্র করে লেখক এই দুটি পুরুষ ও নায়ক চরিত্রের অভিনব মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন। এই দুটি ভিন্নধর্মী পুরুষ চরিত্রের মাঝখানে অচলা অচলা হয়ে থাকতে পারেনি, আর তার চিত্তের দোলাচলতায় এই দুটি চরিত্রের আন্তরিক স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কিছু উপন্যাসেই একটি নারীকে ঘিরে দুটি পুরুষ চরিত্র এমনভাবে প্রাধান্য পেয়েছে যে তাদের মধ্যে কোন একজনকে বিশেষভাবে নায়ক বলায় কিছুটা দ্বিধা জাগে। গোরা ও বিনয়ের মধ্যে গোরাকে যে বিশিষ্টতার জন্য নিঃসন্দেহে ও নির্দ্বিধায় নায়ক বলা চলে, মহেন্দ্র ও বিহারী কিংবা নিখিলেশ ও সন্দীপের মধ্যে কোন একজনকে অতখানি দ্বিধাহীন চিত্তে নির্বাচন ও মনোনয়ন করা সম্ভবপর নয়। শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' প্রসঙ্গেও এই একই অবস্থার মুখোমুখি পড়তে হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রেরণা-মূলে রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র গভীর প্রভাবের কথা নিজেই উল্লেখ করেছেন এবং 'গৃহদাহে'র সমস্যার চেহারাটিও বহির্লক্ষণে 'চোখের বালি'র সমানধর্মী, মহিম ও সুরেশ মহেন্দ্র ও বিহারীর মতো পরস্পরের অন্তরঙ্গ ও অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু এবং দুজনের ক্ষেত্রেই এক নারীর প্রতি প্রণয়াসক্ত হওয়ার দরুণ সমস্যার উদ্ভব। অবশ্যই 'চোখের বালি'র প্রকৃতি ও পরিবেশন-রীতি অনেকটাই আলাদা। তবে একথা বলা চলে যে, মহিম ও সুরেশ, এই দুটি চরিত্রের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে নায়কপদবাচ্য কোন একজনকে বেছে নেওয়া কিছুটা কষ্টকর। শরৎচন্দ্রীয় নায়ক, যার প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্রের নাম 'শ্রীকান্ত',—তারই আদর্শে এই দুটি চরিত্রও পরিকল্পিত। সুরেশ ও মহিম আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব হলেও, একটি জায়গায় উভয়ের মিল অত্যন্ত অন্তর্গূঢ়। সুরেশের প্রবৃত্তি উদ্দাম, হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত, আপন অভীষ্ট সাধনায় সে যে কোনো কাজেই পারঙ্গম,—কিন্তু এটাই তার শেষ পরিচয় নয়। বাইরের এই চঞ্চলতার অন্তরালে তার হৃদয়ের গভীরে রয়েছে এক অসীম বৈরাগ্যের অধিকারী মন। জীবনকে ভোগ করার তীব্র প্রবৃত্তিতে যে অচলাকে আয়ত্ত করেছে বন্ধুর প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে, সে-ই আবার অবহেলায় আপন জীবন উৎসর্গ করলো রোগের চিকিৎসা ও পরোপচিকীর্ষায়। এই যে জীবনের সমস্ত বন্ধনের প্রতি একান্ত অনাসক্ত উদাসীন মন, এটি তো ইন্দ্রনাথের কাছে পাওয়া শ্রীকান্তের জীবনবোধেরই একটি রূপান্তর মাত্র। বাইরের ঐ ভোগপ্রবৃত্তিটা সুরেশের

প্রধান লক্ষণ নয়। কারণ শরৎসাহিত্যের পুরুষ-চরিত্রে এই ভোগপ্রবৃত্তির তীব্রতা কোথাও স্পষ্ট হয় নি। এটি সুরেশের বহির্লক্ষণ, আর আন্তরিক ধর্মের সঙ্গে তার এই সরাসরি বৈপরীত্যই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে শরৎচন্দ্রীয় নায়ক পরিকল্পনায় কিছুটা স্বাতন্ত্র্য-আনার চেষ্টা করেছে।

মহিম চরিত্র সুরেশের বিপরীত প্রকৃতির। সে বাইরে উচ্ছ্বসিত নয়। তার হৃদয়াবেগ কখনোই উদ্দামভাবে সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে প্রবাহিত হতে চায় না। সে আত্মসমাহিত। কিন্তু ঠিক উদাসীন বৈরাগী সে নয়। সংসারের কাজে আপাত নির্লিপ্ত মনে হলেও, সাংসারিক কর্তব্যপালনে তার নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ও অনমনীয়। মৃণাল কিংবা অচলার সঙ্গে ব্যবহারে সে কোথাও আত্মসংযমের বাধা ডিঙ্গিয়ে উভয়ের হৃদয়ের কাছাকাছি যাবার চেষ্টাও করেনি। তার মনের মধ্যে যে শান্ত নিরপেক্ষতা, যে কঠোর আত্মশাসনক্ষমতা ও কঠিন সংযম ছিল,—গোটা উপন্যাসের অজস্র ঘটনার কোন একটির চাপেও তার সুরক্ষিত দুর্গে ফাটল ধরেনি। তাই সুরেশের প্রাণবন্ত সত্তার পাশে এই প্রস্তরকঠিন সংযমী মানুষটিকে পাষাণমূর্তি বলেই বোধ হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রীয় নায়কের সাধারণ ধর্ম, কঠোর আত্মসংযম ও শান্ত নিরপেক্ষতার যে রূপ শ্রীকান্তের মধ্যে লভ্য, তার গুণে ও যোজনায় সে-ও সমৃদ্ধ। মহিম ও সুরেশ 'গৃহদাহ' উপন্যাসের এই দুটি চরিত্র পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক রূপে এই কাহিনীতে শরৎচন্দ্রীয় নায়কচিন্তারই প্রকাশ ঘটিয়েছে, শ্রীকান্তকে আমরা যার প্রতিনিধিস্থানীয় বলে অভিহিত করেছি।

শরৎ-সাহিত্যের নায়কবৃন্দের মধ্যে 'দেনাপাওনা'র জীবানন্দ চৌধুরী আপন বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যে একটি বিশেষ স্থানের দাবী করতে পারে। সে জমিদার, মাতাল, লম্পট, ধর্মজ্ঞানশূন্য, প্রজাপীড়ক, স্বামী-পুত্রবতীর সতীত্বনাশ তার দৈনন্দিন জীবনচর্চার অঙ্গ। তার সমস্ত পাপাচরণের মধ্যে কোথাও কোন লজ্জা বা সঙ্কোচ নেই; আপন কৃতকর্মের সে নির্মম ও নিরপেক্ষ ভাষ্যকার। শরৎসাহিত্যের নায়কচরিত্রের সঙ্গে এখানেই তার মস্ত ফারাক। চারিত্রিক গুণবত্তা, সাংসারিক হিসাববুদ্ধির অভাব সত্ত্বেও, সাধারণভাবে শরৎচন্দ্রের নায়কদের শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে। কিন্তু এদিক দিয়ে জীবানন্দের সপক্ষে কিছুই বলার নেই। কারণ, তার ধর্মজ্ঞানহীন পাপাচরণ কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতেই শ্রদ্ধেয় বলে অনুভূত হতে পারেনা। দেবীমন্দিরের ভৈরবী ষোড়শী, যে তার একদা—পরিণীতা স্ত্রী অলকা, তার সঙ্গে পরিচয় ও বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরায়

মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের বিচিত্র পরিবর্তনের ইতিহাসই 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের উপজীব্য। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশেই জীবানন্দ চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছে এই কাহিনীতে। উপন্যাসের সূচনায় আমরা যে জীবানন্দকে দেখি ও পরিণামে যে জীবানন্দের সাক্ষাৎ লাভ করি, তারা এই দেনাপাওনার হিসাবনিকাশেরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিমাত্র। আপাতদৃষ্টিতে এই পরিবর্তন আকস্মিক মনে হলেও তা অসমঞ্জস নয়। একান্ত ভোগসর্বস্ব জীবনযাপন করলেও, অন্তরে তার একধরণের নির্লিপ্ত উদাসীনতা, জীবন সম্পর্কে মোহহীন বৈরাগ্য, প্রথম থেকেই লক্ষ্য করা গেছে। আসলে পাপাচরণ আকণ্ঠ নিমগ্ন থেকে সে সুখ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু একটি পাপ থেকে পাপান্তরে যাওয়াই তার সার হয়েছে। সে মুহূর্তের জন্যেও সুখ পায়নি। এই নিরন্তর অতৃপ্তিই তার মনের মধ্যে একধরণের উদাসীন বৈরাগ্য এনে দিয়েছিল। কিন্তু এই বিরামহীন পাপাচরণ তার মনের মধ্যেকার মানুষটিকে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত করতে পারেনি। আপন স্বভাব ও সত্তার প্রতি তার নিজেরই ব্যঙ্গধর্মিতা ও রঙ্গরসিকতা এই আন্তরিকসত্তার জৈবতারই প্রমাণ দেয়।

> "মনে হয় তাহার মধ্যে দুইটি সত্তা পাশাপাশি বাস করিত। একটি পাপে ডুবিতেছিল, আর একটি একটু দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিত। একটি 'কে' সাহেবের কবল হইতে পরিত্রাণ পাইবার পথ খুঁজিতেছে। আর একটি সাহেবের বহুদিন পোষিত আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতার কল্পনায় কৌতুক অনুভব করিয়াছে। একটি ষোড়শীর চরম লাঞ্ছনার নিষ্ঠুর প্রস্তাব নিঃসঙ্কোচে করিয়াছে। আর একটি তেমনি নিঃশঙ্কোচে ষোড়শীর হাত হইতে বিষ গ্রহণ করিয়াছে।"[৭]

জীবানন্দ-সত্তার এই দ্বৈতলীলাই প্রমাণ করে যে, তার আত্মার পুরোপুরি মৃত্যু ঘটেনি। আসলে প্রীতিহীন, মমতাহীন, স্নেহহীন সংসারের নিয়ত সান্নিধ্য তার মধ্যেকার সমস্ত মানবিকতাকে বিনষ্ট করে দিতে চেয়েছে, আর আত্মনিগ্রহের জন্যই সে ক্রমশ একটি পাপ থেকে আর একটি পাপ-আচরণের পথে আত্মহননের নির্মমতায় এগিয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ষোড়শীর সঙ্গে পরিচয়, তার মধ্যে অলকার পরিচয়ের পুনরুদ্ধার, ষোড়শীর মাধ্যমে নারীর সতীত্ব সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান অর্জন,—তার জীবনে পরিবর্তনের ইঙ্গিত বয়ে

এনেছে। ষোড়শীকে ঘিরে তার জীবনতৃষ্ণার নব আবির্ভাব নির্মলের প্রতি তার ঈর্ষায় তির্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। একেবারে শেষে সম্পত্তি দান করার সময় সে জীবনপ্রীতি, সংসারপ্রীতি সম্পর্কে যা বলেছে তাতে তার পরিবর্তন সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য :—

> "যে উচ্ছৃঙ্খল মগুপ ষোড়শীর নিকট হইতে বিষ গ্রহণ করিয়াছিল আর যে সংযমী সর্বত্যাগী জমিদার ষোড়শীর হাত ধরিয়া সমস্ত সম্ভোগ হইতে দূরে সরিয়া গেল—ইহাদের মধ্যে কত প্রভেদ ; অথচ উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে বাঁচিবার জন্য অপ্রমেয় আকাঙ্ক্ষা, আবার তেমনি সুগভীর নির্বিকার বৈরাগ্য।"[৮]

একদিকে জীবনপ্রীতি, অন্যদিকে নির্বিকার বৈরাগ্য ;—জীবানন্দচরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটি শরৎচন্দ্রীয় নায়কের সাধারণ ধর্ম থেকে পৃথক কিছু নয়। শরৎচন্দ্রের সব নায়কই এই দুই মনোভাবের সামঞ্জস্য সমন্বিত, কেবল তফাৎ এই যে, জীবনপ্রীতি অন্য নায়কদের অমুক্ত হৃদয়ভাব মাত্র ; আর জীবানন্দে তা ব্যাকুল জীবনাকাঙ্ক্ষায় স্পষ্টভাবে উচ্চারিত।

শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ যতখানি না রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ, তার চেয়ে বহুগুণে বেশি আদর্শচরিত্র। সে উচ্চশিক্ষিত সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে পল্লীজীবনের সংস্কারে মনোনিবেশ করেছে। স্কুল প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, সংস্কারমোচন, প্রভৃতি উচ্চাদর্শপ্রণোদিত কাজকর্মেই তার একান্ত আগ্রহ। এই সমস্ত বিরাট বিরাট কাজের চাপে তার নিজের হৃদয়টি এমনভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল যে, রমাকে ঘিরে প্রণয়ের যে সৌরভ তার আপন চিত্তক্ষেত্রে বিকশিত হয়েছিল, তার সম্যক পরিচয় পর্যন্ত তার অজ্ঞাত ছিল। বহির্জীবনের এই কোলাহলমুখরিত ক্ষেত্রে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে সে কারাবরণ করেছে। কিন্তু কারাবরণের এই অভিজ্ঞতা তাকে নিরুৎসাহ না করে তার সংস্কারপ্রয়াস, পরোপচিকীর্ষা প্রভৃতি বৃত্তিগুলিকে দ্বিগুণ তেজে জ্বালিয়ে দিয়েছে। তার এই আদর্শের আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছে রমা ও জ্যাঠাইমা এবং সবমিলিয়ে রমেশ ব্যক্তিসত্তা থেকে বহুদূরবর্তী এক আদর্শ-লোকের প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রচুর পার্থক্য থাকলেও, গোরার কারাবাস ও রমেশের কারাবাসের মধ্যে একটি ক্ষীণ সাদৃশ্য আছে ; উভয়েই ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে কারাবরণ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই কারাবাসের

অভিজ্ঞতায় আদর্শলোকের মানুষ গোরাকে বাস্তব জীবনসীমায় এমন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, সে রক্তমাংসের জীবন্তমানুষের হৃদস্পন্দন পাঠকের কানে স্পষ্ট এসে পৌঁছোবার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু রমেশের ক্ষেত্রে ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত। যেটুকু ব্যক্তিসত্তা রমেশের তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল, কারাবাস তার মধ্য থেকে যেটুকুও সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে নিয়েছে এবং রমেশ নীরক্ত-আইডিয়ার প্রতিমূর্তিমাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে। রমেশ চরিত্রের এই বিশিষ্ট পরিণাম শরৎচন্দ্রীয় নায়কদের সাধারণ ধর্মকেই প্রমাণ করে। কারণ রমেশ শরৎ-সাহিত্যে ব্যতিক্রম। পরিচিত মধ্যবিত্ত জীবনের যে প্রাঙ্গণ থেকে শরৎচন্দ্র তাঁর নায়কদের চয়ন করে নিয়েছিলেন, রমেশ তাদের সগোত্র নয়। মনে হয় রমেশের চরিত্রাঙ্কনের সময় শরৎচন্দ্রের মনের সামনে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র প্রতিমূর্তিটি যেন স্পষ্ট আদর্শের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। এর আরো বড়ো প্রমাণ জ্যাঠাইমা চরিত্রাঙ্কনে আনন্দময়ীর আভাসটিকে গ্রহণ করা।

'বিরাজবৌ'র নীলাম্বর, 'পণ্ডিতমশাইয়ে'র বৃন্দাবন, 'দেবদাসে'র দেবদাস,—শরৎচন্দ্রীয় নায়কভাবনার স্বাভাবিক পথ ধরেই আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রীকান্তের মতোই সাংসারিক বুদ্ধিতে দীন হয়েও জীবনের মূল্যবোধে সমুন্নত এই সব কয়টি চরিত্রই স্রষ্টার বিশিষ্ট অভিজ্ঞানচিহ্ন ধারণ করে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। নীলাম্বর তার ভাই পীতাম্বর অপেক্ষা সাংসারিক বুদ্ধিতে দীন এবং গাঁজার নেশাসক্ত। সাংসারিক বিচারে সে অধম, কিন্তু চরিত্র-গৌরবে ও মানসিক ঐশ্বর্যে, প্রেমে ও প্রীতিবোধে, উদাসীন বৈরাগ্যে ও সরল বিশ্বাসে সে আশ্চর্য মহত্ত্বে উন্নীত হতে পেরেছে। শ্রীকান্তের সূত্রে শরৎচন্দ্র যে জীবনবোধের পরিচয় দিতে চেয়েছেন, এই চরিত্রে তার একটি সীমা রচিত হয়েছে। 'পণ্ডিত মশাইয়ের' বৃন্দাবন যেন 'গৃহদাহের' মহিম ; তার বুদ্ধি, সংযম ও কর্তব্যবোধ, সংস্কারমুক্ত মন, অনুচ্চারিত প্রেম, সবকিছু তাকে তার গ্রাম্যসমাজের পটেই যেন এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম রূপে স্থাপিত করেছে। দেবদাসের ব্যর্থ প্রেম, তার শোচনীয় আত্মনিগ্রহ এবং পরিণামে শোচনীয় মৃত্যু চড়া রোমান্টিক সুরে বাঁধা হলেও, একধরণের বাধাবন্ধনহীন বৈরাগী উদাসীনতা তারও চারিত্র্যধর্ম। সংসারে কেন্দ্রস্থলে, মানুষের মাঝখানে থেকেও যাদের ভবঘুরে মন সংসার সংসক্ত হতে পারলো না, আপাত জীবন-বিমুখতার অন্তরালে সুগভীর জীবনতৃষ্ণা যাদের আকণ্ঠ, প্রেমের অচরিতার্থতায় যারা আত্মগত ও আত্মনিপীড়ক, ঔদার্যে ও মানবতাবোধে

যাদের হৃদয় বিশাল ও প্রসারিত, সংস্কারের মুক্তিযজ্ঞের যারা প্রধান ঋত্বিক, হিসাবী মানুষের অভিজ্ঞ সামাজিক বুদ্ধিতে যারা অনুকম্পার পাত্র, ঐশ্বর্যে অ-লুব্ধ, ত্যাগে মহিমময়,—শরৎচন্দ্রীয় নায়কের এই সাধারণ ধর্ম শ্রীকান্ত চরিত্রের চারপাশে যে জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি করেছিল, অন্যান্য নায়ক চরিত্রগুলি সেই জ্যোতির্মণ্ডলীরই গ্রহাণুপুঞ্জ। তাই বিলাসবিহারীর পাশে নরেন সহজেই আমাদের কাছে শরৎচন্দ্রীয় ধর্ম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। "পথের দাবী"র সব্যসাচীর সুগভীর দেশানুরাগের মধ্যেও তার উদাসীন ও ভবঘুরে মনটিকে চিনে নিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। আদর্শের অনুরঞ্জন কোথাও কোথাও থাকলেও, নায়ক-চরিত্রের এই বিশিষ্টতাধর্মী পরিকল্পনাতেই শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের নায়ক-পরিকল্পনার পথনির্দেশ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শরৎ-সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাদের চিত্রায়নে শাশ্বত নারী-পুরুষের চিরন্তন লীলারূপ সকলেরই দৃষ্টিগোচর হয়েছে। শরৎচন্দ্রের দার্শনিক মনের গঠনভূমি এ ব্যাপারে যতখানি ক্রিয়াশীলই থাকুক না কেন, আপন যুগের সামাজিক পরিবেশ ও মানসিক বৈশিষ্ট্য যে এর পিছনে গভীরভাবে ক্রিয়াশীল তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিতৃসূত্রে ও ব্যক্তিগত জীবন পরিবেশে এই বিশিষ্ট বাতাবরণেই তাঁর নিজস্ব মনটি গড়ে উঠেছিল, যা বাস্তবজীবনে তাঁকে প্রায় ভবঘুরে করে তুলেছিল। উনিশ শতকীয় জীবনচর্যার প্রথাবাহিত পথে তিনি নিজে যেমন কখনো পদচারণা করেন নি, তেমনি তাঁর নায়কদেরও চলতে দেননি। কিছুটা খাপছাড়া ধরণের জীবনবোধ, যা সাধারণ সাংসারিক হিসাবে মোটেই গ্রহনীয় বা প্রশংসনীয় নয়, তা-ই ছিল শরৎচন্দ্রের অন্বিষ্ট। 'কল্লোলে'র লেখকরা বা বিভূতিভূষণ এই সময়েরই লেখক। 'শেষের কবিতা'র অমিত রায় একালেরই প্রতিনিধি। এরা প্রত্যেকেই হয় বেদে নয় যাযাবর। জীবনপথের নিরুদ্দেশ যাত্রার পথিক কিংবা অর্থহীন বাকচাতুর্যে দীপ্তিমান। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের সঙ্গে শিথিল-মূল সম্পর্কে বেশ কিছুটা আল্গা। যেন জীবনরঙ্গমঞ্চের ঘটমানতার অংশীদার অভিনেতা নয়, দূরবর্তী নিষ্ক্রিয় দর্শকমাত্র। যে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যকে দার্শনিক পুরুষ চরিত্রে সনাতন সত্তার অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য হিসাবে চিহ্নিত করে দিয়েছেন, শরৎচন্দ্র সমাজ ও সংসারের পটে তারই বিচিত্র ছবি আঁকতে চেয়েছেন। শ্রীকান্ত এই সামগ্রিক ভাবনার প্রতিনিধি পুরুষ, শরৎসাহিত্যের নায়ক—চিন্তার সারাৎসার। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের নায়কচেতনার পথিকৃৎ ও পথনির্দেশক।

উৎস নির্দেশ

১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
২। শ্রী প্রমথনাথ বিশী—বাংলা সাহিত্যের নরনারী (শ্রীকান্ত)
৩। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
৪। শ্রী প্রমথনাথ বিশী—পূর্বোক্ত গ্রন্থ।
৫। ঐ ঐ
৬। ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত—শরৎচন্দ্র।
৭। ঐ — ঐ
৮। ঐ — ঐ

যুগান্তর : নতুন চেতনা : সাহিত্যে নতুন যুগ

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রপ্রতিভা তখন অপরাহ্নের দীপ্তিতে বিষণ্ণ গম্ভীর, শরৎচন্দ্র সৃষ্টির রৌদ্রদীপ্ত প্রহরটিকে সবে অতিক্রান্ত হয়েছেন, এমন সময় বাংলা সাহিত্যে এক নতুন ভাববন্যার প্লাবন দেখা দিল। রবি-শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতেই সাহিত্যের আকাশে আবির্ভূত হলো এক নতুন জ্যোতিষ্ক। আপন বর্ণবিভায় সে চাইলো পুরাতনকে ভুলিয়ে দিতে, বিভ্রম ঘটাতে লোকের চোখে, প্রক্ষেপ করতে এক নতুন আলোকরেখা আগামীদিগন্তে। কল্লোল (১৩৩০) কালিকলম (১৩৩৩) ও প্রগতি (১৩৩৪), এই তিন সাহিত্য পত্রিকাকে আশ্রয় করে একদল তরুণতর সাহিত্যিক চাইলেন, বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্র-নির্ভর ধারাটিকে অতিক্রান্ত হয়ে এক নতুন যুগতীর্থে উপনীত হতে। এই পর্বে আরো অনেকগুলি পত্রপত্রিকা, যেমন উত্তরা, ধূপছায়া, আত্মশক্তি, সংহতি, প্রভৃতি এই কর্মযজ্ঞে সামিল হলেও, মুখ্যত 'কল্লোল' ও তার সহযোগী পত্রিকাদুটিই এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল অধিক পরিমাণে। এই নতুন গোষ্ঠীর লক্ষ্য সম্পর্কে এঁদেরই এক বিশিষ্ট সদস্য বলেছিলেন,

> "যাকে কল্লোল যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ। আর বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ।"[১]

এই পর্বের নব নিরীক্ষা, জীবনবোধ ও বাস্তবচেতনার নতুনত্ব, শিল্পাদর্শের ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা চিন্তা প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে তাই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একে বলেছেন, 'কল্লোলযুগ' আর জীবেন্দ্র সিংহ রায় এই সময়টিকে চিহ্নিত করেছেন 'কল্লোলের কাল' নামে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের দশকে এই পত্রিকাগোষ্ঠীর লেখকরা যে আলোড়ন তুলেছিলেন, তা উল্লেখের অবকাশ রাখে না। আর এঁদের হাতেই ভবিষ্যৎ সাহিত্যের নেতৃত্বভার গৃহীত হয়েছিল। সমকালীন বহু সাহিত্যিক বিতর্ক, সমর্থন ও প্রতিবাদ, গ্রহণ ও পরিহারের কেন্দ্রস্থলে ছিল এই পত্রিকা ও তার গোষ্ঠীভুক্ত লেখকরা। তাছাড়া, পরবর্তী বাংলা-সাহিত্যে যে সমস্ত লেখক শেষ পর্যন্ত আত্মস্বাতন্ত্র্যে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রায় কোন না কোন ভাবে এই গোষ্ঠী বা ভাবধারার শরিকানা নিয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের, তথা উপন্যাসের ধারাবাহিক পর্যালোচনায় তাই এই স্বল্পস্থায়ী অথচ সুদূরপ্রসারী সাহিত্যান্দোলনটি পৃথকভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

॥ ২ ॥

"কন্টিনেণ্টাল উপন্যাসের প্রভাবে এবং নিম্নমধ্যবিত্ত আর্থিক দুর্গতির চাপে রোমান্টিক কল্পনাবিলাস প্রবলতর হইয়া তরুণ লেখকদের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেন বস্তিবিলাস হইয়া দাঁড়াইল।"[২]

'কল্লোল যুগে'র সাহিত্যাদর্শ ও প্রেরণা নির্ণয় করতে গিয়ে সাহিত্যের ঐতিহাসিক এই মন্তব্য করেন। এটি বিশ্লেষণ করলে যে দুটি প্রধান প্রেরণার কথা আমরা খুঁজে পাই, তা হলো—(ক) কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের প্রেরণা ও (খ) অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপ। এই দুটি প্রেরণার প্রতিক্রিয়ায় লেখক মনেও প্রকাশের দুটি দিক প্রবলতর হয়ে ওঠে; (ক) রোমান্টিক কল্পনাবিলাস ও (খ) বস্তিবিলাস।

বাংলা সাহিত্যে পশ্চিমী কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের প্রেরণা ও প্রভাবের সূচনা আধুনিক কালের সূচনা থেকেই। বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যাদর্শে পশ্চিমী সাহিত্যের প্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রকাশে ছিল দেশীয় ভাব ও ভাবনার প্রতি নিষ্ঠা। বিশ শতকে 'ভারতী গোষ্ঠী'র লেখকরা সর্বপ্রথম পশ্চিমী সাহিত্যের অনুবাদ করতে শুরু করেন বহুল পরিমাণে। এই প্রবণতাই কল্লোল পর্বে লক্ষণীয়ভাবে পরিবর্ধিত হয়েছিল। ইংরেজি ছাড়াও রুশ, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, ফরাসী প্রভৃতি কথাসাহিত্যিকদের প্রভাবই এঁদের ওপর পড়েছিল বেশিমাত্রায়। রুশ সাহিত্যিকদের মধ্যে রুশ বিপ্লবের পূর্ববর্তীকালেই খ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত কথাসাহিত্যিকরাই এদেশের তরুণ ও বুদ্ধিজীবী মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেকভ ও গোর্কী প্রমুখেরা। বিপ্লব পূর্ব যুগের রুশসমাজ ও মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে সমকালীন বাঙালী জীবন ও সমাজের একটা সাদৃশ্য যেন দেখতে পেয়েছিলেন তৎকালীন তরুণ বুদ্ধিজীবীরা। এই মনোভাবের ইঙ্গিত দেয় 'কল্লোল' পত্রিকার ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'রুশ সাহিত্য ও তরুণ বাঙালী' শীর্ষক প্রবন্ধটি। তিনি লিখেছেন, "রুশ সাহিত্যে বাঙালী দেখেছে, বেদনার সিন্ধু মন্থন করে, জয়মাল্য পরে মানবের অন্তরের বিজয়লক্ষ্মী উঠেছে। ...তার মনে একটা অনুভূতি জেগেছে যে এই বেদনার পথ দিয়েই বুঝি আমাদের যাত্রাপত্র।"

ফরাসী সাহিত্যিকদের মধ্যে, ফ্লোবেয়ের জোলা বাঙালী তরুণ ও বুদ্ধিজীবীদের মনকে আকৃষ্ট করেছিলেন সর্বাধিক। এঁদের দুজনের রচনার মধ্যে প্রকৃতিবাদী জীবনাদর্শ, মনস্তত্ত্ব ও যৌনবাস্তবতার যে বিশিষ্ট প্রকাশভঙ্গী

বিবৃত হয়েছে, 'কল্লোল' পর্বের লেখকদের তা গভীরভাবে প্রাণিত করেছিল। এছাড়াও ছিলেন আর এক ফরাসী মরমী মনীষী—রোঁমা রোঁলা, তাঁর 'জাঁক্রিস্তফ' 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে অনূদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আগামী নবজীবনের যে ইঙ্গিত ক্রিস্তফের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল, তার মধ্যেই এই লেখকরা পেয়েছিলেন তাঁদের আদর্শ কল্পনার প্রেরণা।

স্ক্যাণ্ডিনেভীয় সাহিত্যিকদের মধ্যে জোহান বোয়ার ও নুট হামসুন সেকালের তরুণ বুদ্ধিজীবী কথাসাহিত্যিকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন তাঁদের ভবঘুরে আত্মকেন্দ্রিক বোহেমিয়ান রোমান্টিকতার প্রবল অভিঘাতে। এর সঙ্গে মিশেছিল এঁদের রচনায় আভাসিত যৌনবিদ্রোহের নতুন উচ্চারণ।

ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে কবিতায় টি এস এলিয়ট ও উপন্যাসে ডি এচ লরেন্স, অলডাস হাকসলি, জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, ডরোথী রিচার্ডসন, প্রভৃতির প্রভাব কল্লোলগোষ্ঠী ও তৎকালীন তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। একদিকে পোড়োজমি ও ফাঁপা মানুষের চিত্রকল্পে সমকালীন সমাজ পরিবেশ ও মানুষ তির্যকভাবে ধরা দিয়েছিল ; অন্যদিকে সমস্যা ও তার বিতর্কমূলক আলোচনায় তা এক নতুন মাত্রা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের প্রভাব সে যুগের তরুণ লেখককে কীভাবে প্রণোদিত করেছিল, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' উপন্যাসের নায়কের একটি সংলাপের সাহায্যেই তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যায়। বেদে বলেছে,

> "বাঙ্‌লার কোনে বসে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে, ডাস্টয়ভস্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর করে হাসে। রাতের খাবারটুকু গোর্কীর সঙ্গে একত্রে খাই ; হামসুন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে বসে বন্ধুর মত গল্প করে যায়—জয়ো কপালে যোয়ান তার কমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়, নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ফ্রান্স কতদিন আমার এই ঘরে বসে জিরিয়ে গেছে।"

মধ্যবিত্ত তরুণ জীবনে অর্থনৈতিক দুর্গতির চাপ ও সমকালীন ভারতীয় তথা বাংলার রাজনৈতিক অস্থিরতাও এই যুগের বিশিষ্ট মনোভাবটিকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কিত কার্জনীয় প্রস্তাবের বিরোধিতা করে যে আন্দোলন সমগ্র বাঙলাদেশে একটা অভূতপূর্ব ভাবোন্মাদনার সূচনা করে তার পথ ধরেই সন্ত্রাসবাদী চিন্তা ও কার্যকলাপ

ক্রমশ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় একদিকে যেমন 'স্বদেশী' আন্দোলনের ধারাটি হঠাৎ থমকে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঘা যতীনের পরাজয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও প্রবল ধাক্কা খায়। এরই পরে মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের সংস্কার পরিকল্পনা ও রাউলাট-এ্যাক্টের উপর্যুপরি অভিঘাতে গোটা তরুণ ও যুবসমাজে এক অবরুদ্ধ বিক্ষোভ ও হতাশা একই সঙ্গে জমে উঠতে থাকে। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন কিছুটা সাড়া জাগালেও চৌরীচৌরার ঘটনায় গান্ধীজী তাঁর আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। একটু আগেই ঘটে গেছে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর মারণ যজ্ঞ। দিশাহারা ও হতাশ যুবসমাজ এই সময় আরো এক প্রবল প্রতিবন্ধকের মুখোমুখি হলো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় থেকেই মধ্যবিত্ত চাকুরীজীবী বাঙালীর কাছে চাকরী ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলো। প্রদেশান্তরে চাকরী করার সুযোগ ক্রমশ অনিশ্চিত ও সুদূরপরাহত হলো। সাধারণভাবে কিঞ্চিৎ জমিজমার অধিকারী এবং জমিবিহীন চাকুরীজীবীদেরই সমাজে মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করা হত। এই ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক চাপ তাদের জীবনে এক দারুণ সংকটের স্থচনা করলো। এই হতাশ, নীরন্ধ্র মানসিকতার মধ্যে ফ্রয়েড ও হ্যাভলক এলিসের যুগান্তকারী আবিষ্কার তাকে আরো সমাজবিবিক্ত, আত্মকেন্দ্রিক ও বীক্ষণধর্মী মানসিকতার অধিকারী করে তুললো। এরই মধ্যে আলোক বর্তিকার মতো জেগে রইল কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশবিপ্লব।

এই সামগ্রিক যুগ পরিবেশ ও সাহিত্যিক প্রভাবের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল কল্লোলযুগের মানসিকতা। তাই আশ্চর্য বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল এঁদের চেতনায়। গোর্কীর সঙ্গে হামস্থন, জোলার সঙ্গে রঁলা, স্বদেশে ব্যর্থতার সঙ্গে রুশিয়ার সাফল্য—গোটা যুগের মধ্যেই এক বিমিশ্র ভাবধারার জন্ম দিয়েছিল। বিশের দশক ও তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যে যুগান্তর ও পরিবর্তনের এটাই মুখ্য চেহারা।

সমকালীন ব্রিটিশ সাহিত্য ও যুগপরিবেশের মধ্যেও এই একই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ইংরেজী সাহিত্যেও মহাযুদ্ধ ও বিপ্লবোত্তর কাল, বিশের ও তিরিশের দশক এইরকম বিপরীতমুখী দ্বন্দ্বে আকীর্ণ। ১৯১৪-র মহাযুদ্ধের আঘাত যেমন তাঁদের সাহিত্যে ভিক্টোরীয় যুগের পরিপূর্ণ অবসান ঘোষিত করেছে, অন্যদিকে তেমনি ১৯১৭-র অভিঘাত এক নতুন সমাজের

অভ্যুদয়ের স্বপ্নচ্ছবি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে। বিশের দশকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাই বলা হয়েছে, 'It was a period of confused and vacillating trends'. সমালোচকের ভাষায়, '…it was important as a period of break away, of refusal to accept old forms or ideas at their face value, of hopeful investigation into the problems of finding new ways to unite life and art.[৩] এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে যে উত্তরণ ঘটেছে, তার স্পষ্ট প্রতিফলন পড়েছে ১৯৩০ এর যুগসাহিত্যে—(ক) Realistic Method ও (খ) Clear participation to the political struggle-এর মধ্যে। এরই ফলে উত্তর তিরিশ সাহিত্যিকদের মনে জেগেছে এক নতুন প্রেরণা—'For years there were consistent and often valuable wrestling of thought: how best to grow as a writer while entering more deeply into the needs and aspirations of the common people."[৪]

উত্তরতিরিশ ব্রিটিশ সাহিত্যের এই বিশিষ্ট রূপরেখাটির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও একটি চমকপ্রদ সাদৃশ্য আছে। বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী সঙ্কটের মধ্য দিয়ে বিশের দশকে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্র-যুগের অবসান ঘটানোর চেষ্টা করা হয়েছে বটে, কিন্তু নতুন কোন আদর্শের সুস্থির ভাবমূর্তি দানা বাঁধতে পারেনি। বিশের দশকের এই Confused ও Vacillating trends-ই অবশেষে তিরিশের দশকে গিয়ে একটি মূর্তি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বিশের দশকে কল্লোলীয় বিদ্রোহে পরিবর্তনের যাত্রারম্ভ হলেও, তিরিশের দশকে যখন পরিবর্তন স্পষ্টতর রূপ নিলো, তখন কল্লোলীয় লেখকরা তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারলেন না উপন্যাসে। ছোটগল্পে ক্ষণজীবী মুহূর্তের চিরন্তনীকরণে তাঁরা সার্থক হলেও, সাহিত্যে-পড়া বাস্তবচেতনা ও জীবনাভিজ্ঞতা তাদের উপন্যাসে চরিতার্থতা দিল না। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব কল্লোলের এই তিন প্রথম সারির প্রতিনিধি তাই বাংলা উপন্যাসের ভবিষ্যৎ যাত্রাপথের সঠিক হদিশ দিতে পারলেন না। একই পরিবেশে বর্ধিত অপর তিন লেখকের হাতেই বাংলা উপন্যাসের যাত্রাপথ সুনির্ধারিত হলো, যাঁরা শরৎচন্দ্রকে সার্থকভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এঁদের মধ্যে দুজন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কল্লোলে' প্রকাশিত হয়নি, আর তারাশংকরের প্রথম রচনা 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হলেও, তিনি কল্লোল গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন নি।

"প্রতিযুগ আনে না আপন অবসান/ সম্পূর্ণ করে না তার গান/ অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস রেখে দিয়ে যায় সে বাতাসে,—'পূরবীর' 'অতীতকাল' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যুগান্তর ও কালান্তরের যে ব্যঞ্জনাগর্ভ ইঙ্গিত দিয়েছেন, তার মধ্যেই সাহিত্যের যুগান্তরের সত্যটি ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে শরৎচন্দ্রের নেতৃত্বে যে নতুন পথে 'কল্লোল' যাত্রা শুরু করতে চেয়েছিল, সেই পথে সে তার পদচিহ্ন অক্ষয় করে রাখতে পারলো না। গ্রন্থজাত অভিজ্ঞতা, জীবন সম্পর্কহীন কল্পনাবিলাস কিংবা প্রকৃতিবাদসুলভ বাস্তবনিষ্ঠা তাই তাদের কোন সার্থকতায় পৌঁছে দিতে পারলো না। অথচ এই একই পথে বিভূতিভূষণ অপুতে পেলেন অপরাজিত মানবাত্মার চিরন্তন সত্যের সন্ধান, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের রঙ্গমঞ্চে পরিচিত মানুষের জীবনলীলায় দেখতে পেলেন পুতুলনাচের চিরনূতন ইতিকথা, আর তারাশংকর দেশ ও মানুষের মুক্তির জন্য প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেখতে চাইলেন ধাত্রীদেবতার আদর্শরূপটি।

তাই বাংলা উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ক্রমবিকাশের আলোচনায় আমরা শরৎচন্দ্রের পরেই পৌঁছে যাবো বিভূতিভূষণের রচনায়। অতঃপর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরিক্রমা করে তারাশংকরের রচনায় গিয়ে উপনীত হবো আমাদের যাত্রাতীর্থে।

যাঁরা মুখ্যত 'কল্লোলী'য় লেখক, তাঁদের মনোগত অভিপ্রায় সর্বাংশে সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রতিফলিত হতে পারেনি। তাঁরা চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-অনুধ্যানের জগৎ থেকে সরে এসে বাস্তবজীবনসম্মত আর একটি জগৎ গড়ে তুলতে। তাঁদের রচনায় তাই কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় ও রুক্ষ বাস্তবজীবনপ্রীতির তাগিদে নতুন কালের দলিল রচিত হতে চাইল। কিন্তু মধ্যবিত্তের রোমান্টিক কল্পনা-প্রবণতা এর কোনটাকেই ঠিক আত্মস্থ করতে পারলো না। ফলে তাঁদের বাস্তব-জীবনচর্চা রোমান্টিক কল্পনাবিলাস ও বস্তিবিলাসের রূপ নিল, আর কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাব মনের গভীরে সৃষ্টিশীলতায় আঘাত না করে, রোমান্টিক কবিমনের মনোবিলাসে পরিণত হলো। কল্লোলীয় লেখকদের বাস্তব-জীবনাশ্রিত সাহিত্যপাঠে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানসিক প্রতিক্রিয়ার সাক্ষ্যে, তাঁদের মধ্যবিত্ত সুলভ রোমান্টিক চেতনার বাস্তবপ্রীতি বা বস্তিবিলাসের ছবিটি চমৎকার অভিব্যক্ত হয়েছে।

"আশা করেছিলাম অনেক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে

যে অভাব, যে অসম্পূর্ণতা আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করছে, তার পূরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হচ্ছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হচ্ছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এর বাস্তব-সংঘাত আসেনি। বস্তিজীবন এসেছে, কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও, মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বর্জিত হয়নি, ওই একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খনিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হচ্ছে।"[৫]

এই একই মানসিকতার জন্য প্রেমেন্দ্র মিত্র, যিনি 'কল্লোলীয়'দেরই অন্যতম প্রধান, তিনি জীবনের পাঠ নিতে হামসুন-গোর্কীর পাঠশালায় যেতে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপদেশ দিলে, বিস্মিত মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হয়,—এ দুইয়ে মিলবে কি করে? কেননা, একজনের মধ্যে ভাবের আকাশের ঝড়, আর অপরজনের মধ্যে মাটির পৃথিবীর জীবনের বন্যা। একমাত্র রোমান্টিক ভাববিলাসীই এদের দুজনকে একত্রে মিলিয়ে দিতে পারে।

কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের প্রভাব 'কল্লোলীয়'রা কোন রোমান্টিক ভাবাবেগে গ্রহণ করেছিল, পূর্বে উদ্ধৃত অচিন্তকুমারের 'বেদে' উপন্যাসের উদ্ধৃতিতে তা স্পষ্ট হয়েছে। এর আরো উদাহরণ দেওয়া চলে ওই একই উপন্যাসের অন্যতমা নায়িকা মৈত্রেয়ীর একটি উক্তির সহায়তায়। নায়কের কাঁধে মাথা রেখে মৈত্রেয়ী বলেছে,

> "দান্তের যেমন বিয়াত্রিচে, পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লাসের যেমন লেসবিয়া, মিকালো এঞ্জেলোর যেমন ভিক্টোরিয়া কলোনা—তেমনি আমি তোমার।"

এতে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের কোন ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রই প্রমাণিত হয়নি; বরং মনে হয়েছে, পঠিত সাহিত্য মনের ভাববিলাসকেই বর্ধিত করেছে মাত্র, তা মনের গভীরে গিয়ে কোন সৃষ্টিপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়নি। এরই পাশে বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' উপন্যাসের নায়ক অপুর একটি চিন্তার উল্লেখ করলেই দেখা যাবে যে, কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের প্রেরণা কল্লোলীয়দের মনে কোন গভীর প্রেরণা সঞ্চার করতে না পারলেও, সে যুগের সৃষ্টিশীল চেতনার উদ্বোধনে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। দুটি বালক-বালিকাকে

বিস্কুট-চকোলেট কিনে দিয়ে অপুর প্রতিক্রিয়ার কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেছেন,

> "বাসায় ফিরিয়া তাহার মনে হইল, বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানব-বেদনা। ১৮৩৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, 'সার্ফ' নীতি, জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য-গোগোল, ডস্টয়েভস্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে। সে বেশ কল্পনা করিতে পারে, দাসব্যবসায়ের দুর্দিনে আফ্রিকার এক মরুবেষ্টিত পল্লীকুটির হইতে কোমল বয়স্ক এক নিগ্রো বালক পিতামাতার স্নেহকোল হইতে নিষ্ঠুরভাবে বিচ্যুত হইয়া বহুদূর বিদেশের দাসের হাটে ক্রীতদাসরূপে বিক্রিত হইল, বহুকাল আর সে বাপমাকে দেখিল না, ভাইবোনেদের দেখিল না—দেশে দেশে তাহার অভিনব জীবনযাত্রার দৈন্য, অত্যাচার ও গোপন অশ্রুজলের কাহিনী, তাহার জীবনের যে অপূর্ব ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা সে যদি লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারিত।"

কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের এই বিরাট প্রেরণাই ছিল প্রত্যাশিত, যা তরুণ কল্লোলীয়দের রোমান্টিক ভাবাবেগে পুরোপুরি উপলব্ধিগম্য হতে পারেনি, অথচ সমকালীন বিভূতিভূষণ যা যথার্থতই অনুভব করতে পেরেছিলেন। তাই 'কল্লোলে'র সঙ্গে প্রত্যক্ষত সংস্রবশূন্য হলেও মানিক কিংবা বিভূতিভূষণ কল্লোলযুগীয় চেতনারই যথার্থ উপলব্ধিগম্যতায় উপনীত হতে পেরেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্রমিত্র কিংবা শৈলজানন্দ, তাই 'কল্লোল-কালিকলম' যুগের নিয়মিত লেখক হওয়া সত্ত্বেও ঐতিহাসিক যুগতাৎপর্যটিকে যথার্থভাবে ধরতে পারেন নি। আর তারাশংকরের সাধনায় মাটি ও মানুষের সান্নীপ্য ও 'আনন্দমঠ', 'আঙ্কল টমস্ কেবিন' ও ফরাসী বিপ্লব কিংবা গান্ধীজীর অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলন স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য 'কল্লোলে'র পৃষ্ঠায় লেখা ছাপা হলেই যদি 'কল্লোলী'য় আখ্যা মেলে, তবে তারাশংকর 'কল্লোলী'য়, কেননা তাঁর প্রথম দু'তিনটি গল্প কল্লোলেই বেরিয়েছিল। শরৎচন্দ্রের পরে বাংলা সাহিত্যে যে নতুন অভিমুখিতা দেখা দিয়েছিল, 'কল্লোলে' তার সূচনা হলেও, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় 'কল্লোলীয়'রা তার সার্থক রূপ দিতে সমর্থ হন নি। সমকালীন তিন লেখক, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাশংকরের রচনাতেই সেই দিকপরিবর্তনের চিহ্নগুলি সার্থক ও রূপবান হয়ে উঠেছিল। এই কারণেও

শরৎ-পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনায় এই তিনজনই স্মরণীয়, যুগচেতনার প্রতিনিধিপুরুষ হিসাবে।

উৎস-নির্দেশ

১। বুদ্ধদেব বসু—রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাহিত্য (সাহিত্যচর্চা)।

২। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই (৪র্থ)

৩। Jack Lindsay—After the thirties

৪। ঐ —ঐ

৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখকের কথা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

"আমি কোন বড় ঘটনায় বিশ্বাসবান নই। দৈনন্দিন ছোটখাটো সুখ দুঃখের মধ্য দিয়ে যে জীবনধারা ক্ষুদ্র গ্রাম্য নদীর মত মন্থর বেগে অথচ পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আনন্দের সঙ্গে চলেছে—আসল জিনিসটা সেখানে, কোনো কৃত্রিম প্লট সাজানো, প্যাঁচ কষা, কৃত্রিম সিচুয়েশন তৈরী করা—আমি মানি না। নভেল কেন কৃত্রিম হবে? প্রতিদিনের অমূল্য দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কৃত্রিমতার মালা গাঁথা ও তারই বেসাতি শুধু টেকনিকের বেসাতি হয়ে দাঁড়ায়। কোনো সুস্থ, সতর্ক ও অনলস মনের বিভিন্নমুখী কৌতূহল তাতে চরিতার্থ হয় না।"[১]

দিলীপকুমার রায়কে লেখা এই চিঠিটি 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে বিশেষভাবে লিখিত হলেও, বিভূতিভূষণের সাহিত্যাদর্শের গোটা প্রতিচ্ছবিটি এর মধ্যে ধরা দিয়েছে। 'অপরাজিত' উপন্যাসের দুটি জায়গায় আমরা পাই,

ক. আজকাল আমার মনে হয়—অনুভূতি, আশা, কল্পনা, স্বপ্ন,—এ সবই জীবন।"

খ. "জীবন খুব বড়ো একটা রোমান্স—বেঁচে থেকে একে ভোগ করাই রোমান্স—অতি তুচ্ছতম, হীনতম, একঘেয়ে জীবনও রোমান্স।"

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশক বিভূতিভূষণের সাহিত্যসৃষ্টির স্বর্ণযুগ। এই পর্বেই 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'আরণ্যক' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলি রচিত ও প্রকাশিত হয়েছে। এই পর্বটি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও নানাকারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নদীপ্তির পাশেই তখন বাংলা সাহিত্যে নব ভাবের আবাহনী ধ্বনিত হচ্ছে। একদিকে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবন ও সমাজজিজ্ঞাসার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সাহিত্যে যুগান্তরের ইঙ্গিত আভাসিত করেছেন, অন্যদিকে তৎকালীন তরুণ লেখকেরা কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির মধ্যস্থতায় সাহিত্যক্ষেত্রে নতুনধারা প্রবর্তন করতে উদ্যোগী হয়েছেন। এই পর্বটি সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোলযুগ' নামে কিছুটা চিহ্নিতও হয়ে গেছে। প্রধানত রবীন্দ্রনাথকে

অতিক্রম করে এক নতুন সাহিত্যধারার সৃষ্টি করতে এই লেখকেরা পশ্চিমী সাহিত্যের নানামুখী নিরীক্ষাকে বাংলা সাহিত্যে প্রবর্তন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান, পৃথিবীব্যাপী আর্থিক সংকট, সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সাফল্য, সফল বিপ্লবের সূত্রে গণচেতনার উজ্জীবন, ফ্যাসিজম-এর অভ্যুদয়, ফ্রয়েডের যুগান্তকারী মনস্তত্ত্বচিন্তা, মার্কসীয় ইতিহাস চেতনা, সবকিছু মিলিয়েই গোটা পশ্চিমী জগৎ তখন নানামুখী ভাবনাদ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত ও দোলাচল। রোমান্স ও রোমান্টিকতাকে জীবন থেকে নির্মমভাবে ছেঁটে ফেলে নগ্ন, রূঢ়, রুক্ষ বাস্তবতার প্রবর্তনে নবীন সাহিত্যিকরা পর্যুৎসুক। 'কল্লোলের' পাতায় তখন যুবনাশ্বর 'পটলডাঙ্গার পাঁচালী' লিপিবদ্ধ হচ্ছে। জীবনের অন্ধগলির বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মানবের অমার্জিত জীবনেতিহাসেই সাহিত্য তখন নিবিষ্টচিত্ত, 'বেদে' 'যাযাবর কিংবা পাঁকেই তখন নবীন সাহিত্যের জীবনদৃষ্টি সীমাবদ্ধ। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন ইতিহাসের এই বিশেষ কালসীমায়। কিন্তু আশ্চর্যভাবে ব্যতিক্রান্ত তাঁর সাহিত্যাদর্শ। নিজস্ব তাঁর জীবনদৃষ্টি, স্বতন্ত্র তাঁর প্রত্যয় ও প্রকাশরীতি।

দিলীপকুমার রায়কে লেখা পূর্বোদ্ধৃত চিঠিটির মধ্যে এই অনন্যতা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়টি নিহিত আছে। গোটা নবীন সাহিত্যিক সমাজ যখন জীবনের বড়ো বড়ো আদর্শের ভাঙচুর ও নগ্ন কঠিন বাস্তব জীবন সংগ্রামের প্রতিলিপি রচনায় ব্যাপৃত, তখন বিভূতিভূষণ তাঁর মানসপুত্র অপুর চোখ দিয়ে জগৎ ও জীবনকে এক নবীন অথচ অতি পুরাতন চোখে পর্যবেক্ষণ করলেন। জীবনের ভাঁজে ভাঁজে, তার তুচ্ছতম, হীনতম অকিঞ্চিৎকরতার মধ্য থেকেই উদ্ধার করে আনলেন জীবনসৌন্দর্য ও রহস্যের অপার বিস্ময়ের মায়ালোকটিকে। সাহিত্যসাধনা যখন কয়লাকুঠির কালো মানুষের জীবন সংগ্রাম ও আদিম জীবনবাসনার মনোযোগী পর্যবেক্ষক, পটলডাঙ্গার ঘৃণ্যতম জীবনচর্চার পাঁচালীকার, বিভূতিভূষণ তখনই নিশ্চিন্দিপুরের পাখিডাকা গ্রাম্য পথে মানবজীবনের আর এক পাঁচালী রচনা করলেন। চেনাপরিচিত গ্রাম, পথঘাট, নদীনালা, ফুলফল আর গ্রাম্য ঘর-গৃহস্থালীর অকৃত্রিম চিত্র তুলে ধরে তিনি আবির্ভাব মুহূর্তেই সমগ্র রসিক সমাজের মন কেড়ে নিলেন। যে বিশেষ গুণে তিনি এই অনায়াস-সাফল্য লাভ করেছেন তা সাহিত্যের চিরন্তন সত্যেরই নামান্তরমাত্র। তাই পথের পাঁচালীর অভিনন্দনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, বইটি দাঁড়িয়ে আছে আপন সত্যের ওপরেই। এই সত্যটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বিভূতিভূষণের একটি বিশিষ্ট দান।

নিসর্গজগৎ ও শিশু, বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব সংসারের এই চিরপুরাতন অথচ চিরনতুন বিস্ময়ভরা বিষয় দুটিকেই বিভূতিভূষণ তাঁর সাহিত্যসাধনার প্রধান বিষয়রূপে গ্রহণ করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এ বিষয়ে বিভূতিভূষণের হৃদয়াকাশের ধ্রুবনক্ষত্র। 'আমার কথা' গ্রন্থে 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক রচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন, তাতে বলেছেন যে, প্রকৃতির বিপুলতা ও রহস্যকে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে সার্থকরূপে আনতে পেরেছেন। সর্বপ্রকার কেতাবী বর্ণনার মোহপাশ কেটে বাহুল্যবর্জিত ও অনাড়ম্বর চোখে প্রকৃতিকে দেখেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর নব দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যেক জিনিসটি নতুন করে দেখেছে। বিশ্বমানবের সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতির যোগসূত্রকে আবিষ্কার করেছে, দৃষ্টির সঙ্গেই নবসৃষ্টির রচনা হয়েছে। এমন একটি জীবন্ত সদাজাগ্রত মনের পরিচয় আমরা পাই, পদ্মাবুকের বজরার কামরায় যা নিদ্রিত হয়ে পড়েনি—নির্জনরাত্রে রহস্যময়ী প্রকৃতি যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেন—তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি দেখা হবে—তার আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই বিশিষ্ট প্রকৃতিচেতনা সাহিত্যে যে নতুন উৎসমুখের সন্ধান দিয়েছে তা জীবন ও জগতের সমন্বয়কারী এক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী। বিভূতিভূষণ বলেছেন,

> "জীবনে ও জগতের ব্যাপারে এই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীও রবীন্দ্রনাথের কাব্যে পাই সর্বপ্রথম।...তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মূলে আছে যে প্রগাঢ় অনুভূতি, তা সাধারণ মনের ব্যাপার নয়, চেতনা ও অনুভূতির যে স্তর সাধারণের দুরধিগম্য—তাই তাঁর কাছে আমরা যে লোকের সন্ধান পাই, দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতির পরম্পরায় বহু উর্ধ্বে যে এক অপরূপ আনন্দলোক—তাঁকে পথপ্রদর্শক না পেলে সেটা আমাদের কাছে অপরিজ্ঞাতই রয়ে যেত চিরদিন।"[২]

বিভূতিভূষণের প্রকৃতিদর্শনে রবীন্দ্রনাথই তাঁর পথপ্রদর্শক। দৈনন্দিন তুচ্ছ অনুভূতির পরম্পরার বহু উর্ধ্বে যে আনন্দলোক—তার সন্ধান বিভূতিভূষণও পেয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গুরু। শুধু প্রকৃতির বর্ণনাই নয়, প্রকৃতির মধ্যে থেকে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতা অনুভব করে তার সূত্রে রহস্যের আনন্দলোক নির্মাণ করাই বিভূতিভূষণের অন্বিষ্ট ছিল। আর এই আনন্দলোক রচনার কাজে তাঁর সর্বাপেক্ষা সহযোগী ছিল শিশু, শিশুর দৃষ্টিতে, তার নবীন বিস্ময়ে প্রকৃতিকে দর্শন করলে এই আনন্দ-লোকের খোঁজ অতি সহজেই পাওয়া যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা

সাহিত্যের উদ্বেলিত কল্লোলধ্বনির মধ্যে বিভূতিভূষণ এই নতুন সুরের বাণীবহ। 'পথের পাঁচালী' এই চেতনার পরাপ্রকাশ। অপু এই নতুন চৈতন্যের মানবিক পরাকাষ্ঠা।

॥ ২ ॥

'পথের পাঁচালী' বিভূতিভূষণের প্রথম উপন্যাস ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি। এই উপন্যাসের নায়ক অপু বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য চরিত্র। বিভূতিভূষণের চরিত্র সৃষ্টির মৌলিকতা এই চরিত্রে পরিপূর্ণ সফলতায় আত্মপ্রকাশ করেছে। সাহিত্যে মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করা প্রতিভাবান লেখকের কাজ। একাধিক মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি অত্যন্ত দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব। মৌলিক চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে লেখকের সামনে একটি রক্তমাংসের সজীব মডেল থাকলে তবেই চরিত্র সৃষ্টি সার্থক হতে পারে। তাই বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার অধিকারী বিচিত্র মানুষের সঙ্গে পরিচিত হয়েই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক একাধিক মৌলিক চরিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। কিন্তু বিভূতিভূষণের ক্ষেত্রে বলা যায় যে, তাঁর সাহিত্যে চরিত্রসৃষ্টিতে তেমন কোন বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় না; তাঁর প্রথম মৌলিক চরিত্র অপুই তাঁর নানা রচনায় বারে বারে নবরূপে ফিরে এসেছে। 'দৃষ্টি প্রদীপে'র জিতু বা 'আরণ্যকে'র উত্তমপুরুষ চরিত্রধর্মে অপুরই সগোত্র। আর 'অপরাজিত' অপু কাহিনীরই উত্তরমেঘ। প্রকৃতিপ্রেমিক, আধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন, মানবমমতায় নিবিড় একটি মানুষই এই উপন্যাসগুলির নায়ক, যার আদর্শপুরুষ অপু। এ হিসাবে অপুই বিভূতিভূষণের প্রধান মৌলিক চরিত্র। এই মৌলিক চরিত্রাঙ্কনের মডেল স্বয়ং লেখক নিজেই। এই একই রীতি দেখা যায় শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত চরিত্রের পরিকল্পনায়। শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মপ্রক্ষেপে বিশিষ্ট, শরৎচন্দ্রীয় উপন্যাসের প্রতিনিধিস্থানীয় পুরুষচরিত্র ও নায়ক। আপন জীবনের মডেলেই মৌলিক ও স্বতন্ত্র। শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তের মতোই অপুও বিভূতিভূষণের নায়ক প্রতিনিধি। বিভূতিভূষণের নায়ক কল্পনা, তার মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা, সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতাও বাংলা উপন্যাসের নায়ক পরিকল্পনার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাঁর স্থান অপু চরিত্রের সূত্রেই প্রাপ্তব্য।

॥ ৩ ॥

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত'—এই দুটি উপন্যাস অপুর জীবনবৃত্তান্ত। নিশ্চিন্দিপুরের গ্রামে অপুর জন্মপূর্ব সময় থেকে অপুর যৌবনোত্তীর্ণ কাল পর্যন্ত এই কাহিনীর বিস্তার। অপুর জন্ম, ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু, দুর্গার মৃত্যু,

নিশ্চিন্দিপুর ত্যাগ, কাশীবাস, পিতা হরিহরের মৃত্যু, অপুর কলকাতা বাস, অপর্ণার সঙ্গে বিবাহ ও কাজলের জন্ম, অপর্ণার মৃত্যু, অপুর সংসারবিবাগী প্রব্রজ্যা, পুত্র কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে পুনঃপ্রত্যাবর্তন ও পুনরায় ঘরছাড়া হয়ে বিদেশের পথে বেড়িয়ে পড়া—অপুর জীবনপথের এই বিস্তৃত বৃত্তান্তই এই উপন্যাসদুটির কাহিনীবস্তু। এই কাহিনীর নায়ক অপু পথিকবৃত্তি গ্রহণ করেছে। জীবনের ঘাটে ঘাটে সে ঘুরে বেড়িয়েছে। এক একটি মৃত্যু তার জীবনের এক একটি বাঁধন শিথিল করে দিয়েছে ও পুত্র কাজলের শৈশবের মধ্যে এই পথিকবৃত্তি-জীবনের অপরাজিত রহস্যময়তাই উদ্‌ঘাটিত ও উদ্‌ভাসিত হয়েছে। নিসর্গ প্রকৃতি, তার গাছপালা-ফলমূল-কীটপতঙ্গ, বিচিত্র মানুষ ও তাদের বিচিত্র রহস্য, পুরাণ ইতিহাসের ঐতিহ্যাশ্রয়ী জীবন চেতনা ও বিস্তার, বিস্ময় ও রহস্যের অপার সম্ভার, বিশালতা ও আধ্যাত্মিকতা—সমস্ত কিছুর সম্মিলনে ও সমন্বয়ে অপুর জীবনদৃষ্টি গড়ে উঠেছে। সে যেন গ্রামবাংলার চেনাজানা জগতের মধ্যেই এলডোরাডোর দেশের সন্ধান পেয়েছে। তাই ধূলির মধ্যে মানিক আর বালির মধ্যে নিত্য-নতুন হীরকখণ্ডের সন্ধান পেয়েছে। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী শুধু অপুরই নয়, এ তার পিতা হরিহরেরও। অপু পিতার উত্তরাধিকার হিসাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী তার পুত্র কাজলের মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিয়েছে ; তার আর তিনপুরুষের মধ্য দিয়ে এই ধারাবাহিকতা জীবনদৃষ্টির ক্রমবিকাশের তত্ত্বেই বিভুতিভূষণের পথের পাঁচালী অপরাজিত জীবনরহস্যের সত্যরূপটিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। নিসর্গপ্রকৃতি, পিতা হরিহর, মা সর্বজয়া, দিদি দুর্গা, প্রত্যেকেই অপুর এই বিশিষ্ট মানসিকতার বিকাশে সহায়তা করেছে। কিন্তু নিজ নিজ ভূমিকা শেষ করে তারা প্রত্যেকেই বিদায় নিয়েছে। শুধু অপু এই সমস্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার পুঁজি মূলধন করে জীবনের পথে বেরিয়ে পড়েছে। সে যেন চিরন্তন বন্ধনমুক্ত মানবসত্তারই প্রতীক।

অপু এই কাহিনীর নায়ক, উপন্যাসেরও। গ্রন্থনে অসংলগ্ন, আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি গল্পচ্ছবির সংকলন, এই বইটি অপুর নায়কত্বেই উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে। সমালোচকের ভাষায়,

> "উপন্যাসটিতে ঘটনার সংগতি নেই, সংখ্যানুপাতে বিশিষ্ট চরিত্রের আবির্ভাব স্বল্প। কতগুলি বিক্ষিপ্ত চিত্রের সমষ্টি যেন এ বই। কিন্তু এই ছড়ানো দিনগুলির কেন্দ্রে এক মনোরম দৃষ্টি মেলে দাঁড়িয়ে আছে অপু। তার মধ্য দিয়েই এই বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন দিনগুলি

একটি সুষ্ঠু ঐক্যে ধৃত। অপুর স্বপ্নদৃষ্টির সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে দিনগুলির মালা গাঁথা, একটি মুহূর্তও এই দৃষ্টিশক্তি প্রত্যাহৃত হলে ছিন্ন দিনগুলি হঠাৎ ছিটকে পরস্পরের সঙ্গে অর্থহীনভাবে মাথা ঠোকঠুকি করত। সেই আঘাত থেকে গ্রন্থকে বাঁচিয়েছে অপু। দিয়েছে সুষম রূপ। যথার্থ অর্থেই অপু এ গ্রন্থের নায়ক।"৩

'পথের পাঁচালী' ও 'অপরাজিত' এই দুটি গ্রন্থে বিধৃত বিস্তৃত অপু-জীবনীর ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কতকগুলি স্পষ্ট ধারা ও প্রভাব রয়েছে। গ্রন্থের সূচনা অপুর জন্মপূর্বকালে। তার পিতা হরিহরের দূর সম্পর্কের এক বোন, তার পিসী ইন্দির ঠাকরুণের কাহিনী দিয়ে গ্রন্থের শুরু। ইন্দির ঠাকরুণের স্মৃতিচর্চায় অপুর পূর্বপুরুষদের যে ইতিহাস বিধৃত হয়েছে, তাতে হরিহরের পিতা রামচাঁদ রায়ের সংসার-উদাসীন স্বভাবের যে সূক্ষ্ম অথচ তির্যক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাই পিতা হরিহরের স্বভাবকে অনেকখানি গড়ে তুলেছে। হরিহরের বিবাহের পর স্ত্রীকে বাপের বাড়ি রেখে সুদীর্ঘকাল প্রবাসের অজ্ঞাতবাস তার স্বভাবের মর্মসত্যটিকে ইঙ্গিতে প্রকাশিত করেছে। নিশ্চিন্দিপুরে এই পিতার উত্তরাধিকার ও সংসারের দারিদ্র্য নিয়েই অপুর জন্ম। এরপর তার জীবনের নানাপর্বে, শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে ও যৌবনোত্তীর্ণকালে নানামুখী প্রভাব প্রতিক্রিয়া তার মনটিকে গড়ে তুলেছে। এই সবকিছু প্রভাবের সমবায়ে তার যে জীবন গড়ে উঠেছে, তা মৌলিকতায় বিস্ময়কর। পিতা হরিহর, মাতা সর্বজয়া, দিদি দুর্গা ও সুবিশাল নিসর্গ জগৎ অপুর মনটিকে স্তরে স্তরে গড়ে তুলে তার মানসিক ক্রমবিকাশকে সম্ভবপর করে তুলেছিল।

অপুর পিতা হরিহরের চরিত্রে বিভূতিভূষণের পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। মহানন্দ কথক ছিলেন। তিনি সংসারী ছিলেন না। কবিমন-সম্পন্ন, ভবঘুরে, উদাসীন প্রকৃতির লোক ছিলেন। বৎসরের বেশির ভাগ সময় তিনি বাড়ি থাকতেন না। বাস্তব জীবনের এই কাঠামোর ওপরেই হরিহরের সৃষ্টি। পুত্র বিভূতিভূষণ যেমন মহানন্দের এই স্বভাবের উত্তরাধিকার অর্জন করেছিলেন, তাঁর নায়ক অপুও তেমনি তার পিতার কাছ থেকে এই স্বভাবগুলি আয়ত্ত করেছিল। সেও ছিল কবিমন সম্পন্ন, উদাসীন প্রকৃতির ও ভবঘুরে বৃত্তির মানুষ। এর সঙ্গে ছিল দুটি গুণ আত্মসম্মানবোধ ও কিশোর সুলভ আশাবাদ।

সর্বজয়া সম্পর্কে বিভূতিভূষণ লিখেছেন, "সর্বজয়ার একটা অস্পষ্ট

> ভিত্তি আছে—আমার মা। কিন্তু যারা আমার মাকে জানে, তারাই জানে সর্বজয়ার সবখানি আমার মা নয়।"[৪]

এই সর্বজয়া চরিত্র অপু চরিত্রে প্রভাব ফেলেছে তির্যকভাবে। পিতা হরিহর যেমন তাকে মন গঠন করতে সহায়তা করেছে, সর্বজয়া তেমনি প্রত্যক্ষ ভাবে তাকে কিছু সহায়তা করেনি। কিন্তু ছেলেকে ঘিরে সে যে নানারকম স্বপ্ন দেখতো, সংসারের দিনানুদৈনিক দারিদ্র্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতো, অপুর স্বভাবত স্বাধীন জীবনে তা যেন শৃঙ্খলের মতোই এঁটে বসতে চাইছিল। সর্বজয়ার এই বন্ধনমুখী মনের সান্নিধ্যলাভ করেই সে বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্রতর করে তুলেছিল। এই বন্ধনমুক্ত মনের একটি আশ্চর্য প্রতিবেদন পাই সর্বজয়ার মৃত্যুতে অপুর তাৎক্ষণিক মানসিকতায়,—

> "সর্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ মিশ্রিত-এমন কি মায়ের মৃত্যু সংবাদ প্রথম যখন সে তেলিবাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস···একটা বাঁধন ছেঁড়ার উল্লাস ··অতি অল্পক্ষণের জন্য নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। একি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেবিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য। মা কি তাহার জীবনপথের বাধা? কেমন কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর এবং হৃদয়-হীন তবুও সত্যকে সে অস্বীকার করিতে পারিল না।"[৫]

দিদি দুর্গার প্রভাব অপুর জীবনের একেবারে গোড়ার প্রভাব। শিশু অপু তার শৈশবলীলায় দুর্গারই আড়ালে থেকে তার মুগ্ধ দৃষ্টিতে প্রকৃতির রহস্য রাজ্যের সর্বপ্রথম সন্ধান পেয়েছে। প্রকৃতির রাজ্যে দুর্গাই অপুকে হাত ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু প্রকৃতি সম্পর্কে দুজনের বোধ জন্মায় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের বিশ্লেষণ অত্যন্ত চমৎকার,—

> "অপুর জীবনে যে সমস্ত প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে তার মধ্যে দুর্গার সাহচর্যই প্রথম ও প্রধান। দুর্গাই অতি সহজে তাহাদের খেলাধূলার নেতৃত্ব লইয়াছে; সেই হাত ধরিয়া অপুকে অরণ্য-প্রকৃতির রহস্যময় নির্জনতার মধ্যে লইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, দুর্গা অপুর ন্যায় প্রকৃতির সঙ্গে কোন নিবিড় একাত্মতা অনুভব করে নাই; বন্য ফল ও

উজ্জ্বল লতাপাতা অপেক্ষা কোন নিগূঢ়তর উপহার সে প্রকৃতি দেবীর প্রসারিত হস্তে দেখিতে পায় নাই। কল্পনাপ্রগাঢ়তা, প্রকৃতির ইন্দ্রজালের অনুভূতি ও মন-ব্যাকুল করা হাতছানি—অপুরই নিজস্ব আবিষ্কার।"৭৬

এই তিনটি বিশিষ্ট প্রভাব ছাড়াও, অসংখ্য ছোট-খাটো ঘটনা ও অপরিচিত মানুষের প্রভাবে অপুর মানসিক ভূমিটি গড়ে উঠেছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে সম্পর্কে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। নিশ্চিন্দিপুরে প্রকৃতি, আতুরী ডাইনি বুড়ির সঙ্গে অতর্কিত সাক্ষাৎ, গ্রামের পরিচিত সীমা ছেড়ে প্রথম প্রবাস যাত্রা, শকুনের ডিমের সাহায্যে আকাশে ওড়ার পরিকল্পনা, যাত্রাদলের আবির্ভাব ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা, দুর্গার মৃত্যুর পর ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রভাব, নিশ্চিন্দিপুরের বাস উঠিয়ে কাশীযাত্রা, এই সমস্ত ঘটনাগুলির সম্মিলিত সন্নিপাতে অপুর জীবনের এক একটি জানালা খুলে গেছে। প্রকৃতি পরিচয়ের মধ্য দিয়ে কল্পনার বিকাশ ও তারই সূত্রে এক অনির্বচনীয় রহস্যলোকের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন,—অপু চরিত্রের ক্রমবিকাশের এটিই প্রথম ধারা। শৈশবোত্তীর্ণ কৈশোর ও যৌবনে এই ভিত্তির ওপরেই নব নব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি তাকে এরই তুঙ্গে আরোহণ করিয়ে দিয়েছে। কাশীবাস, হরিহরের মৃত্যু, দারিদ্র্য, বড়লোকের বাড়িতে আশ্রিত গ্লানিবিদ্ধ জীবন-যাপন, লীলার সহানুভূতিপূর্ণ সাহচর্য, সম্পর্কিত দাদামশাইয়ের সঙ্গে মনসাপোতায় চলে যাওয়া, সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যের হাত থেকে মুক্তি নিয়ে স্কুলে পড়া, ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণবোধ, জীবনসংগ্রাম মুখর কলেজ জীবন, মায়ের মৃত্যু, অপর্ণার সঙ্গে বিবাহ, কাজলের জন্ম ও অপর্ণার মৃত্যু, অপুর উদাসীন বৈরাগ্য, জীবনে সাময়িক অবক্ষয়, পথিকবৃত্তি গ্রহণ, সুদূর মধ্যপ্রদেশে স্বেচ্ছানির্বাসন, কলকাতায় পুনরায় প্রত্যাবর্তন, গ্রন্থপ্রকাশ, সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ, পুত্র কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে যাওয়ার পূর্বে লীলার সকরুণ মৃত্যু, বাল্যসঙ্গিনী রানুদির হাতে কাজলকে সমর্পণ করে পুনরায় বিদেশের অজানা পথে নিরুদ্দেশ হওয়া,—অপুর জীবনবৃত্তের সবকটি পরিচ্ছেদেই তার পথিকবৃত্তি সুস্পষ্ট। 'জীবনেরে কে রাখিতে পারে, তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে,—জীবনের এই সার রূপটিই যেন অপু চরিত্রের মধ্যে মূর্ত হয়েছে। কোন মৃত্যুই তার এই পরিক্রমাকে ব্যাহত করেনি, পথ রোধ করে দাঁড়ায় নি। পিতার মৃত্যুর পর কিশোর অপুর মনে হয়েছে,

"যে বাবাকে সকলে মিলিয়া আজ মনিকর্ণিকার ঘাটে দাহ করিতে আসিয়াছিল,—রোগে, জীবনের যুদ্ধে পরাজিত সে বাবা স্বপ্নমাত্র—অপু তাহাকে চেনে না, জানে না,—তাহার চিরদিনের একান্ত নির্ভরতার পাত্র, সপরিচিত হাসিমুখ বাবা জ্ঞান অবধি পরিচিত সহজ সুরে সুকণ্ঠে প্রতিদিনের মত কোথায় বসিয়া যেন উদাস পূরবী সুরে আশীর্বচন গান করিতেছে—কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ···।"*[৭]

অপর্ণার মৃত্যু বা লীলার মৃত্যুতেও সে অভিভূত হয়নি। তার যে স্বভাব অতি শৈশবেই প্রকৃতির সাহচর্য গড়ে উঠেছিল, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ভূগোলে আকর্ষণ যার মধ্যে একটা বিশালতার ভাব সঞ্চার করে দিয়েছিল, যা স্বভাবতই একটা আধ্যাত্মিক বোধে মণ্ডিত,—সেই চেতনার বাধাহীন অপরাজিত মহিমাই তার চরিত্রবৈশিষ্ট্য। দারিদ্র্য, হীনতা, তুচ্ছতার গ্লানি কখনোই তার এই বিরাট মনটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। উদাসীন বৈরাগ্যের বেপরোয়া প্রাণশক্তি তার জীবনে একবারই মাত্র রাহুগ্রস্ত হয়েছিল, যখন চাঁপদানীতে সে স্কুল মাষ্টারী করতো। অনেক খোঁজখবর নিয়ে প্রণব তার কাছে পৌঁছে, তার জীবনযাত্রার যে ছবি দেখেছিল, সেখানেই যেন একবারের মতো অপু তার জীবনপথ থেকে সাময়িক ভ্রষ্ট। স্বর্গগামী যুধিষ্ঠিরের স্বপ্নকালীন নরকবাসের মতোই অপুর জীবনের এই অংশটুকু,

"যাইবার সময় তাহার (প্রণব) মনে হইল, সে অপু যেন আর নাই—প্রাণশক্তির প্রাচুর্য একদিন যাহার মধ্যে উছলিয়া উঠিতে দেখিয়াছে, আজ সে যেন প্রাণহীন, নিস্তেজ। এমনতর স্থূল তৃপ্তি বা সন্তোষবোধ, এ ধরণের আশ্রয় আঁকড়াইয়া ধরিবার কাঙালপনা কই অপুর প্রকৃতিতে তো ছিল না কখনো।"[৮]

শুধু প্রণবের পরোক্ষ সাক্ষ্যেই নয়, অপুর প্রত্যক্ষ দিনযাপনের প্রাণধারণের মধ্যেও এই গ্লানির ছাপ স্পষ্ট।

"দিনের পর দিন একই রুটিন। বৈচিত্র্যও নাই, বদলও নাই,··· যাইবার মত জায়গা নাই, করিবার মত কাজও নাই—চুপচাপ বসিয়া বসিয়া সময় কাটে না। ছুটির দিনগুলি তো অসম্ভবরূপ দীর্ঘ হইয়া পড়ে।"[৯]

সাহিত্যিক স্বভাবের অপু, কবিমনের অপু, ছুটির আনন্দে দিশাহারা অপুর এই সাময়িক বৈকল্য কিছুটা অস্বাভাবিক ঠেকলেও অকারণ নয়, কল্লোলীয় যুগের জীবন চেতনা বিভূতিভূষণের কবিকল্পনাকে পুরোপুরি পর্যুদস্ত করতে

না পারলেও, তিনি তো আর যুগছাড়া নন। তাই অপুর এই সাময়িক মানসিক অবক্ষয়, স্যাকরার দোকানে তাসের আড্ডায় ইতর লোকের সঙ্গে অবকাশযাপন, আশ্রয় ছেড়ে বাইরে যাবার অনিশ্চয়তায় উদ্বেগবোধ, সবকিছুই অপুর জীবনে ক্ষণকালের জন্ত হলেও ছায়াপাত করেছে।

কিন্তু অপু কিশোর বয়সেই যে পথের দেবতার অনির্বাণ বীণার তারে তার পথিকবৃত্তির সংবাদী স্বরটি শুনেছিল, ইতিহাস-ভূগোলের দূরদিগন্তে যার কল্পনা নিত্য সব অপরিচিতের পরিচয়লাভে উৎসাহী, লক্ষকোটি গ্রহতারকামণ্ডিত মহাকাশের অসীম রহস্যময় হাতছানি যে নিয়ত অনুভব করে, তার অপরাজিত মূর্তিই শেষ পর্যন্ত ভাস্বর হয়ে থাকে। সে জেনেছে বেঁচে থাকার মধ্যেই, অতি তুচ্ছতম বস্তুর মধ্যেও জীবনের অপূর্ব রহস্য, তার রোমান্স, একটি ধানের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দুতে সে বিশ্ববৈচিত্র্যের বর্ণালী দেখতে পায়। দেশছাড়ার আগে প্রণবকে লেখা চিঠিতে এই অনুভূতিই সে প্রকাশ করে যায়। অপু সম্পর্কে তাই যথার্থ ই সমালোচক বলেন,

> "অপু কর্মী-পুরুষ নয়। সে জীবন-পলাতক যাযাবরও নয়। তার জীবনে ঘটনা কম। অনুভূতি ও চিন্তা বেশি—কিন্তু তার সমস্ত অনুভূতি ও চিন্তার মূলে আছে অদম্য জীবন পিপাসা। সে introvert, কিন্তু morbid introvert নয়, তার জীবন সাধনার মধ্যে কোন রুক্ষতা নেই, তিক্ততা নেই, তাই সে জীবনের ক্ষুদ্রতর অংশটিকেও সর্বান্তঃকরণে উপভোগ করতে পারে—জীবনের তুচ্ছতম ঘটনা থেকে। সামান্যতম লাভক্ষতি থেকে। 'পথিকে পথিকে পথের আলাপন' থেকে মহামূল্যবান অভিজ্ঞতার ঋদ্ধিলাভ করতে পারে।"[১০]

বাংলা উপন্যাসের ধারাবাহিকতায় অপু গোরার মতো কর্মীপুরুষ নয়। কল্লোলীয় নায়কবৃন্দের মতো যাযাবরও নয়। সে অনন্য। সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় মানুষের কর্মচঞ্চল সক্রিয়তা তার মধ্যে নেই বললেই চলে। বঙ্কিমী-আদর্শ পুরুষের স্বরূপ-সন্ধানও তার মধ্যে মেলে না। আবার রোমান্টিক বোহিমিয়ানিজমের প্রবর্তনায় সে জীবন-পলাতকও নয়। শ্রীকান্তের মতোও আবার সে বত্রিশ বছর বয়সেই জীবনের অপরাহ্নবেলার অস্তরাগরঞ্জনে বৈরাগী নয়। তার জীবনপ্রীতি অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর। শিশুর বিস্ময় তার যৌবনোত্তীর্ণ চোখেও সমান মায়াঞ্জন মাখিয়ে রাখে। এ একটা আলাদা জীবনবোধ। বিভূতিভূষণের জীবনবোধের সঙ্গে অদ্বৈত সম্পর্কে জড়িত।

যে শিশুর চেতনা বিভূতি সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক প্রেরণা, তারই মানবায়ন এই অপু।

> "যে যাই ভাবুক, আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—শুধু বিশ্বাস করা নয়,—যেন দেখতেও পাই, হাজার বছর পরে ঐ আমার শৈশব আনন্দভরা ভিটার মত আর কোনো ঘরে কোনো দেশে জন্মে অপূর্ব আনন্দভরা শৈশব যাপন করব—পৃথিবীর মায়ের বুকে নতুন হয়ে ফিরে আসবো।"[১১]

বিভূতিভূষণের এই বিশিষ্ট চেতনারই রূপায়ণ অপু। কাজলকে নিয়ে নিশ্চিন্দিপুরে যাবার পর, যৌবনোত্তীর্ণ অপু ঘাটে বসে বনদেবী বিশালাক্ষীর সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথনে বলেছে,

> "তুমি কে?
>
> —আমি অপু।
>
> —তুমি বড় ভাল ছেলে। তুমি কি বর চাও?
>
> —অন্য কিছুই চাইনে, এ গাঁয়ের বনঝোপ, নদী, মাঠ, বাঁশবাগানের ছায়ার অবোধ, উদগ্রীব, স্বপ্নের আমার সেই যে দশ বৎসর বয়সের শৈশবটি তাকে আর একটিবার ফিরিয়ে দেবে দেবী?"[১২]

কাজলের মধ্যেই অপু তার এই শৈশবকে ফিরে পেয়েছে, রানুদি কাজলকে প্রথমে দেখে চমকে উঠে ভেবেছিল, এ বুঝি অপু আবার তার শৈশবে ফিরে গেছে। অপুর এই কামনাই কাজলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে অপরাজিত জীবনের প্রমাণ রেখেছে। কাজল পাখি খুঁজতে খুঁজতে তার পূর্বপুরুষের ভাঙা ভিটায় গেলে—

> "এক ঝলক হাওয়া যেন পাশের পোড়ো ঢিবিটার দিক হইতে অভিনন্দন বহন করিয়া আনিল—সঙ্গে সঙ্গে ভিটার মালিক ব্রজ চক্রবর্ত্তী, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়, ঠাকুরদাদা হরিহর রায়, ঠাকুরমা সর্বজয়া, পিসিমা দুর্গা— জানা অজানা সমস্ত পূর্বপুরুষ দিবসের প্রসন্ন হাসিতে অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—এই যে তুমি—আমাদের হয়ে ফিরে এসেছো, আমাদের সকলের প্রতিনিধি যে আজ তুমি—আমাদের আশীর্বাদ নাও—বংশের উপযুক্ত হও।
>
> ... ...
>
> হঠাৎ সেই সময় রানুর মনে হইল, অপু ঠিক এমনি দুষ্টু মুখের ভঙ্গি করিত ছেলেবেলায়—ঠিক এমনটি।

যুগে যুগে অপরাজিত জীবন-রহস্য কি অপূর্ব মহিমাতেই আত্মপ্রকাশ করে।

খোকার বাবা একটু ভুল করিয়াছিল

চব্বিশ বৎসরের অনুপস্থিতির পর অবোধ বালক অপু আবার নিশ্চিন্দিপুরে ফিরিয়া আসিয়াছে।"[১৩]

দেশ ছেড়ে বিদেশের দিকে, সূর্যোদয় ছেড়ে সূর্যাস্তের দিকে, জানার গণ্ডি এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে যে প্রসারিত পথে পথের দেবতা প্রসন্ন হাসিতে একদা অবোধ বালকের চোখের সামনে দিগন্তের পট উন্মোচন করে দিয়েছিলেন, সেই যাত্রাপথ কখনোই শেষ হতে পারে না। যুগ যুগান্তরে বংশ-পরম্পরায় তাই মানুষ অপরাজিত ধারাবাহিকতায় অগ্রসরমান। তার জীবন-সম্বিৎসা অনন্ত।

অপুর সমসাময়িক দুই নায়ক শ্রীকান্ত ও অমিতরায়। বাইরের চেহারায় তারা স্বতন্ত্র হলেও, শ্রীকান্ত ও অমিত সগোত্র। উভয়েই এক ধরণের অকাল প্রৌঢ়তায় আচ্ছন্ন। তফাৎ এই যে, শ্রীকান্ত দেখে বেশি, বলে কম, অমিত কতটুকু দেখেছে জানি না, কিন্তু বলেছে অনেক। তবু অমিত রায় নয়, শ্রীকান্তই এযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় মধ্যবিত্ত বাঙালীর অবক্ষয়ের চিহ্ন-বাহী মানসিকতার প্রতিনিধি। অপু ও এই মানসিকতারই প্রতিনিধিস্থানীয়, তবে শ্রীকান্তের উল্টোপিঠ। রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের সুশীলচন্দ্র ও সুবলচন্দ্রের মধ্যে যেন এই দুই চরিত্রের প্রতীক আভাসিত হয়েছে। বালক হয়েও সুশীলের চেতনায় প্রৌঢ়ত্বের প্রতি লোলুপতা, আর সুবলচন্দ্র প্রৌঢ়বয়সেও বালকত্বের অভিলাষী। শ্রীকান্ত বাল্যবয়স থেকেই এক ধরণের বিষণ্ণ প্রৌঢ়তার ধূসরতায় ছায়াচ্ছন্ন। আর অপু তার যৌবনোত্তীর্ণ কালেও শৈশবস্বপ্নে বিভোর। কিন্তু এক ব্যাপারে দুজনেই সমধর্মী। জীবনের চলমান ঘটনাস্রোতের সঙ্গে দুজনেই শিথিল-সংলগ্ন। চলমান জীবনস্রোতের তারা দর্শকমাত্র। জীবনের ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে তারা এগিয়ে গেছে। কোথাও নোঙর ফেলেনি। একালের চলমানতাই এদের জীবনধর্ম। জীবনসংসক্ত না হলেও জীবনমুখী।

উৎস নির্দেশ :—

১। পরিচয়—১ম বর্ষ, মাঘ, ১৩৩৮

২। বিভূতিভূষণ—আমার কথা! রবীন্দ্রনাথ।

৩। চিত্তরঞ্জন ঘোষ—বিভূতিভূষণ।

৪। বিভূতিভূষণ—তৃণাঙ্কুর।
৫। ঐ—অপরাজিত।
৬। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
৭। বিভূতিভূষণ—পথের পাঁচালী।
৮। ঐ—অপরাজিত।
৯। ঐ—ঐ
১০। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—ভূমিকা, বিভূতি রচনাবলী (২য়)
১১। বিভূতিভূষণ—স্মৃতির রেখা।
১২। ঐ—অপরাজিত।
১৩। ঐ—ঐ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

বিশ শতকের তিরিশের দশকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কথাসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এস্.-সি ক্লাসের অঙ্ক অনার্সের ছাত্র থাকাকালীন বন্ধুদের সঙ্গে বাজি রেখে তিনি ১৯২৮ সালে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় অতসীমামী গল্পটি প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আরো পরিণত হয়ে তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা আর হয়ে উঠলো না। তিনি পুরোপুরি সাহিত্যিক হয়ে গেলেন অনেক আগেই এবং ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৭ এর মধ্যে প্রকাশিত 'জননী', 'দিবা-রাত্রির কাব্য', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' এই উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়ে তাঁকে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হলো।

ঠিক যে সময়ে সাহিত্যে তাঁর আত্মপ্রকাশ, সেই সময়টা বাংলা সাহিত্যের এক বিশেষ ক্ষণ। বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের উদার সর্বসাম্প্রদায়িক, অধ্যাত্মবাদী মানবতা-বোধ ও ঐতিহ্যাশ্রিত রোমান্টিকতার প্রতিবাদী একদল তরুণ বাঙ্গালী লেখক প্রধানত পশ্চিমী সাহিত্যের বাস্তবতার অনুবর্তনে এক নতুন সাহিত্য বিবেক ও সাহিত্য-বিষয়কে এদেশের সাহিত্যে সঞ্চারিত করার এক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন 'কল্লোল-'কালিকলম'-'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকার মধ্যস্থতায়। কোন কোন সাহিত্যিক এই সময়টিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'কল্লোল যুগ' আখ্যাও দিয়েছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুলচন্দ্র নাগ, প্রভৃতি তৎকালীন তরুণ লেখকরা ছিলেন এই নব-আন্দোলনের পুরোধা-পথিক। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই-সময়কালীন লেখক হলেও 'কল্লোলে' তাঁর রচনা প্রকাশিত হয় নি, বরং তাঁর প্রথম রচনা তথাকথিত গতানুগতিক সাহিত্য পত্রিকা 'বিচিত্রা'তেই প্রকাশিত হয়। 'কল্লোল-যুগ'-এ অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন, 'মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙিয়ে 'বিচিত্রায়' চলে এসেছে, পটুয়াটোলা ডিঙিয়ে পটল-ডাঙায়। আসলে সে 'কল্লোলে'রই কুলবর্ধন।' বুদ্ধদেব বসু তাঁর ইংরেজী গ্রন্থ 'An acre of green grass' গ্রন্থে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'belated

Kallolian বলে অভিহিত করে তাঁর রচনাকে 'of Kallol in spirit' বলে সনাক্ত করেছেন।

দেখা দরকার কল্লোলযুগ, বাংলা সাহিত্যে কোন নতুনত্বের প্রবক্তা? কোন বিশেষ যুগ লক্ষণে সে লক্ষণাক্রান্ত? মনোধর্মে ও প্রকাশভঙ্গিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কতখানি তার সগোত্র? এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর মিললেই বাংলা কথা সাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথার্থ পরিচয় ও স্থান নির্দেশিত করা সম্ভব হবে।

"১৯২৫ থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত কালটি বিশ্বসংকটেরও একটি তমিস্রাঘন পর্ব। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের—সোভিয়েত সাম্যবাদ এক নূতন সভ্যতা? এ প্রশ্ন অবশ্য উদিত হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীব্যাপী তখন আর্থিক সংকট। ফ্যাসিস্ট-দানবতার তখন দাপট। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশে ও সাহিত্যে ও তখন পর্বটা শুধু রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর্ব নয়। ইওরোপের প্রথম যুদ্ধোত্তর পর্বের অশ্রদ্ধাকে (সিনিসিজম) বাঙালী নাকীসুরে ও বর্ণচোরা ভাবালুতায় ঢালাই করেছিলেন অতি-আধুনিক সাহিত্যিকেরা—নকল হলেও এটা একটা পর্ব-লক্ষণ। কারণ প্রতিবাদের সুর সার্থকভাবে তুলেছিলেন শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ লেখক গোষ্ঠী। কৃতী তরুণ লেখকেরা অনেকেই সন্ধান করছিলেন কৃতিত্বের পথ। কিন্তু যুগের নিজস্ব রূপ বা নিজেদের বাণীরূপ তখনো তাদের চেতনায় প্রতিভাত হয়নি।······অন্যদিকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো স্রষ্টা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অকৃত্রিম জীবনবোধ ও বিস্ময় রসের পাত্র নিয়ে উপস্থিত হয়ে সেই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সুরকে যেন মিথ্যে বলে প্রমাণ করে দিতে চাইলেন। কিন্তু যে বিক্ষোভ শতাব্দীর নাড়ীতে নাড়ীতে জমেছে—দেশের পাঁজরে, পাঁজরে যার দাগ পড়েছে—তা এভাবে মিথ্যা হয়ে যায় না একথা বলাই বাহুল্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হন এই সত্যকে ঘোষণা করে—রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য সুষমাবাদে আর তার কুলোয় না। অতি আধুনিকের প্রতিবাদ এবার নাস্তিকের বিদ্রোহে রূপায়িত হল, আর মানিকের বিদ্রোহী প্রতিভা যুগের সেই সঞ্চিত বিক্ষোভকে যে রূপদান করলো তা বাংলা সাহিত্যে তার পূর্বে বা পরে এখন পর্যন্ত আর কারো দ্বারা সম্ভব হয়নি। কারণ প্রতিভার অধিকারী আর কেউ সে যুগ-ব্যাধিকে এমন করে অনুভব করতে পারেন নি।"[১]

বিশ্বব্যাপী যুগসংকটের পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যে ভাববদলের একটি রূপরেখা ওপরের উদ্ধৃতিতে ধরা পড়েছে। বিশ শতকের বিশ ও তিরিশের

দশকের মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পথ থেকে নিজেদের মুক্ত করে সাহিত্যের প্রাঙ্গনে আর এক বিদ্রোহী বাণীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মানসিক ও যুগগত পটভূমিকা এইটিই। কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-র নবীনতার উৎস এইখানে। এদেরই পুরোধা 'কল্লোল'। কিন্তু 'কল্লোল' কতখানি স্বকীয় ও কতখানি বিদেশী সাহিত্য ও ভাবধারার দ্বারা আহৃত, এ প্রশ্ন স্বতই উঠে পড়ে, যখন দেখা যায় তাদের অগ্রবর্তী সাহিত্যেকেরা সকলেই ইউরোপীয় সাহিত্যের ধরণে এক নবীন বাস্তবতাকে বাংলা সাহিত্যে আমদানী করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। অথচ যে পরিমাণ বাস্তবজীবনবোধ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পুঁজি থাকলে এই বাস্তবতাকে যথাযথভাবে সাহিত্যে রূপায়িত করা যায়, তার পরিমাণে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল এঁদের। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানসিকতা হয়ত এঁদের অধিগত ছিল, কিন্তু সাধারণ নিচুতলার মানুষের জীবন ও জীবনবোধের পুঁজি ছিল এঁদের অতি অল্প। তাই বহু ক্ষেত্রেই এঁদের বাস্তবতা ভাবালুতা ও রোমান্টিক আতিশয্য মাত্রেই পর্যবসিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'বেদে' উপন্যাসটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। একদিকে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত ও অন্যদিকে হামসুনের ছন্নছাড়া জীবনবোধ,—দুইয়ের প্রভাবে অচিন্ত্যকুমারের কল্পনায় যে বেদের জীবনচিত্র গড়ে উঠেছে, তাকে বাস্তবতার প্রতিমূর্তি রূপে লেখক প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেও, তা হয়ে উঠেছে অতিমাত্রায় অবাস্তব ও বই পড়ার অভিজ্ঞতার সারাৎসার। এই চেতনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্তাকেও আলোড়িত করেছিল। তিনিও তাঁর স্বকালে 'কল্লোলে'র কাছে অনেক কিছু আশা করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর পূর্ণ হয়নি। তিনি বলেছেন—

"আশা করেছিলাম অনেক, কিন্তু ক্রমে ক্রমে টের পেলাম সাহিত্যে যে অভাব যে অসম্পূর্ণতা আমাকে তীব্রভাবে পীড়ন করেছে তার পুরণ হচ্ছে না। শৈলজানন্দের গ্রাম্য ও কয়লাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরূপ—কিন্তু শুধু ছবিই হয়েছে। বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব-সংঘাত আসেনি। বস্তি-জীবন এসেছে কিন্তু বস্তিজীবনের বাস্তবতা আসেনি—বস্তির মানুষ ও পরিবেশকে আশ্রয় করে রূপ নিয়েছে মধ্যবিত্তেরই রোমান্টিক ভাবাবেগ। মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তবতা আসেনি, দেহ বড় হয়ে উঠলেও মধ্যবিত্তের অবাস্তব রোমান্টিক প্রেম বাতিল হয় নি, ওই-একই রোমান্স শুধু দেহকে আশ্রয় করে খানিকটা অন্যভাবে রূপায়িত হয়েছে।"[২]

কল্লোলীয়দের রচনায় বাস্তবতার ছবি শুধুমাত্র যে ছবি হয়েছিল, বস্তির

মানুষ ও জীবন পরিবেশকে নিয়ে রচিত কাহিনীতে মধ্যবিত্ত ভাবালুতাই যে শেষ পর্যন্ত ক্রিয়াশীল ছিল, তার মূলে ছিল এই শ্রেণীর লেখকদের সাহিত্য মানসের বিশিষ্টতা, যা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী মনের কাছে আশ্চর্য স্বচ্ছভাবে ফুটে উটেছিল। তরুণ লেখক মানিককে অগ্রজ সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনকে দেখার পাঠ নিতে হামস্থন গোর্কীর পাঠশালায় যেতে বলেছিলেন কিন্তু তার প্রতিক্রিয়ার কথা স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ই অনবদ্যভাবে বিবৃত করে বলেছেন,

"হামস্থনের দু একখানা বই পড়েছিলাম। প্রেমেন বাবুর এই চিঠি পড়ে গোর্কির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করতে যাই। মনে আছে 'মাদার' পড়তে পড়তে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হামস্থন আর গোর্কিকে প্রেমেনবাবু মেলাবেন কি করে?"

আমার তখন হামস্থনেও আপত্তি ছিল না, গোর্কিতেও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ভাবের আকাশের ঝড় আর মাটির পৃথিবীতে জীবনের বন্যার পার্থক্য কি ধরা না পড়ে পারে?"

কল্লোলীয়দের সম্পর্কে এই ক্ষোভ নিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা জানিয়েছেন,

"নিজের জীবনের বিরোধ ও সংঘাতের কঠোর চাপে ভাবালুতার আবরণ ছিঁড়ে ছিঁড়ে জীবনের যে কঠোর নগ্ন বাস্তবরূপ দেখেছি—সাহিত্যে কি তা আসবে না? এই বাস্তব জীবন যাদের—সেই সাধারণ বাস্তব মানুষ?"[৩]

নিজের এই জিজ্ঞাসারই উত্তর দেবার অভিপ্রায়েই তিনি সাহিত্য করেছেন। "লেখা ছাড়া অন্য কোন উপায়েই যে সব কথা জানানো যায় না সেই কথাগুলো জানাবার জন্যই আমি লিখি"—এই স্পষ্টভাষণ তাই তাঁর মুখেই শোভা পায়। উত্তর বিশ ও অনাগত চল্লিশ, বিংশ শতাব্দীর এই সংকটলগ্নের যুগব্যাধিকে শুধু অনুভব করাই নয়, তাকে প্রকাশ করার একান্ত তাগিদেই তিনি লেখক। অত্যন্ত অল্প বয়সেই তিনি রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পড়ে ফেলেছিলেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মনোভাব তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন,

"স্কুল জীবনেই কয়েকবার শ্রীকান্ত পড়েছিলাম। 'চরিত্রহীন' আমাকে অভিভূত বিচলিত করেছিল। আট দশবার বইখানা পড়েছিলাম তন্ন তন্ন করে। বাংলা সাহিত্যের কত দৃঢ়মূল সংস্কার ও গোঁড়ামি যে চূরমার হয়ে গিয়েছিল এই উপন্যাসে।...শরৎচন্দ্রের কাহিনীতে পতিতা ও অসতীর চরিত্র রয়েছে, বড় হয়ে উঠেছে তাদের মনুষ্যত্ব, অনুচিত প্রেমও হয়েছে প্রেম। তখনকার আর কোন লেখক এটা পারেন নি।"[৪]

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই মনোভাব মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনের ভিত্তিমূল গড়ে তোলার প্রথম ধাপ, কিন্তু সবটা নয়। যেমন এই পর্বের আর এক লেখক জগদীশ গুপ্তের ক্ষেত্রে। তিনিও শরৎচন্দ্রের পথেই যাত্রা শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিক্ত, রুক্ষ ও নৈরাশ্যবাদী হয়ে গিয়েছিলেন। পঙ্কিলতালিপ্ত নরনারীর পবিত্রতার জন্য সূচনায় আকুলতা বোধ করলেও, শরৎচন্দ্রীয় পরিণাম জগদীশ গুপ্তের অভীষ্ট ছিল না। অন্ধ নিয়তি জগদীশ গুপ্তের প্রত্যেক চরিত্রের আকুল আকাঙ্ক্ষাকে পরাভূত করে দিয়েছে নিষ্ঠুর উদাসীনতায়। 'অসাধু সিদ্ধার্থ' ও তার উত্তরা-চরিত্র প্রসঙ্গত স্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথের অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য-সুষমাবাদকে উত্তীর্ণ হয়ে, শরৎচন্দ্র ও জগদীশগুপ্তের বাস্তবতা ও বক্র জীবনদৃষ্টি আয়ত্ত করে, 'কল্লোল' পর্বের যথার্থ যুগধর্মকে অন্তরে নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেন। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে শরৎচন্দ্রের পর বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্করের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও এক নতুন দিগ্‌দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এবং বাংলা উপন্যাসের নায়ক-চরিত্রের ক্রমবিকাশের ধারায় তাঁর রচনাও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য সংযোজন করতে সমর্থ হয়েছে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'র নায়ক শশীকে মানিক-সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় নায়ক রূপে অনায়াসেই গ্রহণ করা চলে। যাকে মানিক-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলে, উপন্যাসটি সেই পর্বেই রচিত। এটি তাঁর তৃতীয় উপন্যাস এবং চতুর্থ প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁর প্রথম রচনা 'জননী' নায়কমুখ্য রচনা নয়, চারুর কাহিনীই এর উপজীব্য এবং জননীত্বই চারুর প্রধানতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র নায়ক হেরম্ব অবশ্য নানা দিক দিয়েই বিশিষ্ট। কিন্তু তবু তাকে মানিক-সাহিত্যের প্রতিনিধিস্থানীয় বলে মানা যায় না। কারণ রচনাটির উপন্যাসত্ব সম্বন্ধে স্বয়ং লেখকেরই যথেষ্ট দ্বিধা ছিল, চরিত্রদের সামগ্রিকতা সম্বন্ধেও। গ্রন্থের নিবেদনাংশে লেখক বলেছেন,

"দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনও মনে হয়, বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক (তা না মনে হয়ে পারে না—লেখক)—তখন মনে করতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক-কাহিনী।…চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।"

হেরম্বও তাই পরিপূর্ণ মানুষ নয়, মানুষের মানসিকতার কিছু কিছু অংশের প্রতিচ্ছবি। তাছাড়া হেরম্বের জীবনবীক্ষাও সামগ্রিক নয়। তার পারি-

পার্শ্বিকও সামাজিক বাস্তবতায় পরিবৃত নয়। 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সমকালীন রচনা 'পদ্মানদীর মাঝি'র নায়ক কুবের কেবলমাত্র কাহিনীর প্রয়োজনটুকু মিটিয়েছে মাত্র, কিন্তু লেখকের ভাবজীবনের সামগ্রিক প্রতিফলন তার মধ্যে পড়েনি। 'পদ্মানদীর মাঝি' ও নানাভাবে প্রশংসিত ও স্বীকৃত হলেও এটিকে কোনমতেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসের সম্মান দেওয়া যায় না। কারণ যে সামগ্রিক জীবনবোধ উপন্যাসের প্রাণ, তার সম্পদে রচনাটি অপেক্ষাকৃত দীন। পদ্মাতীরের ধীবরদের তথ্যনিষ্ঠ জীবনচিত্র আঁকতে বসেও এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিমনই যেন প্রাধান্য পেয়েছে। দরিদ্র জীবনের সংগ্রামশীলতা ক্ষণে ক্ষণেই হারিয়ে গেছে এক রহস্যময় ভাবতরঙ্গের পৌনঃপুনিক আবির্ভাবে এবং হোসেন মিয়া ও তার ময়নাদ্বীপের অত্যাশ্চর্য কল্পনায়। তাই সমাজ-পরিবেশ ও ব্যক্তির নিরন্তর সম্পর্ক ও সংঘর্ষ, লেখকের জীবনবোধ ও জীবনদর্শন যে চরিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত ও প্রকাশিত হয়, সেই নায়ক চরিত্র 'পদ্মানদীর মাঝি'তেও সার্থকরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি।

শশী ডাক্তারের চরিত্রটি সব দিক দিয়েই এই নায়কসুলভ গুণগুলি অঙ্গীকার করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের নায়কচরিত্রের বিবর্তনের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের সক্রিয় নায়ক ক্রমশ ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের হাতে নিষ্ক্রিয় ও দ্রষ্টায় পর্যবসিত হয়েছে। 'শ্রীকান্তে' এই বিবর্তনধারা একটি চরম শীর্ষ স্পর্শ করে বাংলা উপন্যাসের নায়ককে আপাত উদ্দেশ্যহীন, ভবঘুরে ও জীবনাভিজ্ঞতার সঞ্চয়কারীতে পর্যবসিত করে দিয়েছিল। এই শ্রেণীর নায়করা ঘটনার অসহায় ও নিষ্ক্রিয় সাক্ষীমাত্র। কর্মোদ্যোগের ঐকান্তিকতায় তারা বীর্যবান নয়, কিংবা পতনের শোচনীয়তায় ট্র্যাজিকও নয়। তারা নায়ক হয়েও অ-সাধারণ নয়, সাধারণ বা অতি সাধারণ মানুষ, লেখকের জীবনদর্শনের মাধ্যমমাত্র। অনেকক্ষেত্রেই লেখকের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আইডেনটিক্যাল। তারা লেখকের Objective ভাবনার প্রতিফলন নয়, Subjective ভাবনার চিত্রায়ন।

॥ ২ ॥

'পুতুলনাচের ইতিকথা' ১৯৩৬ (?) খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি লেখকের তৃতীয় উপন্যাস। এই রচনাটির জন্ম বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন,

"লিখতে শুরু করেই আমার উপন্যাস লেখার দিকে ঝোঁক পড়ল। কয়েকটি গল্প লেখার পরেই গ্রাম্য এক ডাক্তারকে নিয়ে আরেকটি গল্প ফাদতে বসে কল্পনায় ভিড় করে এলো 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র উপকরণ এবং কয়েকদিনে

একটি গল্প লিখে ফেলার বদলে দীর্ঘদিন ধরে লিখলাম এই দীর্ঘ উপন্যাস-এ ব্যাপারের সঙ্গে সাধ করে বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার সম্পর্ক অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। মোটামুটি একটা ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলাম যে, সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়।”[৫]

'অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহ' কাটিয়ে উঠে স্পষ্ট বাস্তবের জীবনসম্মত প্রত্যক্ষতায় সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহে শুধু 'পুতুলনাচের ইতিকথা'ই নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব কটি উপন্যাসই রচিত হয়েছে। 'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে তিনি উপন্যাসের বৈজ্ঞানিক ভিত্তিভূমি, জীবনবোধের ব্যবহারিক পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ ও যুক্তিধর্মিতার ওপরই বেশি জোর দিয়েছেন। 'পুতুলনাচের ইতিকথা, যে বয়সের রচনা, সে বয়সের মানসিক সংকটের বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন,—

"ভদ্র জীবনকে ভালবাসি, ভদ্র আপনজনেরই আপন হতে চাই। বন্ধুত্ব করি ভদ্রঘরের ছেলেদের সঙ্গেই, এই জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা স্বপ্নকে নিজস্ব করে রাখি। অথচ, এই জীবনের সঙ্কীর্ণতা, কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা, প্রকাশ্য মুখোশ-পরা হীনতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মনটাকে বিষিয়ে তুলেছে।

এই জীবন আমার আপন অথচ এই জীবন থেকেই মাঝে মাঝে পালিয়ে ছোট লোক চাষাভুষোদের মধ্যে গিয়ে যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচি। আবার এই ছোটলোকদের অমার্জিত রিক্ত জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপে অস্থির হয়ে নিজের জীবনে ফিরে এসে হাঁফ ছাড়ি।

বাড়তে বাড়তে এই সংঘাত প্রথম যৌবনে অবর্ণনীয় প্রচণ্ডতা লাভ করে।”[৬]

একদিকে ভদ্রলোকদের ভদ্রজীবনের কৃত্রিমতা, যান্ত্রিকতা ও মুখোশ-পরা হীনতা আর অন্যদিকে ছোটলোক চাষাভুষোদের জীবনের রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতার চাপের পরস্পর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগ্র মন এক অবর্ণনীয় সংকট ও সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিল। একদিকে 'দিবারাত্রির কাব্যের' হেরম্বর বিচিত্র জটিল মন, অন্যদিকে 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের ও তার প্রতিবেশীদের জীবনযাত্রার রুক্ষ কঠোর নগ্ন বাস্তবতা,—এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশী ডাক্তার। যে মূলত গ্রামের ছেলে, উত্তরাধিকার ও পরিবেশসূত্রে সংকীর্ণতা যার মনের

প্রধান বৈশিষ্ট্য, কলকাতায় ডাক্তারি পড়তে এসে তার মনের পরিমার্জনা ঘটলো অনেকটা, তবু পূর্বসংস্কার একেবারে ঘুচলো না। কিন্তু নতুন সংস্কারের চোখে সে বাংলার আসল-জীবনপ্রবাহ, গ্রামকে দেখলো এবং জীবন সম্পর্কে পাঠ গ্রহণ করলো। শুধু শশীই নয়, তার স্রস্টাও যেন জীবনের রঙ্গমঞ্চে পুতুল-মানুষের নাচ-গান-অভিনয়ের ইতিকথাটি পড়ে ফেলতে সমর্থ হলেন। শশী চরিত্রের স্বরূপ, তার মানসিক ক্রমবিকাশ ও তার দ্বিধা-সংশয় ও আশা-আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক নানা জায়গায় মন্তব্য করেছেন,

ক. "শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট-ভাগ আছে। একটিতে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নেই; অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে একথা কেউ টের পাইবে না যে তাহার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার পদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবী প্রবৃত্তির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারী এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে।

শশীর চরিত্রের এই দিকটা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বাবা গোপাল দাস। গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি বেচাকেনা ও টাকা ধার দেওয়া অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি।...

এমনি বাপের শাসনে শশী মানুষ হইয়াছিল। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল। গ্রাম্য গৃহস্থের সংকীর্ণ স্বাস্থ্যহীন জীবনযাপনের মোটামুটি একটি ছবিই ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার সীমা।"

খ. "কলিকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু। বন্ধুটির নাম কুমুদ, বাড়ি বরিশাল। লম্বা কালো চেহারা, বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাব।......এই একটিমাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একেবারে বদলাইয়া গেল। যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাহার মনকে পুরিয়া সিল্ করিয়া দিয়াছিল কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনেকগুলি জানলা দরজা কাটিয়া বাহিরের আলো-বাতাস আনিয়া দিল, অন্ধকারের অন্তরাল হইতে মনকে তাহার বাহিরের উদারতায় বেড়াইতে যাইতে শিখাইয়া দিল।"

গ. "প্রথমটা শশী একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল। মাথা ঘামাইয়া ঘামাইয়া

জীবনকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া মানুষ এমন একটা বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে? জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন? জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মত বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত অশিক্ষিত নরনারী, ডোবা পুকুর, বনজঙ্গল মাঠ, বাকি জীবনটা তাহাকে এখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্রেরী পর্যন্ত যে এখানে নাই। ক্রমে ক্রমে শশীর মন শান্ত হইয়াছে। সে তো গ্রামেরই সন্তান, গ্রাম্য নরনারীর মধ্যে গ্রামের মাটি মাখিয়া গ্রামের জলবায়ু শুষিয়া সে বড় হইয়াছে। হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়। কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগা নয়। শহরের অভ্যাস যতটা পারে বজায় রাখিয়া বাকিটা সে বিসর্জন করিতে পারিল। কুমুদ ও বইয়ের কল্যাণে পাওয়া বহু বৃহত্তর আশা আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে ক্রমে সে চিন্তা ও কল্পনাতে পর্যবসিত করিয়া ফেলিতে পারিল।"

গাওদিয়া গ্রামের সন্তান শশীর মানসিক ইতিহাসের রূপরেখা ছিল এইরকম। একদিকে গ্রামের সংস্কার, অন্য দিকে তার কলকাতায় পরিমার্জিত মন,—এই দুইয়ের সংযোগে-সংঘাতে ভরা মনের বিচিত্র গতিপ্রকৃতির ইতিবৃত্ত এই 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। বাসুদেব বাঁড়ুজ্জের ছোট ছেলের দুর্ঘটনা, হাসপাতালে যাওয়ার নামে কুসংস্কারাচ্ছন্ন আপত্তি, পঞ্চানন চক্রবর্তীর এই দুর্ঘটনার সময়কে ঘিরে পাঁজি-পুথির নির্দেশ ব্যাখ্যা, যাদব পণ্ডিতের সূর্যবিজ্ঞানের সংস্কার, ইচ্ছামৃত্যুর ঘোষণা, সমস্ত কিছুই শশীডাক্তারের সচেতন বিজ্ঞানবুদ্ধিকে আঘাত করে। কিন্তু সে সেগুলিকে পুরোপুরি অস্বীকার করতেও পারে না। বিশেষ করে যাদবের ইচ্ছামৃত্যুর ঘটনার নেপথ্যে আত্মহত্যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েও সে চুপ করে যায় আর যাদবের টাকাতেই গড়ে তোলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত হাসপাতাল। কোন এক আশ্রিতের শিশুর অকালমৃত্যুতে ব্যথিত শশী গৃহে বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যবিধি-প্রচলিত করতে গিয়ে কুসংস্কারের অপরিসীম বাধার প্রতিরোধ পেয়ে প্রচণ্ড আত্মধিক্কারে মনে করে,

"না সে ডাক্তার নয়। ব্যবসাদার। বাহিরে সে টাকা কুড়াইয়া বেড়ায়, বাহিরে সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার ভাড়া করা সৈনিক। গৃহে তাহার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মৃত্যুর আধিপত্য।"

এর বিপরীতে আছে আর এক শশী, জীবন যার কাছে অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ,

রহস্যময়, যে শশী সূর্যাস্ত দেখার জন্য তালবনের মাটির টিলায় দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে, গ্রামের সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে বিলাত যেতে চায়, পরাণের বৌ কুসুমের সঙ্গে এক আশ্চর্য রোমান্টিক খেলায় মেতে ওঠে।

শশী বক্তৃতা দেয়, হাসপাতাল গড়ে তোলে, রোগ সারায়, বই পড়ে, কিন্তু সে তবুও জীবনের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে না। সে যা যা করতে চায়, তাই অকৃতার্থ হয়ে থাকে। বাড়িতে স্বাস্থ্যবিধি-প্রচলন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়। বোন বিন্দুকে তার বিকৃত জীবন থেকে তুলে এনে সুস্থ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় বীভৎস হয়ে ওঠে। এই পৌনঃপুনিক অচরিতার্থতা ক্রমশই তাকে নিস্পৃহ, নিরাসক্ত, দর্শকমাত্রে রূপান্তরিত করে দেয়। তার উপলব্ধিতে ক্রমেই একটি মর্মান্তিক সত্য স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়,

"যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে।"

ক্রমেই সে নিজেকে এবং সমস্ত মানুষকে পুতুলনাচের পুতুল হিসাবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, যাদের সর্ব ক্রিয়াকলাপই এক অনির্দেশ্য বাজিকরের গোপন পরিচালনায় সংঘটিত হয়ে থাকে। তাই কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ তার কাছেই অজানা থাকে এবং যখন তা প্রকাশ পায়, তখন আর তাতে প্রাণ থাকে না। হাসপাতাল ছেড়ে, বিলাত যাওয়ার যে বাসনায় সে উদ্যোগ-আয়োজন শুরু করে, অভাবিতপূর্ব বিপাকে পড়ে তা বিপর্যস্ত হয়ে যায়! শশী-চরিত্র ক্রমশই সব কিছুকে মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়। জীবনের রঙ্গমঞ্চে সে একই সঙ্গে বাজিকরের হাতের পুতুল ও নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। বাংলা উপন্যাসের নায়কের ক্রমবিকাশে সে আধুনিক নায়কের এক অত্যাশ্চর্য ও নিঃসংশয় প্রতিনিধিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। উপন্যাসের একেবারে শেষে তাই লেখক বলেন,

"জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়িঘর ডোবাপুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল, শ্রীনাথের দোকানের সামনে, বাঁধানো বকুলতলায়, কায়েত পাড়ার পথে। যামিনী কবিরাজের বাহিরের ঘরে হামানদিস্তার ঠক্‌ঠক্ শব্দ শশী আজও শুনিতে পায়; এ বাড়ির মানুষের ফাঁক মানুষে পূর্ণ করিয়াছে। যাদবের বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে জঙ্গলে, পরাণের বাড়িতেও এখনো লোক

আসে নাই। তার ওপাশে তালবন, তালবনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।"

উদ্যমী, কর্মচঞ্চল, সক্রিয় শশী তার জীবনের পরিক্রমা-পথে ক্রমশঃ তার সমস্ত উদ্যম হারিয়ে শান্ত, নিষ্ক্রিয় জীবনরঙ্গমঞ্চের দর্শকমাত্রে পর্যবসিত হলো। জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পরিকল্পনা অচরিতার্থ হয়ে গেছে। কুসুমের সঙ্গে তার সম্পর্কের স্বরূপ যখন তার নিজের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তখন সে কুসুমের কাছে পেয়েছে একধরণের প্রত্যাখ্যান, বিন্দুকে সুস্থজীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সে হয়েছে বিব্রত, যাদব পণ্ডিত, সেনদিদি, পিতা গোপাল,—সবাই মিলে তার জীবনের সমস্ত বিশ্বাস ও ভাবনাগুলিকে তছনছ করে দিয়েছে। ক্রমে ক্রমে তার মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে নিস্তেজ ভাব। সর্বশেষে সে চেয়েছে বিলাত যাত্রার ব্যবস্থা করে শেষবারের মতো নিজের জীবনীশক্তিকে পুনরুদ্ধার করতে। ডাক্তারের চোখ দিয়ে চেয়েছে গ্রামের অস্বাস্থ্যকে দূর করতে, কিন্তু কোনকিছুতেই সে সফল হয়নি। কিন্তু তবু শশীর জীবন নৈরাশ্যে পর্যবসিত হয়নি, জীবনের রঙ্গমঞ্চে পুতুলনাচের ইতিকথা উপলব্ধি করেও সে সিনিক হয়ে যায়নি। তবু শশীর চোখ মানুষ খুঁজে বেড়ায়, নিজের অচরিতার্থতা ভুলতে চায় মানুষের জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে। 'কল্লোলের' বিদ্রোহবিলাস বা জগদীশগুপ্তের নৈরাশ্য সত্ত্বেও বাংলা উপন্যাসের নায়কের ধারায় শশী জীবনবিমুখ, জীবনপলাতক নয়; আপন জীবনে অচরিতার্থ হলেও মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনায় সে আশাবাদী। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে শরৎচন্দ্র, বাংলা উপন্যাসেয় নায়ক সামাজিক শ্রেণী হিসাবে রাজা-মহারাজা-জমিদার-অভিজাত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত থেকে ক্রমশ অবতরণ করেছে সাধারণ মানুষের জীবনের সমতলে। উদ্যোগী ও উদ্যমী মানুষ ক্রমশ বহির্ঘটনার তরঙ্গ থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র করে আত্মনিমগ্ন ও আত্মনিবিষ্ট হয়েছে। জীবনের চলমান স্রোতের বাইরে নিজেকে রেখে সে জীবনের অনন্ত রূপবৈচিত্র্য নিরীক্ষণ করেছে। কিন্তু জীবনপ্রীতি তাদের সর্বত্রই বিস্তৃত ও ব্যাপক। শ্রীকান্তের জীবনবীক্ষা অপুর মধ্যে নতুন মাত্রায় বিবর্তিত হয়েছে। শশীতে তারই আর এক রূপ। অপু বিস্ময়ের চোখে জীবনকে দেখেছে, শশী দেখেছে বৈজ্ঞানিকের চোখে। উভয়েই বিচিত্র জীবনের অন্তহীনতায় তল পায়নি, কিন্তু মানবজীবনের অনন্ত সম্ভাবনায় উভয়েই প্রত্যয়ী। বাংলা-উপন্যাসের নায়ক তার বিবর্তনের ধাপে ধাপে

শ্রেণীরূপ পরিবর্তিত করলেও, মানুষ হিসাবে তাদের বিশ্বাসে কোন বদল ঘটেনি। যে জীবনপ্রীতির প্রবর্তনায় প্রথম নায়কের যাত্রারম্ভ, পরিণামের মুখেও সেই জীবনপ্রীতি অপরিবর্তিত, অক্ষয়।

উৎস নির্দেশ

১। গোপাল হালদার—মানিক প্রতিভা—পরিচয়, পৌষ, ১৩৬৩

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—লেখকের কথা।

৩। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য করার আগে।

৪। ঐ, ঐ

৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—উপন্যাসের ধারা।

৬। ঐ ঐ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

১৩৩৪ সনের ফাল্গুন ও ১৩৩৫ সনের বৈশাখ মাসে 'কল্লোল' পত্রিকায় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুটি গল্প প্রকাশিত হয়—'রসকলি' ও 'হারানো সুর'। তাই এই সময়টিকেই বাংলা সাহিত্যে তারাশংকরের আবির্ভাবলগ্ন হিসাবে গ্রহণ করা চলে। স্বয়ং তারাশংকরও লিখেছেন,

"এই ১৩৩৫ সালের বৈশাখ মাস থেকেই আমার সাহিত্যিক জীবনের কাল গণনা শুরু করব।[১]

এই দুটি গল্প রচনা ও প্রকাশের আগে অবশ্য কবিতা ও নাটকে তারাশংকরের সাহিত্যসাধনার হাতেখড়ি হয়েছিল। নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহে তাঁর নাটক 'মারাঠা তর্পণ' কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হবার জন্ত সুপারিশপ্রার্থী হয়েছিল। কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত নির্বাচিত হয়নি। এতে ভগ্নমনোরথ তারাশংকর সাময়িকভাবে গ্রামসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করে সাহিত্যজীবন থেকে কিছুদিনের জন্য দূরে থাকেন। এই গ্রামসেবার সূত্রে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি আসার সুযোগ তারাশংকরের সাহিত্যিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এই জীবনকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েই তারাশংকর তাঁর প্রথম গল্প 'রসকলি' লিখে ফেললেন। তাঁদের জমিদারীরই একটি মহালে কমলিনী বৈষ্ণবীর আখড়ায় বৈষ্ণবীকে দেখলেন। তাঁর সমস্ত কল্পনাকে মন্থন করে জেগে উঠলো তার গল্প। তিনি বলেছেন,

"গল্প পেলাম।

আমার নায়িকা মঞ্জরী। জীবদেহের সরোবরে পদ্মের মত জীবন নিয়ে ফুটল। শুধু আমার গল্পের নায়িকা মঞ্জরীই ফুটল না—আমার মনে হল, আমি কেমন করে আচম্বিতে পৃথিবীর মায়াপুরীতে এটা ওটা নাড়তে নাড়তে সোনার কাঠি কুড়িয়ে পেলাম। যার স্পর্শে অসাড় মানুষ ফুটে ওঠে ফুলের মত। গল্প লেখার ওইটেই একটা বড় সমস্যা। সব হয় কিন্তু বেঁচে ওঠেনা—জেগে ওঠেনা।"[২]

সেকালের বিশিষ্ট একটি সাহিত্যপত্রিকায় এই গল্পটি পাঠিযে তিনি প্রায় বছরখানেক অপেক্ষা করে গল্প ফেরৎ নিয়ে এলেন, তারপর আকস্মিকভাবে 'কল্লোলে'র ঠিকানা সংগ্রহ করে গল্পটি 'কল্লোলে' পাঠালেন এবং গল্পটি

মনোনীত হলো। 'কল্লোলে'র প্রেরণায় তিনি আরো একটি গল্প লিখলেন 'হারানো সুর'। 'কল্লোলে' প্রকাশিত এই দুটি গল্প লিখেই তাঁর যাত্রারম্ভ।

কিন্তু যাত্রা শুরু করেই তিনি কিছুদিনের জন্ত সাহিত্যজীবন থেকে দূরে সরে যান। কৈশোরকাল থেকেই তিনি দেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই রাজনৈতিক চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে ১৯২১ সালের গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদিয়ে তিনি কারাবরণ করেন এবং কারাবারেই তিনি 'চৈতালি ঘূর্ণি' ও 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুটি রচনা করেন। ১৯৩১ সালে প্রকাশিত 'চৈতালি ঘূর্ণি'ই তাঁর প্রথম উপন্যাস। এরপর তাঁর সাহিত্যজীবন পূর্ণমাত্রায় শুরু হয় এবং একের পর এক রচিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর গল্প ও উপন্যাসের গ্রন্থগুলি।

॥ ২ ॥

'কল্লোল' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হলেও, মনোধর্মে তারাশংকর কতখানি কল্লোলীয় তা বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। 'কালিকলম' পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি গল্প সম্পর্কে তারাশংকরের মানসিক প্রতিক্রিয়া তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন।

"আলোটা বাড়িয়ে দিলাম। চোখে পড়ল অদ্ভুত নামের একটা লেখা এবং লেখকের নামটা অদ্ভুত না হলেও বিচিত্র। 'পোনাঘাট পেরিয়ে', লেখক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। পড়ে ফেললাম গল্পটি। বিচিত্র বিস্ময়পূর্ণ রসমাদকতায় মন মদির হয়ে গেল।··· ওলটালাম পাতা। আবার পেলাম একটি গল্প। গল্পটির নাম মনে নেই। লেখক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। অদ্ভুত। বীরভূমকে এমনি করে কলমের ডগায় অক্ষরে অক্ষরে সাজিয়ে রূপ দেওয়া যায়।

··· ··· ···

তবু একটা কথা মনে হয়েছিল মনে হয়েছিল—গল্পগুলির আত্মা যেন জৈবিক বেগের প্রাবল্যে বেশী অভিভূত; পরাভূত হয়েছে বললে ও অত্যুক্তি হয় না। এমনকি ঐ আবেগের সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব তার স্বাভাবিক ধর্ম, তারও অভাব রয়েছে বলে মনে হল। জীবদেহ আশ্রয় করেই জীবনের বাস। কিন্তু সে তো তাকে অতিক্রম করার চেষ্টার মধ্যেই মানবধর্মকে খুঁজে পেয়েছে।

সেইখানেই তো নিজেকে পশুর সঙ্গে পৃথক করে জেনেছে। ইচ্ছে হল এমনি গল্প লিখব। সত্যকারের রক্তমাংসের জীবদেহে ক্ষুধা আর তৃষ্ণা—তার কামনার ধারার সঙ্গে মিশেই চলেছে। জীবন চলেছে একটি স্বতন্ত্র ধারায়। কোথাও জিতছে, কোথাও হারছে।"[৩]

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মধ্যেই তারাশংকরের সাহিত্যিক মানসের স্বাতন্ত্র্যের ছাপটি মুদ্রিত হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ কল্লোল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি। তাঁদের রচনাকে প্রীতির চোখে দেখলেও, তাঁদের জীবনবোধকে তারাশংকর পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি। যে সমাজদেহে শিথিলমূল রোমান্টিক বোহেমিয়ানিজম্ যে বিদ্রোহবিলাস, যে রুক্ষনগ্ন বাস্তবের বস্তুতান্ত্রিক অনুকরণ-প্রিয়তা 'কল্লোলের প্রাণধর্ম ছিল, 'কল্লোলে'র লেখক হয়েও তারাশংকর তা থেকে আশ্চর্যরকম মুক্ত ছিলেন। শুধু 'কল্লোলই বা কেন, যে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার 'কল্লোলে' বর্তেছে, শ্রীকান্তের ভবঘুরে ভ্রষ্টস্বভাব, তার থেকে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁর চরিত্ররা যেমন প্রাণশক্তির স্বাস্থ্যে ভরপুর, তেমনি সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে সদাজাগ্রত গভীর আত্মীয়তায় বাঁধা। জনৈক সমালোচক তাই যথার্থই তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

> "...কল্লোল গোষ্ঠীর তরুণ লেখকদের অবক্ষয়ধর্মী দ্বিধাগ্রস্ত জীবন-চেতনার পটভূমিতে তারাশংকর নিয়ে এলেন এক সুস্থ, সবল ও ঋজু জীবনবোধ, জীবনের রস ও রহস্যের এক আদিম প্রাণবন্ত চেতনা।"[৪]

এই 'সুস্থ সবল ও ঋজু জীবনবোধ' ও 'জীবনের রস ও রহস্যের আদিম প্রাণবন্ত চেতনা' প্রকাশ করতে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিচিত্রতর ক্ষেত্রে পদচারণা করেছেন। কখনো ক্ষয়িষ্ণু জমিদারীর সামন্ততান্ত্রিক অস্তরাগে তাঁর রচনা রঞ্জিত হয়েছে, কখনো বা নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বে তা হয়েছে আলোড়িত, বৈষ্ণবের কুঞ্জে, মহাজনপদাবলীর মূর্ছনায় তা কখনো উদাস হয়েছে, আবার কখনো বা বেদে সাপুড়ে, ডোম-কাহার, রাজবংশী-বাউড়িদের আদিম জীবন-ধারার প্রাণশক্তির রহস্য চেতনায় তা বিচিত্র হয়ে দেখা দিয়েছে 'দারিদ্র্যে' মহামারীতে, মন্বন্তরে,—জীবনের মহতী বিনষ্টি ও বিপুল অপচয়ের মধ্যেও তাঁর এই সুস্থ জীবনবোধ কখনও হারিয়ে যায়নি। গ্লানি ও যন্ত্রনার গরলে আকণ্ঠ মানুষের নীলকণ্ঠ মূর্তি তাঁর চেতনায় বারেবারে উদ্ভাসিত হয়েছে। এই খানেই কল্লোলীয়দের সঙ্গে তাঁর মস্ত তফাৎ। পুঁথি পড়া অভিজ্ঞতায় কন্টিনেণ্টাল সাহিত্যের ধাঁচে তরুণ লেখকেরা জীবনের যে বাস্তব ছবি আঁকতে চেয়েছিলেন,

তাতে জীবধর্ম প্রকাশ পেলেও জীবন প্রকাশ পায়নি, জৈবিকতা প্রাধান্য পেলেও জীবনবোধ ধরা দেয়নি। অভিজ্ঞতার বিস্তারে, জীবনবোধের গভীরতায়, রক্তমাংসের জীবদেহে প্রাণের রহস্যকে অনুধাবন করার প্রয়াসে, স্বাদেশিকতা ও মর্তপ্রীতির গভীরমূল প্রত্যয়ে তিরিশের দশকে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় এক স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত ব্যক্তিত্ব।

'কল্লোলে' রচনা প্রকাশ না করেও, মানসিকতায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কল্লোলীয়দের সগোত্র। যদিও স্বয়ং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কল্লোলীয়দের জীবনবোধ ও বাস্তবতাবোধ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন ও তাঁদের বস্তুতান্ত্রিক রচনার মধ্যে মধ্যবিত্তের জোলো রোমান্টিক ভোগবিলাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করে বেদনা বোধ করেছেন, তথাপি, বুদ্ধিবাদী জীবন সমালোচনা কিংবা মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসায় তিনি ছিলেন কল্লোলেরই সগোত্র। বলা চলে যে, কল্লোলীয়রা যা হতে চেয়েছেন, অথচ পারেননি, মানিক বন্দ্যোপাধায় তারই প্রতিমূর্তি। গোর্কী-হামসুনের পাঠশালায় জীবনের পাঠ নিলেও, তাঁর চেতনায় ব্যক্তিচিত্তের দ্বিধা, ব্যক্তিত্বের সংকট, জীবনরঙ্গমঞ্চে মানুষের পুতুলরূপের চেতনাই অধিক পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর নায়ক শশী ডাক্তার তাই চারপাশের সমাজের ঘটনায় চিন্তার জগতে যতখানি আলোড়িত হয়েছে, ততখানি সক্রিয়ভাবে মানবের দুঃখমোচনে ব্রতী হতে পারেনি। বলা যায় যে, মানিক সাহিত্যে সমাজ-সংসক্ত, জীবন ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পেতে পারে—নি, বিশ ও তিরিশ দশকের বিশিষ্ট যুগ পটভূমিকায়। বিভূতিভূষণ অবশ্য কল্লোলীয় ছিলেননা। তাঁর নিসর্গ ও মানবজীবনপ্রীতিও ছিল সংশয়াতীত। তবুও তাঁর অপু যতখানি কল্পনাপ্রবণ, ব্যক্তিসত্তার গভীরে আত্মনিমগ্ন, ততখানি সমাজঘনিষ্ঠ নয়। তাই তার অপরাজিত জীবনপরিক্রমা তারই নিজস্ব, তার সঙ্গে গোটা সমাজের আপামর মানুষের কোনো স্পষ্ট সম্পর্ক নেই। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা রূপে পৃথক হলেও, স্বরূপত কল্লোলীয়ধর্মী। সমকালীন লেখক হয়েও কল্লোলে রচনা প্রকাশ করেও তারাশংকর এঁদের থেকে পৃথক।

অথচ তারাশংকর এইপর্বে আকস্মিক বা অসম্ভব নয় ; তাঁর নিজস্ব জীবন পরিবেশ ও জীবনাভিজ্ঞতাই তাঁকে তাঁর স্বাতন্ত্র্যে স্বাভাবিকভাবেই বিভূষিত করেছিল। বীরভূম জেলার লাভপুরের ক্ষয়িষ্ণু জমিদারবংশের সন্তান এই মানুষটির শৈশব-কৈশোর সময়টি কেটেছে গ্রামবাংলার পরিবেশে। একদিকে নদীনালা, আকাশ-প্রান্তর, মাটি আর মাটির কাছাকাছি মানুষ যেমন তাঁর চেতনার গভীরে মিশেছিল, অন্যদিকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহা তাঁর মনের

গভীরে এক বলিষ্ঠ ও প্রত্যয়শীল জীবনবোধ গড়ে তুলেছিল। এই বিশিষ্ট জীবনবোধ একক ব্যক্তিত্বের আত্মকেন্দ্রিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে একাত্মবোধ করেই আপন চরিতার্থতা খুঁজে পেয়েছিল। তারাশংকরের সামগ্রিক রচনাবলীতে তাঁর এই মানসিকতা স্পষ্ট। 'জলসাঘর রায়বাড়ি'র গল্পে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারতন্ত্র, ছোটগল্পে বৈষ্ণব কুঞ্জ ও পদাবলীর উদার মূর্ছনার পাশেই আদিম প্রাণশক্তির প্রচণ্ড প্রবর্তনা, বীরভূমের কাহার বা সাপুড়ে বা বেদেদের জীবনচর্চা, লোকবিশ্বাস ও লোকসংসারের অনুবর্তন, তাঁর রচনার মধ্যে-এক মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ, আঞ্চলিক বিশিষ্টতা এনে দিয়েছে। এই জীবনবোধ রোমান্সের স্পর্শমুক্ত না হলেও, রোমান্টিক ভাববিলাসমাত্র নয়। আর এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশপ্রেমের চেতনা, যা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উত্তাপে উত্তপ্ত। তিনি এ সম্বন্ধে নিজেই বলেছেন,

> "একসময় কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে রামপুরহাট অঞ্চলে আলাপ হয়েছিল বিপ্লবীবীর নলিনী বাগচীর সঙ্গে। তিনিই আমারে জীবনক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমের বহ্নিকণা আমার মনে জ্বালিয়েছিলেন। পরাধীন দেশকে বৈদেশিক শসানমুক্ত করবার সংকল্প ছিল তাঁর যজ্ঞাগ্নির মত লেলিহান।...তারপর এলো উনিশশো একুশ। একটা যুগান্তর ঘটল ভারতের রাজনৈতিক জীবনক্ষেত্রে। আমার জীবনক্ষেত্রেও এল।...১৯২০ সালের মহাত্মাজীর অহিংস আন্দোলনের আদর্শগত রোমান্টিসিজম আমার কল্পনাপ্রবণ মনকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে।.. স্বাভাবিকভাবেই আমার জীবনে সাহিত্যের দিক থেকে ওই আবেগ আমাকে আকর্ষণ তখন বেশী করত। আরও একটা দিক আকর্ষণ করেছিল—সেটা হল মানব-জীবনের মৌলিক নীতিবাদের সঙ্গে এই অহিংস আন্দোলনের একাত্মতা।"[৫]

অভিজ্ঞতার বিপুল বিস্তার, প্রকৃতি ও মানুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ও দেশপ্রেম ও আদর্শবাদের সুউচ্চবোধ তারাশংকরের উপন্যাসে তাই মহাকাব্যিক বিশালতা এনে দিয়েছিল। খণ্ড খণ্ড চিত্র রচনার তির্যক ও চকিত দীপ্তির আলোকে জীবনের খণ্ডাংশকে উদ্‌ভাসিত করার যুগোচিত প্রবণতার পরিবর্তে তাঁর রচনায় একটি সম্পূর্ণতা ও অখণ্ডতা, গোটা মানব-জীবনের চিত্রায়নই তাই স্থান পেয়েছিল। এই দিক দিয়ে দেখলে তাঁর কথাসাহিত্যে বঙ্কিমী মানসিকতার অনুবর্তন যেন বেশী পরিমানে লক্ষ্য করা

যায়। যুগন্ধর বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর সাহিত্যসাধনার মধ্য দিয়ে দেশের ও মানুষের একটি সামগ্রিক চৈতন্যকে গড়তে ও উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠার একটি সুস্থ আদর্শকে দৃষ্টিসীমার মধ্যে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন, রোমান্সের দৃষ্টিপ্রদীপে বাস্তবতার ওপরে একটি বিশালতার আস্তরণ বিছোতে চেয়েছিলেন, তারাশংকরের ক্ষেত্রেও যেন তারই পুনরাগমন দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীর ভগ্নমনোরথ বিশ্বাসহীনতার জটিল জীবনাবর্তের কুটিলতাকে তাই তারাশংকর এই মানসিক ঐশ্বর্য ও উত্তরাধিকারে সহজেই পরিহার করতে পেরেছিলেন। এজন্য 'কল্লোলে'র লেখক হয়েও, বিংশ শতাব্দীর তিরিশের দশকে সাহিত্যসেবায় ব্রতী হলেও, অনন্যতায় তিনি প্রোজ্জ্বল।

॥ ৩ ॥

তারাশংকরের উৎকৃষ্ট উপন্যাসের সংখ্যা এতই বেশী যে, তার থেকে কোন একটিকে প্রতিনিধিস্থানীয় রূপে নির্বাচন ও গ্রহণ করা রীতিমত কঠিন কাজ। অন্ততঃপক্ষে 'ধাত্রীদেবতা', 'কবি', 'হাঁসুলীবাকের উপকথা', 'পঞ্চগ্রাম-গণদেবতা' বা উত্তরকালের 'আরোগ্যনিকেতন', 'সপ্তপদী' কিংবা 'বিচারক'—এর কোনটিকেই উৎকর্ষের বিচারে কারো অপেক্ষা খাটো বলে বোধ হয় না। এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই এক একটি বিশিষ্ট নায়ক চরিত্র তার পরিপূর্ণসত্তার জ্যোতির্ময় প্রভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। তবু ও আমাদের আলোচনার জন্য এদের মধ্য থেকেই একটিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করতে হবে ও তার নায়কের মধ্যস্থতায় তারাশংকরের নায়ক-পরিকল্পনা ও চেতনার স্বরূপটিকে তুলে ধরার চেষ্টা করতে হবে। উল্লিখিত উপন্যাসগুলির মধ্যে অধিকাংশই চল্লিশের দশকে প্রকাশিত; একমাত্র 'ধাত্রীদেবতা'র প্রকাশকাল ১১৩১ সাল। আমাদের এই আলোচনায় শরৎচন্দ্র পরবর্তী যাঁদের রচনাকে আমরা অন্তর্ভুক্ত করছি বিস্তৃত বিশ্লেষণের প্রয়োজনে, তাদের প্রতিটিই তিরিশের দশকের কালসীমার মধ্যে রচিত ও প্রকাশিত। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' 'অপরাজিত' কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' তিরিশের দশকেই প্রকাশিত হয়েছিল। এই হিসাবে 'ধাত্রীদেবতাকে গ্রহণ করাই সমীচীন। শুধু কালসীমার কথাই নয়, আরো গভীরতর কারণেও 'ধাত্রীদেবতা' গ্রহনীয়। কেননা, এই রচনাটি একদিকে যেমন লেখকের আত্মজীবনীমূলক রচনা,

অন্যদিকে তেমনি এই উপন্যাসেই তারাশংকরের নায়কচেতনা তাঁর মানসিক ও সাহিত্যিক আদর্শসম্মতভাবে সর্বপ্রথম পূর্ণমহিমায় আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছে। বীরভূমের গ্রামপরিবেশের আঞ্চলিকতা, তার মাটির কাছাকাছি মানব-মানবী, ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী ও সামান্ততন্ত্রের অন্তরাগচ্ছটা, উদীয়মান বণিক-সভ্যতার সঙ্গে তার মহান সংগ্রাম, দেশপ্রেম ও সেবাব্রত ও সর্বোপরি মানবজীবনের পরমকে আকাঙ্ক্ষা করার যে সামগ্রিক চেতনা তারাশংকরের উপন্যাসের মৌলিক অভিপ্রায়, তার সবখানিই এই 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথ চরিত্রের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। শিবনাথের দর্পণেই তারাশংকরের নায়ক চেতনার গোটা পরিচয়টি আভাসিত হয়ে গেছে। তাই 'ধাত্রীদেবতা'র নায়ক শিবনাথকেই তারাশংকরের প্রতিনিধিস্থানীয় নায়করূপে আমরা গ্রহণ করেছে

রবীন্দ্রনাথের গোরা ও বিভূতিভূষণের অপুকে বাদ দিলে তারাশংকরের শিবনাথই বাংলা উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা পুংখানুপুংখভাবে চিত্রিত চরিত্র। বাল্য-কৈশোর ও যৌবনের প্রথমাংশ ঘিরে শিবনাথের জীবন এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। 'গোরা'য় অবশ্য বাল্যজীবনের চিত্রায়ণ নেই। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' বাল্যচিত্রায়ন থাকলেও, শ্রীকান্তের স্বাধীন সত্তা সেখানে ইন্দ্রনাথের ছায়ায় রাহুগ্রস্ত, আর দুর্গার মৃত্যু পর্যন্ত অপুকে আপন স্বাতন্ত্র্য অর্জনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। কিন্তু 'ধাত্রীদেবতা'য় শিবনাথ উপন্যাসের সূচনাপর্বেই ব্যক্তিত্ববান ও স্বাতন্ত্র্যসমুজ্জ্বল। গ্রামের অপর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধোদ্যত ভঙ্গিমায় তার প্রথম আত্মপ্রকাশেই তার একক মহিমা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেরী হয়না। এই সূচনাপর্ব থেকে উপন্যাসের একেবারে শেষে যেখানে শিবনাথ কারাবন্দী, সমস্ত আখ্যান-অংশটি ব্যাপ্ত করে সে এই একই মহিমায় বিরাজিত, কোথাও তার ব্যক্তিত্বের এই সুউচ্চ স্থান থেকে সে মুহূর্তের জন্যও স্খলিত হয়ে পড়েনি। গাছ যেমন অঙ্কুরিত হওয়ার পর চারপাশের আবহাওয়া, সূর্যের আলোক ও মাটির ভিতরকার প্রাণরস আত্মস্থ করে আপন পুষ্টি ও বৃদ্ধিকে অক্ষুণ্ণ রেখে ঋজু মহিমায় বিকাশশীল হয়ে ওঠে, শিবনাথের জীবনেও এই পারিবারিক আভিজাত্য ও পারিপার্শ্বিকের প্রভাব তার সুস্থ, সবল, ঋজু জীবনবোধ গড়ে তুলতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। গাছ যেমন আবহাওয়ার সব উপাদানের পরিপোষণ শক্তিকেই আপন পুষ্টির কাজে লাগায়, কোন কিছুকেই পরিত্যাগ করে না, শিবনাথও তেমনি জীবন থেকে বিচিত্র পৌষ্টিক উপাদান গ্রহণ দ্বিধাবোধ করেনি।

অপ্রয়োজনবোধে সে একটি উপাদানকেও বর্জন করেনি। তাই বড় বড় প্রভাব যেমন তার চেতনাকে গড়ে তুলেছিল, তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রায় অদৃশ্য অবজ্ঞাত প্রভাবগুলিকেও সে তুচ্ছ বলে অবহেলা করেনি। মা, পিসীমা, রামতারণ মাষ্টারমশাই, গোঁসাইবাবা, সুশীল, পূর্ণ, সাঁওতাল পরগণায় নিভৃত আশ্রমবাসী জননেতা, ডোমবউ, গাঁজাখোর পাগল, ছোটশ্যামু, মুমূর্ষু স্বামীর জীবনরক্ষায় কৃতসংকল্পা নীচজাতীয়া বউটি, বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ', ইতিহাসের বীরনায়কগণের ঐতিহ্য, ফরাসী বিপ্লবের অগ্নিগর্ভ ইতিহাস,—সব কিছুই প্রত্যক্ষে-অপ্রত্যক্ষে, সচেতন এবং অবচেতনভাবে শিবনাথের চরিত্রকে গড়ে তুলেছে। এই ভাব-জীবনকে প্রতিরোধের বিপরীত ভাবসংঘাতে দীপ্ত করেছে তার দাম্ভিক শ্বশুরবাড়ি, স্ত্রী গৌরী এবং সর্বোপরি এই চৈতন্যকে কর্মযজ্ঞের ডাকদিয়েছে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের উন্নত প্রেরণা। বালক শিবনাথ এই সমস্ত প্রভাব স্বীকরণ করে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠেছে ও তিরিশের দশকের কর্মোদ্যোগহীন চিন্তাবিলাসী নিষ্ক্রিয় নায়ক-চেতনার পাশে এক সক্রিয় কর্ম-যোগী আদর্শবান ও জীবনপ্রেমিক নায়কের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে।

শিবনাথের জীবনে যার প্রভাব তাকে সর্বাধিক প্রমাণিত করেছিল, তিনি তার মা জ্যোতির্ময়ী। প্রথম পরিচ্ছেদেই তাঁর একটি কথা শিবনাথের মনে গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে তার মনে গঠনপথকে নির্ধারিত করে দিয়েছে। অপর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে যুদ্ধ করে ফিরে আসার পর যখন পিসীমা তার কাজকে সমর্থন করছিলেন তখন জ্যোতির্ময়ী বলেন,

> "না, না ঠাকুরঝি, দেশ ঘরে ঝগড়া করা কি ভাল। তাহলে জানোয়ারে আর মানুষে তফাৎ কি? শিবনাথ মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল নেকড়েগুলার কলহের কথা। এক এক সময় মাকে তাহার এত ভাল লাগে।"

জ্যোতির্ময়ীর আর একটি শিক্ষা শিবু পিসীমার সঙ্গে কথোপকথনে তৃতীয় পরিচ্ছেদে ব্যক্ত করেছে। পিসীমা যখন শিবনাথের কাছে তার জন্য মায়ের দুঃখের কথা বলছিলেন, তখন শিবনাথ বলেছে,

> "কেন, প্রথম বছর মা আমার হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিল তিরিশে আশ্বিন, আমি সেই থেকে তো বিলিতী জিনিস কিনি না। পড়াওতো করি। আচ্ছা, আর জীব-হিংসে করব না।"

এই বাল্যশিক্ষাই শিবনাথকে ভবিষ্যৎ জীবনে অসহযোগ ও অহিংস আন্দোলনের প্রেরণা জুগিয়েছিল।

শিবুর বিয়ের পর জ্যোতির্ময়ী বধূকে দিয়েছিলেন একটি রামায়ণ ও শিবুকে একটি সোনা বাঁধানো কলম। এই দুটি উপহার দ্রব্যে যেমন তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্যের পরিচয় মেলে, তেমনি শিবুর ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কেও তার মনোভঙ্গি ব্যক্ত হয়ে পড়েছে।

শিবুর জীবনে দেশমাতৃকার সেবাব্রতের প্রদীপ শিখাটিকে জ্যোতির্ময়ীই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' তিনি শিবুকে বারবার পড়িয়েছেন আর নিজের চেনা অভিজ্ঞতায় 'মা যা হইয়াছেন' তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

> "আমার বিয়ের পরেও আমি দেখেছি শিবু, এই পটো পাড়ার কি চলতি, বড় বড় জোয়ান পট দেখিয়ে গান করতো। মাটির পুতুল বেচত মেয়েরা। সে জায়গা দিনরাত্রি হাসি-গান-আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, লক্ষ্মীর কৃপায় সুন্দর হয়ে থাকত। সেই জায়গা আজ কি হয়েছে, এইখানে ভেবে দেখ, মা কি ছিলেন, কি হয়েছেন।"

'আঙ্কল টমসকেবিন' আনন্দমঠ, মানবপ্রীতির মন্ত্রে তার মনকে উদ্বোধিত করেছিল, তার মা তাকে প্রেরণা দিয়েছিলেন সর্বাধিক। ডোমবউ পালাবার পর যখন হেলা ও তার মা কদর্যভাবে শিবনাথের কুৎসা রটিয়েছিল, তখনও জ্যোতির্ময়ীর প্রশান্ত ব্যক্তিত্ব অনমনীয় দৃঢ়তায় ও অসীম স্নেহে শিবুকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। তিনি বলেছিলেন,

> "শিবের মুখে বিষ তুলে সবাই দেয় ঠাকুরঝি, হাড়ের মালা তাঁরই গলায় পরিয়ে দেয়, কিন্তু সব পবিত্র হয় শিবের গুণে। আর ওই সব মানুষের উপকার ওই তো আশীর্বাদ। ভেবে দেখতো সীতার অপবাদের কথা। প্রজাতে বলতে বাকি রেখেছিল কি? কিন্তু সীতার মহিমা কি তাকে এতটুকু ম্লান হয়েছে? বরং লোকের মনের কালির সম্মুখে দাঁড়িয়ে, তাঁর মহিমা হাজার গুণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"

এই অনুপ্রেরণার বাণী শিবনাথের মনের সমস্ত অবসাদ, গ্লানি ও আচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে তুলতে সহায়তা করেছে ও শিবনাথের ভবিষ্যৎ সেবাব্রত-ধারী জীবনাদর্শকে ঋজু করে তুলেছে।

জ্যোতির্ময়ীর পরেই শিবনাথের জীবনে পিসীমার প্রভাব উল্লেখযোগ্য। জমিদারের কন্যা ও জমিদারের ভগ্নী হিসাবে সমাজতান্ত্রিক অভিজাত্যের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। তাঁর প্রতিটি কথায় ও আচরণে তাঁর এই দৃপ্ত আভিজাত্যবোধ ব্যক্ত হয়েছে। শিবনাথকে তিনি এই আভিজাত্যের আদর্শেই গড়ে তুলতে

চেয়েছেন। গাছ কাটা নিয়ে তাঁর দৃঢ় উক্তির মধ্যেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

> "গাছ একটা সামান্য জিনিসই বটে বউ, এ মান-অপমানের কথা, ইজ্জতের কথা।—এখানে তুমি কথা কয়ো না।...এ আমার বাপের বংশের অপমান। দাদা আমাকে বলতেন, শৈল, না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণে হাত। এ আমাদের পিতৃপুরুষের শিক্ষা। মাথা নীচু করে তো জবরদস্তি কারো সইতে পারবো না।........ আজ যে শিবনাথের মাথা হেঁট হবে? বিষয় বাপের নয়, বিষয় দাপের।

এই কথা কয়টি শৈলজাদেবীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যটিকে সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে। তিনি শিবনাথকে এই আদর্শেই গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাই অপর পাড়ার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি শিবনাথকে তিরস্কার করেন নি, অথবা নেকড়ের বাচ্চা ধরে আনাতেও অমত করেন নি। বরং শাক্তের ছেলেকে দিয়ে বৈষ্ণবের মালা জপানোর উল্লেখে তিনি জ্যোতির্ময়ীর প্রতি তির্যক কটাক্ষও করেছেন। গ্রামের দুর্গতদের জন্য শিবনাথের চাল ভিক্ষা করার প্রস্তাবে তাই তিনি সম্মত হতে পারেন না। দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন,

> "ও গল্প আমি জানি শিবনাথ। কিন্তু আমাদের বংশ আগাছার ঝাড় নয়। আমাদের শালগাছের জাত। যতক্ষণ খাড়া থাকবে, একা একাই ছায়া দেবে, ডালপাতায় বহু পাখিকে আশ্রয় দেবে।"

এই একই প্রেরণায় শিবনাথকে কাছারি ঘরে বসিয়ে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন,

> "দুটি কথা মনে রেখো, কারো কাছে মাথা নিচু কোরো না। আর পিতৃপুরুষের কীর্তি-বৃত্তি লোপ কোরো না।"

এই তেজস্বিনী, যজ্ঞাগ্নির মতোই দীপ্তিময়ী পিসীমা ব্যক্তিত্বের অনমনীয় দৃঢ়তাটিকে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছেন। তাই শিবনাথ কোথাও মাথা নীচু করেনি। ঋজু, সরল, উন্নত শালবৃক্ষের মতোই সমস্ত উপন্যাসে মহিমান্বিত রূপে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

রামরতন মাস্টার মশাইয়ের প্রভাবও শিবুর জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়েছে ও জীবনের সব কটি সংকট মুহূর্তে তিনি শিবুকে অভ্রান্ত পথনির্দেশে সম্মুখের পথে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। মধুসূদন, মিল্টনের কাব্য তিনি আবৃত্তি করেন। মন খারাপ লাগলে তিনি শান্তিনিকেতনে চলে যান

শিবনাথকে রাণী ভবানার গল্প বলেন। স্কুলে অন্যায়ের প্রতিবাদ করায় তাঁর চাকরি যেতে বসেছে। শিবনাথের কাছে সমর্থন পেয়ে তিনি নিঃসঙ্কোচে, নির্ভয়ে চাকরি ছেড়ে দেবার সংকল্প গ্রহণ করেন। পিসীমা তাঁকে থাকতে বলায় তিনি বলেছেন,

> "আমি আর চাকরিও করব না। বাড়িতে গিয়ে চাষ করব। জানেন আমাদের এক কবি বলেছেন,—চাহিনা স্বর্গের স্থখ নন্দন কানন, মুহূর্তেক পাই যদি স্বাধীনতা ধন। স্বাধীন জীবনের জন্ম যদি কিছু কষ্ট স্বীকারই করতে হয়, সে করতে হবে।"

স্থশীল ও পূর্ণও শিবনাথের মানসিক সংগঠনে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। গ্রামে কলেরা মহামারীর সেবাকার্যে সহায়তা করতে মেডিক্যাল-ছাত্র স্থশীল ও পূর্ণ শিবনাথদের গ্রামে যায় ও শিবনাথের নেতৃত্বে সেবাদলের কাজে আত্মনিয়োগ করে। এই দুটি মানুষ শিবনাথের গ্রামসীমার বদ্ধ জীবনে মুক্তির বার্তা নিয়ে আসে। 'আনন্দমঠে' যে শিক্ষায় শিবনাথ দীক্ষা নিয়েছিল, স্থশীল ও পূর্ণ তাকে সেই দেশমাতৃকার দুঃখমোচনের সাধনায় আহ্বান জানিয়েছে। এই আহ্বানের ফল শিবনাথের জীবনে স্থদূরপ্রসারী হয়েছে এবং কলকাতার কলেজ জীবনে সে সক্রিয়ভাবে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। আবার পূর্ণের সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার নিভৃতে এক আশ্রমে একটি অতিসাধারণ চেহারার মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে তার দেশসেবার একটি পর্বের সমাপ্তি ঘটে। পূর্ণের মৃত্যু ও স্থশীলের পলাতক জীবনের পটভূমিকায় তার জীবনের এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়। কিন্তু দেশসেবায় তার সক্রিয় অংশগ্রহণের মানসিক প্রস্তুতিপর্বে এই দুটি চরিত্রের প্রভাব অনস্বীকার্য।

পূর্ণের গুলিতে নিহত বিপ্লবী নেতার স্বল্পস্থায়ী পরিচয় শিবনাথের জীবনে যে কী গভীর ও স্থদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা তার পরবর্তী কর্মসাধনার যাত্রাপথ নির্দেশে সর্বাধিক সহায়তা করেছিল। মা জ্যোতির্ময়ী যে শিখা তার চেতনায় অতি বাল্যকালেই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, ইনি সেটিকে উসকে দিয়ে দীপ্তিমান করে তুলেছিলেন। তাই পঁচিশ পরিচ্ছেদে শিবনাথের ভাবনায় এঁরা দুজনে সহজেই একাত্ম হয়ে গেছেন।

> "তাঁহার মনে পড়িয়া গেল, সেদিনের সেই ঘটনার কথা। অতি সাধারণ আকৃতির এক মহাপুরুষের কথা; সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িয়া গেল মাকে।"

শুধু এই সমস্ত উচ্চস্তরের সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রঘরের মানুষই নয়, গ্রামের অতি-সাধারণ, তথাকথিত নীচজাতির মানুষের বিচিত্রমুখী প্রভাবও শিবনাথের জীবনে গভীর ও বদ্ধমূল প্রভাব বিস্তার করে তার মানসিক গঠনে সহায়তা করেছে। কলেরা মহামারীতে মৃতপ্রায় ডোমবউটি, যাকে শিবনাথ পুনর্জীবন দান করেছিল, কলকাতার মেসবাড়িতে সে অসীম শ্রদ্ধা ও মমতায় এবং গভীর বিশ্বস্ততায় তার ঋণ শোধ করে মানুষের মহিমাকেই তার চোখের সম্মুখে তুলে ধরেছে। যাত্রাদলের লম্বা চুলওয়ালা ছেলেটি, গাঁজাখোর পাগল,—এমনই সমস্ত অতিসাধারণ মানুষ মানুষের দুঃখমোচনের সাধনায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছে, তাতে শিবনাথের মনে সমবেতভাবে মানুষের আন্দোলনের শক্তি সম্পর্কে নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছে। ছোট শ্যাম্ তো তার সবচেয়ে সহযোগী সৈনিকেই পরিণত হয়েছে। অনাহারক্লিষ্ট, মুমূর্ষু নীচজাতীয় দম্পতির জীবনের মধ্যে সে তার শাশ্বত নরদেবতারই সন্ধান পেয়েছে। গৌরীর প্রতিকূল ব্যবহারে বিড়ম্বিত আপন জীবনের পটভূমিকায় এই দম্পতির জীবনে সে মানুষের চিরকালীন আশা ও আশ্বাসের সঞ্জীবনী মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে। এই সমস্ত বিচিত্র প্রভাবের ওপর যুক্ত হয়েছে ইতিহাস, সাহিত্য ও মহাপুরুষদের জীবন ও বাণীর ধ্রুব আদর্শ। 'আনন্দমঠ', 'আঙ্কল টমস্ কেবিন', 'বীরবাণী', শিবাজী, প্রতাপসিংহ, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, কবীর,—সমস্ত কিছুর রাসায়নিক প্রভাবে তার চৈতন্যের বীজসত্তা অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়ে মহীরুহের মহিমা নিয়ে জেগে উঠেছে। এর শেষ পরিণাম বা সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটেছে গান্ধীজীর ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ভারতব্যাপী কর্মযজ্ঞের অন্যতম সৈনিক হিসাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে।

শিবনাথ ধাত্রীদেবতার কেন্দ্রীয় চরিত্র ও নায়ক। ভারতীয় ইতিহাসের একটি অগ্নিগর্ভ অধ্যায়ের পটভূমিকায় তার সত্তার বিবর্তন ও বিকাশের কথাই এতে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণেও তার আবির্ভাব। একদিকে জমিদারীর অবক্ষয়ের দিক দিয়ে সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রূপটি দেখা দিয়েছে, অন্যদিকে গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে ব্যবসা বাণিজ্যের সূত্রে নতুন বণিকতন্ত্রের উন্মেষ দেখা দিয়েছে। মান সম্মান ও ঐতিহ্যের বদলে অর্থ ও প্রতিপত্তির মূল্যই ক্রমশ বেড়ে যেতে চলেছে। শিবনাথের জীবন এই দুই ধারার দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ। একদিকে পিসীমা ও মায়ের শিক্ষা, অন্যদিকে ধনী শ্বশুরবাড়ির বিদ্রুপ, জেদ ও প্রতিকূলতা; দ্বন্দ্ব তার রাজনৈতিক চেতনালোকেও—সন্ত্রাসবাদ না অহিংস সংগ্রাম! শেষ পর্যন্ত

মা-পিসীমা-মাস্টারমশাইয়ের শিক্ষাই তার জীবনে সফল হয়েছে। দেশকে সে মা বলে জেনেছে। জনগণের দুঃখমোচনকে সে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করেছে। নিন্দা-অপমানের তিলক ললাটে ধারণ করেই সে মানুষের মধ্যে নারায়ণের সন্ধান পেয়েছে। কয়লার ব্যবসা করে লক্ষপতি হবার প্রলোভন ত্যাগ করে ময়ূরাক্ষীর তীরে সে চাষ-আবাদ ও চরকা-তাঁতের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছে। বিপ্লবের আদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়েছে—প্রপার্টি ইজ্ থেপট্ এবং সর্বশেষে একক সাধনার নির্জনবাস ছেড়ে সে সামিল হয়েছে সহস্রের কর্মসাধনায়। শেষ পর্যন্ত বিনয়ের নম্র দৃঢ়তায় সে কারাবরণ করেছে। তার সমগ্র চৈতন্যের সম্মুখে মাটি ও মা একাকার হয়ে গেছে। অনাবৃষ্টির রুক্ষ মাটিতে সে তৃষ্ণার্তা ধরিত্রীজননীর আকুল আর্তনাদ শুনতে পেয়েছে। যথাসাধ্য প্রয়াসে সেই তৃষ্ণা মেটাতে চেয়েছে। 'আনন্দমঠের মাতৃবন্দনা তার মনের গভীরে শিকড় বিস্তার করেছে। আপন গ্রামের দুঃখদারিদ্র্য, গ্লানি-অপমান, রিক্ত সর্বহারা রূপের মধ্যে সে 'মা যা হইয়াছেন'—এর রূপ যেন নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছে। আর তার সমগ্র চৈতন্য মন্থন করে স্বপ্ন জেগে উঠতে চেয়েছে 'মা যা হইবেন'। এই বিশাল, সমুন্নত, আদর্শরঞ্জিত ভাবের উদ্বোধনেই 'ধাত্রীদেবতা' সার্থক, চরিতার্থ তার নায়ক শিবনাথ।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের নায়কদের তুলনায় শিবনাথ তাই স্বতন্ত্র, একক মহিমায় নিঃসঙ্গ গিরিচূড়ার মতোই উন্নতশীর্ষ। রবীন্দ্রনাথের অমিত রায়, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, বিভূতিভূষণের অপু, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শশী ডাক্তার—এই যুগেরই নায়ক; অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' বা কল্লোলীয়দের অন্যান্য নায়করাও এই কালের প্রতিনিধি। এঁরা প্রত্যেকেই যুগ ও জীবনের একটি বিশেষ দিকেরই দ্রষ্টা। যুদ্ধের বিনষ্টি আর অর্থনৈতিক সংকট, মনুষ্যত্বের অবনতি ও বিশ্বাসের অবক্ষয়, হৃদয়বোধের অপসরণ ও বুদ্ধিবাদের আধিপত্য ও সমগ্র দেশও মানুষকে ঘিরে একটি আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গির অভাবই এই পর্বের চরিত্রধর্ম। এই পর্বের মানুষ তাই সমাজবিবিক্ত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিষ্ক্রিয়; সমবেত সাধনায় আস্থাহীন। রুদ্রের দক্ষিণমুখের প্রসাদবঞ্চিত।

তারাশংকরের শিবনাথ যেন এই হিসাবে যুগের ব্যতিক্রম। তার চৈতন্য অনিকেত নয়। একটি অভিজাত পারিবারিক ঐতিহ্যে বদ্ধমূল; তার শিক্ষা পুঁথিগত নয়। মাটি ও মানুষের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে তার শিক্ষার গঠন। সে নিঃসঙ্গ নয়। মানুষের সমবেত সাধনার শক্তিতে সে আস্থাবান। জীবনকে সে বুদ্ধিও হৃদয় উভয় দিয়েই দেখেছে। সে সক্রিয়, তাই দেশ ও মানুষের

দুঃখমোচনের কর্মযজ্ঞে সে অংশভাগী। সে জীবনের খণ্ডবিচ্ছিন্ন রূপের উপাসক নয়। অখণ্ড বিরাট দেশের ধ্যানমূর্তির সাধক। সে রুদ্রের দক্ষিণ মুখের প্রসাদে অভিষিক্ত। বঙ্কিমের উপন্যাসের নায়কদের মতোই, সীতারাম বা রাজসিংহ, সে সংগঠন ও সংগ্রামে একাধারে সেনাপতি ও সৈনিক। রবীন্দ্রনাথের গোরার মতোই তার উন্নত আদর্শবাদের কল্পনা দেশের মাটির মধ্যে ধাত্রী ও দেবতার ধ্যানমূর্তির আবিষ্কারক। তাদেরই মতো মহাকাব্যিক প্রসার ও বিশালতা তার চারিত্রশক্তিতে, তাই তার উপলব্ধিকে লেখক মহাকাব্যিক গাম্ভীর্যে বিবৃত করেছেন,

"উচ্চ তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে। মাটি কথা বলিতেছে। মাটি-মা-দেশ জন্মভূমি কথা বলিতেছে। চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হাঁ কথাই তো বলিতেছে। সে যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল মৃত্তিকার আবরণের তলে জাগ্রত ধরিত্রী দেবতাকে চোখের সম্মুখে সুতার মতো ফাটলের দাগগুলি ক্রমশ মোটা হইয়া সুদীর্ঘ রেখায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শস্যগর্ভা ধানের দীর্ঘ পাতাগুলি ম্লান হইয়া মধ্যস্থলে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

অথবা, "সহসা তাহার মনে হইল, দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বার্থপরতা, লোভ মোহের ভার হিমালয়ের ভারের মত মনুষ্যত্বের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। সেই ভার ঠেলিয়াই মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশ অহরহ চলিয়াছে। কঠিন মাটির তলদেশ হইতে মাটি ফাটাইয়া যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয়, তেমন ভাবেই সে যুগে যুগে উর্ধ্বলোকে চলিয়াছে। এই ভার ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া চলিয়াছে।"

কিংবা, সুশীলের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে উক্ত শিবনাথের প্রদীপ্ত ভাষণ.

"তুমি বিশ্বাস করো না সুশীলদা, আমি বিশ্বাস করি। আমি জানি আমার সাধনা আমার জীবনেই হয়ত সিদ্ধ হবে না। কিন্তু সাধনায় সঞ্চয় হারাবে না। সে থাক, আর একজন এসে তাকে পরিপুষ্ট করবে। অহিংসায় আমি বিশ্বাস করি, গণ-আন্দোলনে আমি প্রত্যাশা করি; বিশ্বাস করি আমি মনুষ্যকে। ক্ষুদ্র হোক, হীন হোক, দীন হোক, তাদের ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দীনতা সমস্ত কিছুর মধ্যদিয়েই, তুমিও যেখানে যেতে চাও, তারাও চায় সেইখানে যেতে—এক পরম লক্ষ্যে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে জীবনের এই বিশৃঙ্খল উন্মত্ত যাত্রায় মানুষ দিগ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটছে। অপমৃত্যুর সংখ্যা নেই। তাই ঘোষণা

দেবার কণ্ঠস্বর চাই সুশীলদা। জীবনের যাত্রাপথে আহ্বান জানাবার ভাষা চাই। মানুষের চিরন্তন সাধনাইতো এই। স্বাধীনতা লাভ করলেই কি সব পেয়ে যাবে তুমি সুশীলদা? জীবনের সকল দ্বন্দ্বেরই কি অবসান হবে?'

এই পরিপূর্ণ বিশ্বাসবোধ, প্রদীপ্ত মানবতাবোধ, উদার জীবনদৃষ্টি, কালান্তরের কল্পনাচেতনা, সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস তিরিশের দশকের বাংলা উপন্যাসে শিবনাথের চরিত্রে নায়কচেতনার এক নতুন দিগ্‌দর্শন খুঁজে পেয়েছে। 'গোরা'য় এসে যে বিশ্বাস মূর্তি ধরেছিল, পরবর্তীকালে তা কিছুটা যেন পথভ্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথে এসে সে আবার তার হারানো পথের সন্ধান ফিরে পেয়েছে। তারাশংকরের যাত্রাপথ ধাত্রীদেবতার উপলব্ধিতে ধন্য হয়ে পঞ্চগ্রাম গণদেবতার কল্পনাভিমুখী হতে চেয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের পরিবেশ ও বিশ্বাস এই রচনায় আত্মস্বরূপের মডেলেই নায়ক চরিত্রের আদর্শের পরিকল্পনা করেছে। লক্ষ্যণীয় যে, বইটি লেখক উৎসর্গ করেছেন তাঁর মা ও পিসীমার স্মৃতির উদ্দেশে। শিবনাথ ও লেখক যেন অদ্বৈত সম্পর্কে জড়িয়ে গেছেন। সুস্থ, সবল, ঋজু জীবনের সক্রিয় কর্মযোগের প্রদীপ্ত প্রেরণায় সমকালীন নিষ্ক্রিয় কল্পনাপ্রবণ ও নিঃসঙ্গ নায়কের ভিড়ে শিবনাথ আপন মহিমাতেই ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আর তার মধ্যস্থতায় তারাশংকরের নায়ক পরিকল্পনা বাংলা উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের ধারায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উচ্চ আদর্শবাদকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে।

উৎস নির্দেশ ঃ—

১। তারাশঙ্কর—আমার সাহিত্য জীবন।
২। ঐ ঐ
৩। ঐ ঐ
৪। ডঃ গোপিকানাথ রায়চৌধুরী—দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য।
৫। তারাশঙ্কর—আমার সাহিত্য জীবন।

ফলশ্রুতি ও অনুসৃতি

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে'র নায়ক মতিলালকে দিয়ে বাংলা উপন্যাসের নায়কচিন্তার পরিকল্পনাও রূপায়ণের যে যাত্রারম্ভ হয়েছিল, তার পদযাত্রায় বঙ্কিমের ইতিহাসবিশ্রুত আদর্শমান নায়কদের উত্তরসাধক হিসাবে রবীন্দ্র উপন্যাসের নায়কবৃন্দ সার্থকভাবে তাকে কালান্তরের বাঁকে পৌঁছে দিয়েছে। সেই পরিবর্তিত পথে শরৎচন্দ্রের পথিকবৃত্তি-নায়ক গোটা বিশ্ব পৃথিবীর একালীয় নায়কদের মতোই অনিকেত আনির্দেশ্য, ভ্রষ্টাস্বভাবী—বিশেষত্ব অঙ্গীকার করে বিভূতিভূষণ, মানিক ও তারাশংকরের সার্থক উত্তরসূরিত্বে চরিতার্থ হয়ে বাংলা উপন্যাস ও তার নায়ক চেতনা ও পরিকল্পনার একটি সুনির্দিষ্ট ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্নভাবে সম্মুখের পথে প্রসারিত করে দিয়েছে। পূর্ববর্তী আলোচনায় তারই বিস্তৃত তথ্যবহুল ও অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণের প্রয়াস পাওয়া গেছে। কিন্তু উপন্যাসের মতো একটি সজীব প্রাণবন্ত ও সদা বিবর্তনশীল সাহিত্যধারা এখানেই থেমে থাকেনি বা থাকতে পারেনি। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে এই দীর্ঘকালীন সাধনা তার সার্থক ফলশ্রুতিতে যোগ্য অনুবর্তন ও অনুসৃতির মধ্যস্থতায় ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। যদিও আমাদের আলোচনার সীমিত পরিসরে তার পরিচয়গ্রহণ আবশ্যিক নয়, তথাপি, এই ধারার ক্রমপ্রসারমাণ স্বভাবধর্মটিকে পরবর্তীদের রচনায় সংক্ষেপে আবিষ্কার করে নেওয়া এই আলোচনার পূর্ণতার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলেই আমাদের মনে হয়।

বিভূতিভূষণ, মানিক, তারাশংকরের সাধনার পাশে আরো অনেক বাঙালী কথাসাহিত্যিক উপন্যাসের সাধনায় আত্মনিয়োগ করে এই ধারাটিকে তার বিবর্তনের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট পথে সুপরিচালিত করেছেন ও নায়ক চেতনার ক্রমবিকাশের ধারাটিকে অক্ষুণ্ণ অবিচ্ছিন্নতায় ধরে রেখেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বনফুল, অন্নদাশংকর রায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভৃতির উপন্যাস সাধনায় এই বিবর্তনধারাটির সার্থক ফলশ্রুতি ও যোগ্য অনুসৃতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

ধূর্জটিপ্রসাদের ত্রয়ী-উপন্যাস 'অন্তঃশীলা' আবর্ত ও মোহানা'—এই

বিবর্তন ধারার একটি স্পষ্ট উত্তরসাধনার চিহ্নধারী। এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও নায়ক খগেনবাবুর মধ্যদিয়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে পরিপার্শ্বের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন আত্মলীন একধরণের মননশীলতার পারম্পর্যে। গোপাল-হালদারের 'একদা-অন্যদিন-আরেকদিন', সম্প্রতি যা 'ত্রিদিবা' নামে একত্রে প্রকাশ পেয়েছে, তার মধ্যেও নায়ক অমিতের চরিত্রপরিকল্পনায় এই স্বাভাবিক বিবর্তনধারাটিই পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে লেখক উত্তর-তিরিশ কথাসাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রমাণটি নায়ক-চরিত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। খানিকটা চেতনাপ্রবাহী-রীতির আশ্রয়ী এই উপন্যাসে নায়ক যতখানি সক্রিয়, প্রায় ততখানিই তার চারপাশের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ থেকে বিচিত্র বিষয়ের প্রতি গ্রহিষ্ণু মনোভাবই ব্যক্ত করেছে। এই একই রীতির অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় পর্বে পর্বে বিন্যস্ত বনফুলের 'জঙ্গম' উপন্যাসে। এখানেও নায়ক শঙ্কর চরিত্র যেন শ্রীকান্তের পথ ধরেই বিবর্তিত হতে চেয়েছে। অন্নদাশংকরের 'সত্যাসত্যে'র ছয় খণ্ডে বিধৃত বিশাল বিস্তৃতিতে দেশান্তরের পটে-ধরা নায়ক-চেতনা সুধী ও বাদলের মধ্যে যেন কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে গেছে। ইনটুইশন ও ইণ্টেলেকেটর প্রতীক হিসাবে চরিত্র দুটির মধ্য দিয়ে সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্বময় রূপায়ণ লেখকের সচেষ্ট অভিপ্রায়ের সীমায় বাঁধা থাকলেও, সুধী ও বাদলের দ্বিধার মধ্যে লেখকের নায়কচেতনা আন্দোলিত ও প্রতিহত হয়েছে। অবশ্য সচেতনভাবে লেখক বাদলকেই এর নায়ক করতে চেয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বসুর 'তিথিডোর' উপন্যাসে একটি নায়ক থাকলেও সে নায়িকার বিপরীত চরিত্র হিসাবেই নায়ক মাত্র। নচেৎ উপন্যাসটি আগাগোড়াই স্বাতী নামক একটি মেয়ের ছোটবেলা থেকে বিবাহের কাল পর্যন্ত বেড়ে ওঠার গল্প। এটিকে একহিসাবে পারিভাষিক অর্থে 'নায়কহীন' কাহিনীও বলা চলে। প্রবোধকুমার সান্যালের 'আঁকাবাঁকা' উপন্যাসের নায়ক কংকরকুমার শরৎচন্দ্রীয় শ্রীকান্তের পথেই অচিন্ত্যকুমারীয় 'বেদে'র মতোই বোহেমিয়ান। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের তিন পর্বে বিন্যস্ত 'উপনিবেশ' সম্বন্ধে লেখক নিজেই বলেছেন, শলোকভের মতো ডন-কশাকনের ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস রচনার প্রয়াস এখানে গৃহীত হয়েছে। নায়ক মনিমোহন তাই উপন্যাসে স্বাভাবিক ভাবেই পার্শ্বচরিত্রের মতোই 'অনেকখানি বিকেন্দ্রিত হয়ে গেছে। রীতিতেও বিবৃতির পাশে ডাইরীর অবস্থিতি গঠন শৈথিল্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। অপেক্ষাকৃত তরুণতরদের মধ্যে আনন্দ বাগচীর 'চকখড়ি' কিংবা সুলেখা সান্যালের

'নবাঙ্কুরে'-অপুর মতোই একটি ছেলে ও মেয়ের আত্মবিকাশের কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে।

উপন্যাসের আঙ্গিকেও প্লটের বিন্যাসেও বাংলা উপন্যাসের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশের পথরেখাটি সুচিহ্নিত হয়ে গেছে। তারাশংকর, শরদিন্দু-বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রভৃতি কয়েকজন ঔপন্যাসিকের ব্যতিক্রান্ত প্লট নির্মিতির দৃঢ়বদ্ধতার পাশে প্রায় সকলেই শিথিল প্লটের উপন্যাস রচনা করেছে। 'ক্রনিকল' বা 'পিরিয়ড' নভেলেই যে নভেলের ভবিষ্যৎ রূপটি স্থিরীকৃত হয়েছে,—তা বাংলা উপন্যাসেও আঙ্গিকের ক্রমবিকাশের ধারাপথে স্পষ্টীকৃত হয়ে গেছে।

গঠনরীতি ও আঙ্গিক

উপন্যাস যে একান্তভাবেই আধুনিক কালের সৃষ্টি, এ বিষয়ে বিদেশী কিংবা এদেশী, কোন সমালোচকেরই দ্বিমত নেই। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশ ও জীবনযাপনপদ্ধতি ও জীবনবোধের পরিবর্তন, সামাজিক পালাবদল ও মুদ্রাযন্ত্র ও গদ্যের প্রসার, এই সমস্তের সম্মিলিত সন্নিপাত সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাসের আবির্ভাবকে সম্ভব করে তুলেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে, উপন্যাসের সূচনাপর্বের সামাজিক প্রতিবেশ উভয়ক্ষেত্রেই পরস্পর-সদৃশ। রেনেসাঁস, মানবতাবোধের বিস্তার, বাস্তবজীবনের প্রতি প্রখর আগ্রহ ও সদাজাগ্রত কৌতূহল,—দু'দেশের ক্ষেত্রেই উপন্যাসসৃষ্টির উপযোগী বাতাবরণ নির্মাণ করেছিল। কাব্য ও নাটকের প্রথাগত প্রকাশমাধ্যমের সঙ্গে তাই এই যুগের উপন্যাসের শিল্পরূপে মানুষ নতুন প্রকাশমাধ্যম খুঁজে নিয়েছে।

জগৎ-সংসারের কোন কিছুই যেমন নিয়ম-বহির্ভূত, ঐতিহ্যহীন ও স্বয়ম্ভূ নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। মানুষের প্রকাশের ক্ষেত্রে উপন্যাসের এই নতুন আঙ্গিক তাই অভিনব মনে হলেও, আকস্মিক ও অপূর্ব-নির্মিত নয়। একালের কোন কোন সমালোচক উপন্যাসকে আধুনিক যুগের মহাকাব্য বা মহাকাব্যের আধুনিক যুগোচিত সংস্করণ বলে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন। একটি সমগ্র যুগের সমাজ পরিবেশ, তার দর্শন-মনন ও মানবজীবন যেমন মহাকাব্যের বিস্তৃত পটে বিধৃত হয়ে থাকে, মহাকাব্যের যুগ অতিক্রান্ত হলেও, সেই প্রকাশ প্রবণতা কিন্তু থেমে থাকেনি। মহাকাব্যের মানসিক প্রেরণা তাই মহাকাব্যহীন আধুনিক যুগে উপন্যাসের আশ্রয় নিয়েছে, আর পরিবর্তিত মানবরুচি ও ধ্যানধারণা উপন্যাসেই আপন চিত্তবৃত্তির চরিতার্থতা সন্ধান করেছে। উপন্যাস থেকে আমরা কি প্রত্যাশা করে থাকি?—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে তাই সমালোচক যথার্থই বলেছেন,

"We find here a clear imitation of men and manners, we see the very web and texture of society, as it really exists, as we meet it when we come into the world."[১]

সমাজ পরিবেশের সঠিক বুনুনি, ও তার পটভূমিকায় মানুষ ও তার আচরণের সামগ্রিক ছবিটি তুলে ধরাই উপন্যাসের প্রধান কাজ। আধুনিক যুগের ক্রমবর্ধমান জীবনাকাঙ্ক্ষা ও জীবনকৌতূহল তাই উপন্যাসকেই আশ্রয় করেছে এবং একালের সাহিত্যের এটিই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপযোগী বাহন।

জীবনের এই সামগ্রিক চিত্রায়নের অনুপ্রেরণায় ঔপন্যাসিক উপন্যাস রচনা করেন বলেই তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে জীবনসম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিটিও আভাসিত হয়ে পড়ে। রচনার মধ্যে স্বকীয় দর্শনের অভিব্যক্তি সাহিত্যমাত্রেই লক্ষ্য করা গেলেও, উপন্যাসের পাতায় তার যে নিপুণ ও বিস্তৃত প্রকাশ থাকে, অন্যত্র তা সুলভ নয়। জীবনের ক্রমবিকাশের সঙ্গে জীবনের জটিলতাও ক্রমবর্ধমান আকার ধারণ করেছে এবং জীবনদৃষ্টিতেও তাই প্রথানুগত্যের পরিবর্তে স্বকীয়তার প্রসার উত্তরোত্তর বেড়েছে। প্রাচীন মহাকাব্যের মহাকবিগণ দেশান্তরে ও কালান্তরে মহাকাব্য রচনা করলেও, তাঁদের জীবনবোধের মধ্যে একটি সর্বজনীন ঐক্যসূত্র সহজেই লক্ষ্য করা যায়। জীবনের বিরাটত্ব, স্বর্গমর্ত্য পাতাল বিহারী কল্পনার অবাধ সঞ্চরণ ও গঠনের একটি সর্বজনস্বীকৃত দৃঢ়বদ্ধ আঙ্গিকরীতি প্রতিটি মহাকাব্যেই, তা আর্য অথবা আলংকারিক, যাই হোক না কেন,—সহজেই দেখতে পাওয়া যায় ও চিনে নিতে ভুল হয় না। বলা চলে যে, মহাকাব্যে মহাকবিদের একটি সাধারণীকৃত জীবনদৃষ্টি ছিল, যার অভিন্ন আলোকসম্পাতে পৃথক যুগ ও কালে তাঁরা জীবনকে দেখেছেন। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকের স্বকীয়তায় এই রীতি বদলে গেছে ও প্রতিটি ঔপন্যাসিক জীবনকে তাঁদের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণেই পর্যবেক্ষণ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সমালোচক বলেছেন,

"Every novelist, then gives us in his novel his own personal idiosyn cratic vision of the world....To create such a world is not the highest achievement of a novelist, but unless he does so he never reach the highest"[২]

এই স্বকীয় বিশিষ্ট দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের অনুধ্যান ও রূপায়নেই ঔপন্যাসিকের সিদ্ধি। তাই প্রতিটি উপন্যাসেই জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, উপস্থাপনাপ্রণালী ও গঠন সৌষ্ঠবের মধ্যে একটি প্রথাসিদ্ধ সর্বজনীন ঐক্যের বদলে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাই থাকে সমধিক। তাই দুজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে যেমন জীবনদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য, দুই উপন্যাসে তেমনি গঠনরীতির ফারাক। উপন্যাসের বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাই গঠনরীতির পরিবর্তনের প্রসঙ্গটিও কম উল্লেখযোগ্য ও দরকারী নয়।

॥ ২ ॥

উপন্যাসের মূল ভিত্তিভূমিটি নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন,

"The basis of a novel is a Story is a narrative of events, arranged in time-sequence."[৩]

কাহিনী, গল্প বা ঘটনাবিবৃতি উপন্যাসের মূল ভিত্তি। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে বিশিষ্ট মনোভঙ্গি উপন্যাসিক আয়ত্ত করেছেন, গল্পের বা কাহিনীর বা ঘটনাবিবৃতির মধ্যস্থতায় তা তিনি পাঠকসাধারণের সমীপে হাজির করে থাকেন। অবশ্য এই গল্প বলার রীতির মধ্যে ঔপন্যাসিকের কিছুটা স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে এক বিশিষ্ট গ্রন্থনকৌশল ও নির্মাণচাতুর্য, যার যোজনায় গল্প অনায়াসে উপন্যাসের কাহিনীতে পর্যবসিত হতে পারে। উপন্যাসের গল্পবস্তুর এই বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ রূপটিকেই বলা হয়ে থাকে Plot এই প্লটের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে তাই সমালোচক বলেন,

"Let us define a Plot. we have defined a Story as a narrative of events in their time-sequence. A Plot is also a narrative of events, the emphasis falling on causality"[৪]

গল্পে ও প্লটে মৌলিক একটি পার্থক্য থাকলেও, সাধারণভাবে উপাদানগত কোনো তফাৎ নেই। উভয়ের মধ্যেই ঘটনাবিবৃতির স্বভাব ও নিয়ম উপস্থিত, কিন্তু গল্প যেখানে সময়ের পারম্পর্যে ঘটনাকে ধরে রাখতে চায়, প্লট সেখানে যুক্তি ও কার্যকারণের শৃঙ্খলার পারম্পর্যে ঘটনাকে সর্বাঙ্গীণ ঐক্যসূত্রে বিধৃত করে রাখে। প্লটের এই বিশেষ স্বভাবধর্মের জন্য অনেকে তাকে কাহিনীবৃত্ত বলে অভিহিত করতে চান। বৃত্তের যেমন একটি অবিসংবাদী কেন্দ্রস্থল আছে, যার ওপর নির্ভরশীল হয়েই পরিধির প্রতিটি ক্ষেত্রই আপন আপন স্বাতন্ত্র্যসত্ত্বেও সুদৃঢ়ভাবে কেন্দ্রনিবদ্ধ হয়ে থাকে, উপন্যাসের প্লটের ব্যাপারেও তাই। এখানেও কার্যকারণের অমোঘ শৃঙ্খলার কেন্দ্রভূমিতে প্রতিটি ঘটনাই সম্পর্কিত ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে অবস্থান করে। একটি উপন্যাসে তাই একাধিক গল্পবস্তু অনায়াসেই অবস্থান করতে পারে, কিন্তু একাধিক প্লট কোনমতেই সম্ভবপর নয়। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক এই প্লটের সুসংহত কেন্দ্রটিতেই জীবনঘটনার বৈচিত্র্যের মধ্য থেকে তাঁর জীবনদর্শনের স্থির বিন্দুটিকে বিন্যাস করে নিতে পারেন।

প্লটের এই কেন্দ্রবিন্দুটি প্রায় উপন্যাসেই তার প্রধান চরিত্র বা নায়কের মধ্যেই ঔপন্যাসিক খুঁজে পান। যে বিচিত্র ঘটনাপর্যায় তাঁর বর্ণনীয়, যে বিশিষ্ট সামাজিক জীবনের ছবি তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হতে চায়, তাকে একটি অচ্ছেদ্য ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার কাজে নায়ক চরিত্র তাঁর প্রধান সহায়ক। একটি কেন্দ্রীয় চরিত্র, যার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক তাঁর aim ও spirit প্রকাশ করতে চান, যার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা জীবন সম্পর্কে লেখকেরই মতের সমর্থন জানায়, উপন্যাসের সমগ্র ঘটনাবলীর যে মেরুদণ্ডস্বরূপ, যার অবলম্বনেই

ঘটনাপর্যায়গুলি পারম্পর্যযোগে বৃত্ত হয়ে ওঠে, উপন্যাসের সেই নায়কচরিত্রই উপন্যাসের গঠনরীতির নিয়ামক শক্তি রূপে বিবেচিত হতে পারে। বলা চলে যে, এই নায়কচরিত্রের কেন্দ্রীয় বিন্দুটিতে স্থিরনিবদ্ধ হয়েই ঔপন্যাসিক তাঁর ঘটনাবৃত্তের পরিধিসীমা স্থির করে থাকেন। তাই উপন্যাসের প্লট ও তার আঙ্গিক-নির্ধারণে নায়কচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুধাবনীয়।

॥ ৩ ॥

উপন্যাস তার জন্মলগ্ন থেকে বিবর্তনের ধাপে ধাপে ক্রমশঃ আধুনিক যুগের সীমায় এসে পড়ে তার আদিম স্বভাব ও রূপ থেকে অনেকখানি দূরবর্তী ও স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। একদা ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে জীবনের বৈচিত্র্যকে অনুভব করার যে তাগিদ ঔপন্যাসিক অনুভব করেছিলেন, উপন্যাসের পটে বিশাল দেশ ও কালের বিস্তৃত ঘটনা ও মানবচরিত্রকে ধরতে চেয়েছিলেন, তা ক্রমশঃ একালের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মননশীলতার যুগে সংকীর্ণ, বীক্ষণধর্মী ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়েছে। উপন্যাসের সমালোচকেরাও এই বিবর্তন ধারাটিকে লক্ষ্য করে তাই প্রতি পর্বের উপন্যাসের স্বতন্ত্র স্বভাবধর্মটিকে খুঁজে পেতে চেয়েছেন ও এই পরিবর্তনধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে উপন্যাসকে এ্যাকশন, ক্যারেকটার, ড্রামাটিক, ক্রনিক্‌ল, পিরিয়ড, প্রভৃতি নানা আখ্যায় ভূষিত করে তার স্বতন্ত্র রূপগুলির স্বভাব-ধর্মটিকে নির্ণয় করতে চেয়েছেন।[৫] প্রথমতঃ একান্তভাবেই আধুনিক যুগের সৃষ্টি বলে, উপন্যাসের রূপরীতির কোন স্থিরনিবদ্ধ ও সর্বজনস্বীকৃত নিয়মবিধি গড়ে ওঠেনি। তাই প্রতিটি ঔপন্যাসিকই তাঁদের স্ব স্ব জীবনবোধের তাগিদে রূপরীতির নবনব দিগন্তকে উন্মোচিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ আধুনিক যুগের স্বল্পকাল সীমার মধ্যেই বিশ্বব্যাপী পরিবর্তনের যে বিপুল পালাবদল ঘটেছে, তাতে মানুষ কোনকিছুর ওপরেই তার অবিচল আস্থা ও অসংশয়িত বিশ্বাস ধরে রাখতে পারেনি। বিজ্ঞানে-দর্শনে-ভূগোলে-ইতিহাসে যে বিপুল পরিবর্তন এই স্বল্পস্থায়ী কালসীমার সংঘটিত হয়েছে, তাকে যুগান্তকারী বললেও বেশী বলা হয় না। এই পরিবর্তনমানতার পটভূমিতে তাই উপন্যাসের রূপরীতি ও ধ্যানধারণার নানামুখী বিকাশ-বিবর্তন, পরিণতি-পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা গেছে। তাই দিশেহারা সমালোচকবর্গও এই নবোদ্ভূত সাহিত্যশিল্পটির রূপান্তর ও পালাবদলে বিভ্রান্ত হয়ে, তার একটি স্থির ও আদর্শরূপ খুঁজতে গিয়ে বারেবারেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। তাই যাকে তিনি ক্যারেকটার-নভেল বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন, তাতে ড্রামাটিক নভেলের বিশিষ্টতা বারে বারে তাঁর চোখে পড়েছে, আর ক্রনিক্‌ল

বলে স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিন্যস্ত করলেও, তার মধ্যে একাধারে এ্যাকশন, ক্যারেকটার ও ড্রামাটিক, উপন্যাসের সব কটি বিশিষ্টতাই নির্বিরোধে স্থান করে নিয়েছে। আসলে, মহাকাব্য বা নাটকের মতো,উপন্যাসের এমন কোন স্থিরনিবদ্ধ শিল্পাদর্শ নেই, যার প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বস্ততায় লেখক তাঁর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। একটি অখণ্ড জীবনবোধ মহাকাব্য ও নাটকের প্রাণবীজ হলেও, তার রূপরীতিবিন্যাস পদ্ধতি এতই সুনিরূপিত যে, মহাকবি বা নাট্যকারকে আঙ্গিকের জন্য স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করতে হয় না। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি স্বতন্ত্র বলেই, তা সর্বপ্রকার নিয়ম শাসনের বহির্ভূত। উপন্যাসে সর্বপ্রকার শিল্পরূপের সমন্বয় দেখা যায়, তা একাধারে কাব্যিক ও নাটকীয়, মননধর্মী ও মহাকাব্যিক। তাই তার আঙ্গিকেও এই মিশ্রধর্মিতা লক্ষ্যণীয়। টলষ্টয়ের 'ওয়ারএ্যাণ্ড পীস' কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' তাই সহজেই 'এপিক উপন্যাস' হিসাবে আখ্যাত হতে পেরেছে।

নাট্যকারের মতো আঙ্গিকের কোন স্থির শিল্পাদর্শ না থাকায়, ঔপন্যাসিককে কিরকম সমস্যার মুখোমুখী হতে হয়, একালের একজন মননশীল ঔপন্যাসিকের বক্তব্যে তা চমৎকার ধরা পড়েছে,—

> "আইডিয়াটিকে মগজ থেকে কাগজে নামিয়ে দেখা গেল, বাদল, সুধী, উজ্জয়িনী আমার হুকুম মানছে না। অবাধ্য সন্তানের মতো, যা খুশি বলে, যা খুশি করে, যেখানে ইচ্ছা চলে যায়। দেখতে দেখতে তাদের চরিত্র বদলে গেল। সম্বন্ধ বদলে গেল। মানস সরোবর থেকে নির্গত হয়ে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুই বিপরীত দিকে প্রবাহিত হলো। গঙ্গাধাবিত হলো তৃতীয় দিকে।...এই তিন নদনদীর সঙ্গ নিল বহু উপনদ উপনদী শাখানদ শাখানদী। তাদের সবাইকে রূপকের অঙ্গীভূত করা যায় না, তারা এক একটি শক্তি নয়, ব্যক্তি।"[৬]

উপন্যাসের আঙ্গিক যে পূর্বনির্ধারিত কোন বিশেষ ধ্যানের আদর্শ থেকে আসেনা, তার সত্যতা যেমন এই বক্তব্যে ফুটেছে, তেমনি ফুটেছে উপন্যাসের আর একটি সত্য। উপন্যাসের রূপ নির্ধারণ করে তার চরিত্রাবলী, তাদের ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায়, কর্মে ও মননে, তাদের রূপকত্বে নয় ব্যক্তিত্বে। চরিত্র উপন্যাসকে যেমন নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে, তেমনিভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে তার গঠন বিশিষ্টতাকে। একালের ভাবনায় তাই প্লটের ওপরে চরিত্রসৃষ্টির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে এবং চরিত্রের হাত ধরেই কাহিনী তার বৃত্তধর্মটিকে খুঁজে পায়। উপন্যাসের এই বিশিষ্ট শক্তিধর চরিত্রাবলীর কেন্দ্রীয়

চরিত্র উপন্যাসের নায়ক। তাই একথা সহজেই মেনে নেওয়া চলে যে, উপন্যাসের গঠনরীতি বা আঙ্গিকের ক্রমবিকাশের নিয়ামকশক্তি উপন্যাসের নায়ক। তার বিকাশ ও বিবর্তনের রূপরেখাটিকে অনুসরণ করেই আধুনিক উপন্যাস তার আঙ্গিকের বিশিষ্টতা ও ধর্মটি বিকশিত ও বিবর্তিত করেছে। বাংলা উপন্যাসের গঠনগত বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' থেকে যাত্রা শুরু করে বাংলা উপন্যাসেও আঙ্গিকের যে বিশিষ্ট বিবর্তনধারাটি লক্ষ্য করা যায়, আমাদের মতে, নায়কের কেন্দ্রীয় নিয়ামকশক্তিই তাকে রূপ থেকে রূপান্তরে নিয়ন্ত্রিত করে করে এসেছে।

॥ ৪ ॥

'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসটির বিচারে ডঃ সুকুমার সেন এটিকে চিত্রোপন্যাস বা পিকারেস্ক ধরণের নভেল বলে অভিহিত করেছেন।[৭] এই শ্রেণীর উপন্যাসের স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে সমালোচক বলেছেন,

"The object of Picaresque novel is then to take a cetnral figure through a succession of events, introduce a great number of characters, and thus build up a picture of society."[৮]

আলালে এই বিশিষ্ট উপন্যাসধর্মটি সর্বতোভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এর কেন্দ্রীয় চরিত্র মতিলাল, তার কথা বলতে গিয়ে অসংখ্য ঘটনার বিচিত্র পর্যায়, একই সঙ্গে অসংখ্য বিভিন্নধর্মী মানুষ ও সমকালীন সমাজের গোটা ছবিটিকে লেখক উদ্‌ভাসিত করে তুলেছেন। যেহেতু এখানে প্রধান লক্ষ্য বিচিত্র মানুষ ও বিশেষ সামাজিক পরিমণ্ডলটিকে তুলে ধরা, তাই স্বভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক মতিলাল-চরিত্রই লেখকের একমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করেনি। অপেক্ষাকৃত জীবন্তচরিত্র বলে ঠকচাচাকে সমালোচক[৯] গ্রন্থের নায়ক হিসাবে গ্রহণ করতে চাইলেও, মতিলালই এই উপন্যাসের নায়ক; কারণ তার জীবনবৃত্তান্ত, তার শিক্ষাদীক্ষা, তার কুসঙ্গ ও অধঃপতন ও পরিণামে চৈতন্যোদয় ও উত্তরণই লেখকের প্রধান অন্বিষ্ট রূপে পরিগৃহীত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনে উপন্যাসের নায়কচরিত্র সার্থক হয়, এই আদি রচনাটিতে তার পরিপূর্ণতা দেখা যায় না। কেননা, এখানে চরিত্রটির আন্তরিক কোন সমস্যা, জটিলতা ও উত্তরণ লেখক দেখাতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন, নবোদ্ভূত বাবু-সমাজের বিস্তৃত পটভূমিকাটির স্বরূপ উন্মোচন করতে। তাই মতিলাল নায়ক হয়েও গোটা গল্পবস্তুটির একমাত্র নিয়ামকরূপে

আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। উপন্যাসের নায়ক তার সর্বাঙ্গীন বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে আবির্ভূত হবার জন্য তাই বঙ্কিমী উপন্যাসের অপেক্ষায় কাল গুণছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই প্রথম সার্থক শিল্পসমৃদ্ধ উপন্যাস ও চরিতার্থ নায়ক রূপলাভ করেছে। উপন্যাসের গঠনরীতি বা আঙ্গিক নিয়ন্ত্রণে নায়কের যোগ্য ভূমিকাটি তাই বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর পরবর্তী বাঙালী ঔপন্যাসিকদের রচনাতেই যথার্থভাবে সম্পাদিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে।

॥ ৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; তখন থেকে সার্থক শিল্পরূপ নিয়ে বাংলা উপন্যাস আত্মপ্রকাশ করে। ইংরাজী সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি ও ঔপন্যাসিক সার ওয়াল্টার স্কটের 'আইভ্যান হো' উপন্যাসের সঙ্গে 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাদৃশ্য লক্ষ্য করে সেকালে অনেকেই বইটির ওপরে স্কটের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র বলেন যে, দুর্গেশনন্দিনী রচনার পূর্বে তিনি 'আইভ্যান হো' পড়েননি। স্কটের মৃত্যু হয় ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে, সেকালের সাহিত্যিক শ্রেষ্ঠ ও ইংরাজী সাহিত্যের পরম রসিক বোদ্ধা বঙ্কিমের কাছে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দেও 'আইভ্যান হো' অপরিচিত থাকায় বঙ্কিমের উপন্যাস রচনার প্রেরণাভূমিটি অন্যত্র সন্ধান করা দরকার। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে গড়ে-ওঠা ইংরাজী নভেলের নতুন ধারাটির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অপরিচয় ছিল না। হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয় বসন্ত', প্যারীচাঁদের 'আলাল' কিংবা রেভারেণ্ড লাল বিহারীদে'র 'চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান' বা 'গোবিন্দ সামন্ত' রচনার নেপথ্যে ইংরাজী নভেলের একটি সুগভীর প্রভাব নিহিত ছিল। কিন্তু তবুও একথা আমরা স্বচ্ছন্দেই মনে করতে পারি যে, উপন্যাসের বিশিষ্ট শিল্পরীতি সম্বন্ধে বাঙালী লেখকদের কোন স্পষ্ট ধারণাই দানা বেঁধে ওঠেনি। অবশ্য ইংরাজী নভেলের ক্ষেত্রেও যে কোন দুজন ঔপন্যাসিকের মধ্যে আঙ্গিকের দিক দিয়ে যে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হতো, তাতে উপন্যাসের গঠনরীতি সম্পর্কে একটি স্থির আদর্শ গড়ে তোলাও বাঙালী লেখকদের পক্ষে সহজ সাধ্য ছিল না। জেন অস্টেনের সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্কট বলেছেন যে, গত পনেরো থেকে তিরিশ বছরের মধ্যে উপন্যাসের ধ্যানধারণা ও রূপচেতনা সম্পর্কে ভাবনাগুলি আমূল বদলে গেছে। তাই 'instead of splendid sense of an imaginary world, a correct and striking represntation of that which is daily taking place around us' উপন্যাসের বিষয়রূপে গৃহীত

হয়েছে ও রূপেও লক্ষণীয় পরিবর্তন সাধন করেছে। এই মন্তব্যটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের। উইল্‌কি কলিন্‌স তাঁর 'The woman in white'-এর ভূমিকায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বলেন, It may be possible in novel-writing to present characters successfully without telling a story…" জর্জ এলিয়টও তাঁর বক্তব্যে জানিয়েছিলেন যে, নভেলের কোন স্থিরনির্দিষ্ট রূপরীতি বা আঙ্গিক নেই, জীবনের মতোই তা বিচিত্র ও বহু।

নভেলের জন্মভূমি ইংলণ্ডেই যখন উপন্যাসের স্বরূপ ও স্বভাব সম্বন্ধে এমন অনিশ্চিত ধ্যান-ধারণা তখন বাঙালীর কাছে যে তার কোন একটি স্পষ্ট চেহারা দানা বেঁধে সংহত হতে পারেনি, এ বলাই বাহুল্য। তাই উপন্যাস লিখতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র কোন ঔপন্যাসিকের আঙ্গিককে আদর্শরূপে গ্রহণ না করে গ্রহণ করলেন শেকসপীয়রকে, যাঁর নাট্যসৃষ্টিতে তিনি একাধারে জীবন ও জীবন-রহস্যের সম্মেলন দেখতে পেয়েছিলেন একটি দৃঢ়বদ্ধ শিল্পসমৃদ্ধ রূপে ও আঙ্গিকে। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র প্রেরণায় তিনি অন্য কথার সঙ্গে একথাও স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন যে, এই সময়ে তিনি শেকসপীয়রের নাটকাবলীর একনিষ্ঠ পাঠক ছিলেন ও তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে শেকসপীয়রের প্রেরণাই ক্রিয়াশীল ছিল সর্বাধিক পরিমাণে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাস রচনায় নাট্যরীতিকেই, বিশেষ করে ট্র্যাজেডির রীতি ও আঙ্গিককেই গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন সর্বপ্রযত্নে। তাই নাটকের মতো তাঁর উপন্যাসেও ছিল একটি গঠনগত দৃঢ়বদ্ধতা এবং সমগ্র ঘটনাবস্তুর কেন্দ্রবিন্দু ছিল নায়কচরিত্র, যার প্রভাবে ও প্রবর্তনায়, নির্মাণে ও নিয়ন্ত্রণে সমগ্র রচনার আঙ্গিকটি সুনির্দিষ্ট রূপ আয়ত্ত করেছিল।

পরিচ্ছেদবিভাগ, পরিচ্ছেদগুলির স্বতন্ত্র নামকরণ, একটি পরিচ্ছেদ থেকে পরবর্তী পরিচ্ছেদে অগ্রগতির মধ্যে কার্যকারণ ও পারম্পর্যের নৈয়ায়িক শৃঙ্খলা-রক্ষা—বঙ্কিমের উপন্যাসের গঠনরীতিকে একটি নাটকীয় ঐক্যে সংহত করে রেখেছে। ট্র্যাজেডিতে যেমন সূচনা থেকে পরিণাম পর্যন্ত নায়কের অনিবার্য শোচনীয় পরিণাম সংঘটনের একমুখী লক্ষ্যে সব ক'টি চরিত্র ও ঘটনা সম্মিলিত-ভাবে অগ্রসর হয় ও অভীষ্ট ও অনিবার্য পরিণতিতে না পৌঁছানো পর্যন্ত যাত্রাভঙ্গ করে না, বঙ্কিমের উপন্যাসেও অনুরূপ রীতিপদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা তাঁর 'বিষবৃক্ষ' রচনাটিকে গ্রহণ করতে পারি। অনিন্দিত-চরিত্র নায়কের মনে অসংবরণীয় রূপতৃষ্ণা জাগ্রত হলে তার অসংযত আবেগে কেমন করে মানবজীবন ও সংসারজীবনের শান্ত সমাহিত পরিসর কেন্দ্রচ্যুত ও

বিশৃঙ্খল হয়ে একটি চরম দুর্ঘটনার জন্ম দেয়, এই উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম তারই চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। 'বিষবৃক্ষ'—এই তাৎপর্যপূর্ণ নামটির প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে লেখক উপন্যাসের ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে বীজ উপ্ত হওয়া, তার অঙ্কুরোদ্‌গম, বিকাশ, পরিবর্ধন, মহীরুহরূপধারণ ও সর্বশেষে উচ্ছেদের নিপুণ পর্যায়ক্রমিক ছবি এঁকেছেন। নাটকের মতোই পূর্ব প্রসঙ্গ বর্ণনা বা exposition-এর সূচনা থেকে তিনি ক্রমশঃ চূড়ান্ত বা climax-এর ধাপ পেরিয়ে পরিণতির শেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। ঘটনার এই সূচনা, ক্রমবিকাশ ও পরিণামের সর্বস্তরে আমরা দেখি যে, লেখকের সমস্ত দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ উপন্যাসের নায়ক নগেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে গল্পবস্তুগুলিকে প্লটের গ্রন্থনে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। উপন্যাসের একটি সামান্যতম ঘটনাও বিবৃত হয়নি, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত নায়কের কোন সংযোগ বা সম্পর্ক নেই। নায়ক এখানে ঘটনাবলীর নীরব দর্শকমাত্র নয়, তার প্রতিটি আচার-আচরণ, সচেতন অভিপ্রায়, গল্পের প্রতিটি পদক্ষেপকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তার নিটোল গঠনধর্মটিকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

'সীতারাম' উপন্যাসের গঠনগত ঐক্যচবনার বিষয়টিও এই দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। এর কেন্দ্রীয় পুরুষ ও নায়ক চরিত্র স্বয়ং সীতারাম। সীতারামের উন্নতচরিত্র, বীরত্ব, প্রগাঢ় দার্শনিকতা কেমন করে রূপমোহের অসংবরণীয় অসংযমে পতনের একেবারে শেষধাপে নেমে গেল, বঙ্কিম ঘটনা-বিন্যাসের চাতুর্যে ও নৈয়ায়িক পারম্পর্যে তা আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বিবৃত করেছেন। নানা ফুলের বৈচিত্র্য যেমন একটি অখণ্ড সূত্রের অচ্ছেদ্য ঐক্যে একটি মালারূপে ধারণ করে, বঙ্কিমও তেমনি নায়ক চরিত্রের অচ্ছেদ্য ঐক্যে উপন্যাসের সমগ্র ঘটনাবলীকে একটি ঐক্যসূত্রে গ্রন্থন করে পরিপূর্ণ প্লটনির্মাণে সাফল্য দেখিয়েছেন। এই উপন্যাসেও প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের উপস্থাপনা প্রত্যক্ষত অথবা পরোক্ষত নায়ক সীতারামের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং তারা পরস্পরের সংযোগে সম্মিলিতভাবে সীতারামের অনিবার্য পরিণামকে ত্বরান্বিত করে তুলেছে। এখানেও নায়কচরিত্র তার সক্রিয়তা ও জীবন্ত সত্তা দিয়ে প্রতিটি ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে নিজেকে সংস্থাপিত করতে পেরেছে।

নাটকীয় রীতি বঙ্কিমের উপন্যাসরচনার আদর্শ থাকায়, বিশেষ করে শেকসপীয়রের ট্র্যাজেডির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও গভীর পরিচয় থাকার ফলে, বঙ্কিম তাঁর গঠনরীতির ক্ষেত্রে এই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। শেকসপীয়রের মতো তাই তাঁর রচনায় যুক্তিগ্রাহ্য পারম্পর্যের পাশে পাশে অনায়াসেই

অতিপ্রাকৃত বিষয় ও দৃশ্য সন্নিবেশিত হতে পেরেছে। তাঁর সমস্ত লক্ষ্য এই সামগ্রিক ঐক্যবিধৃত ঘটনাবৃত্তকে একান্তভাবে আশ্রয় ও অবলম্বন করেছে বলেই, ট্র্যাজেডির নায়কের মতো, তাঁর নায়কচরিত্রও একই সঙ্গে গতিশীল ও নিয়ামকশক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনাপ্রধান, নাট্যরীতি নিয়ন্ত্রিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আঙ্গিকের দৃঢ়বন্ধ সংহত শিল্পমূর্তি তাঁর কল্পনায় ধরা নায়কের পরিপূর্ণ মূর্তিটির মতোই তাই স্পষ্ট ও বোধগম্য।

॥ ৬ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত পথে যাত্রারম্ভ করলেও, ঔপন্যাসিক হিসাবে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা ছিল ভিন্নধর্মী। তিনি বঙ্কিমের মতো নাটকীয় রীতিটিকেই উপন্যাসের আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ না করে, উপন্যাসকে স্বতন্ত্র গঠনরীতির আনুকূল্য দিয়েছিলেন। বঙ্কিম যেখানে ঘটনাগ্রন্থনকেই পরিপূর্ণ কাহিনীবৃত্ত সংরচনার সর্বাগ্রগণ্য বিষয়রূপে নির্দিষ্ট করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে মানবচরিত্রের অন্তরঙ্গ স্বভাবপ্রকাশকেই ঔপন্যাসিকের একমাত্র কৃত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ফলে, তাঁর রচনায় তিনি কোন একটি স্থিরনির্দিষ্ট রূপরীতির ফ্রেমে মানবজীবনকে বেঁধে রেখে দিয়ে উপন্যাসের গঠনরীতি নিয়ন্ত্রণ করতে চাননি; বরং তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা উপন্যাসের পাতায় স্বেচ্ছাবিহারী হয়ে তাদের নিজ নিজ মনের আন্তরিক প্রেরণায় গতিশীল ও কর্মচঞ্চল হয়ে উপন্যাসের আঙ্গিকটিকে রচনা করে তোলে। ফলে বঙ্কিমের রচনায় যে জ্যামিতিক নিষ্ঠা বিষয় উপস্থাপনা ও উপপাদ্যের মানসিকতা তাঁর উপন্যাসে আদি-মধ্য-অন্ত্য-যুক্ত গঠনগত ঐক্যবিধান করে, রবীন্দ্রনাথে তা পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বঙ্কিমের নায়কচরিত্রের মতো রবীন্দ্রনাথের নায়কগণ আদ্যন্ত একটিমাত্র ভাবনাবৃত্তের ক্রমবিকাশকেই রূপায়িত করে না মাত্র, বরং নানামুখী ভাবসংঘাতের জটিলতায় স্বভাবতই বিপর্যস্ত ও কেন্দ্রবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসেই সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাস বঙ্কিমী-গঠনচাতুর্যের সুসংহত ও সুবিন্যস্ত কেন্দ্রটি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। প্রথম দুটি ইতিহাসাশ্রয়ী উপন্যাস বাদ দিলে, একমাত্র 'নৌকাডুবি' ও 'গোরা' ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আর কোন উপন্যাসেই গঠনরীতির সৌষ্ঠব কোন দৃঢ়বন্ধ কাহিনীবৃত্ত নির্মাণে সক্ষম হতে পারেনি।

এর কারণ হিসাবেও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পরিকল্পিত নায়কচরিত্রের বিশিষ্টতার কথা এসে পড়ে। 'নৌকাডুবি'র রমেশ কিংবা 'গোরা'র গোরা, এই দুই নায়কই রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপরিবিত একটি অখণ্ড ভাবনাকেই

প্রকাশ করতে চেয়েছে। এ দুটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ তাদের সম্পর্কে পূর্বেই ভেবে-রাখা ধারণাকে কাহিনীর ঘটনাময়তার মধ্যে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। তাই এই দুটি উপন্যাসে নায়কচরিত্র পরিকল্পনার সম্পূর্ণতার জন্যই গোটা কাহিনীর সূচনা, বিস্তার ও পরিণতির মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ আদি-মধ্য অন্ত্য-যুক্ত গ্রন্থন-নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়। রমেশ এবং গোরা, এই দুই নায়কই কাহিনীর সমগ্র ঐক্যসূত্রটিকে যেন তাদের নিজ নিজ হাতেই ধরে রেখেছিল। তাই বিচিত্র ঘটনা-পরম্পরা ও বিভিন্ন স্থানকালের মধ্যদিয়ে ঘটনাগতি অগ্রসর হলেও তা কখনোই কেন্দ্রবিচ্যুত হয়ে পড়েনি। রমেশ ও হেমনলিনীর প্রেম ও তার সুখকর পরিণাম ও গোরার জীবনে সংকীর্ণতা থেকে বিরাটত্বে উত্তরণ, এই দুই প্রধান ধারা স্বচ্ছন্দ ও বাধাহীন গতিতে তাদের ঈপ্সিত পরিণাম পথে অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পৌঁছোতেও পেরেছে। উভয়ক্ষেত্রেই নলিনাক্ষ এবং বিনয় সহযোগী নায়করূপে থাকলেও, লেখকের কল্পনা কখনো নায়কের স্থির কেন্দ্রটি থেকে মুহূর্তের জন্যও সরে আসেনি এবং গল্পের গঠনগত ঐক্যটিও খণ্ডিত হবার অবকাশ পায়নি।

একদিক থেকে দেখলে, 'নৌকাডুবি'কে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যে ব্যতিক্রম বলেই মেনে নিতে হয়। 'চোখের বালি'র সূচনা হিসাবে পরবর্তী-কালের লেখা বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, উপন্যাসের রীতি বদলে যাচ্ছে। কেবলমাত্র ঘটনাবিবৃতিই নয়, কেবলমাত্র একটি সর্বাঙ্গসুন্দর গল্প গঠন করাই উপন্যাসের প্রধান দায়িত্ব বা কর্তব্য নয়; তার বদলে মানবচরিত্রের গহন-গভীরে ডুব দিয়ে চরিত্রের আঁতের কথাটিকে টেনে বের করে দেখানোই ঔপন্যাসিকের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কর্তব্য। উপন্যাস রচনায় এই নবপর্যায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

> "সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোখের বালিতে।"[১০]

এই নতুন পদ্ধতি ততখানি আন্তরিকতার সঙ্গে গৃহীত হয়নি বলেই, এতে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ প্রাধান্য পেয়েছে এবং নায়ক রমেশ এই ঘটনাপরম্পরার কেন্দ্রীয় সূত্র হিসাবে তার গঠনগত ঐক্যটিকে যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছে। অসংখ্য চরিত্র ও প্রসঙ্গ উপন্যাসে আবির্ভূত ও আলোচিত হলেও, লেখকের দৃষ্টি কখনোই এই কেন্দ্রটি থেকে বিচ্যুত হয়নি। তাই এর সুষ্ঠু, বোধগম্য ও স্পষ্ট পরিণাম সংঘটিত হয়েছে। 'গোরা'তে পুরোনো পর্যায় 'ও

নব পর্যায়ের সার্থক সমন্বয় সাধিত হয়েছে। এতে যেমন ঘটনা-পরম্পরার নিপুণ পরিবেশন আছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে মানবচরিত্রের গভীর গহন থেকে তার আঁতের কথাটিকে টেনে বের করে দেখানো। প্লট-প্রধান ও চরিত্র-প্রধান, ঘটনাবিবৃতি ও বিশ্লেষণধর্মিতা—উপন্যাসের এই দুটি রীতির এমন সার্থক দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে আর দুটি আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু 'গোরা'তে লেখকের কল্পনা কখনোই গোরার কেন্দ্র থেকে মুহূর্তের জন্যও সরে যায়নি। বিনয় ও ললিতার কাহিনী পরিমাণগতভাবে অনেকখানি স্থান দখল করলেও, উপন্যাসের মূল কেন্দ্রবিন্দুটিকে কখনোই স্থানচ্যুত করেনি। গোরার ব্যক্তিত্ব, তার ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কবিতর্ক মানবজীবনের সমীপস্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা, চরঘোষপুরের ঘটনা, কারাবাস ও সর্বশেষে উত্তরণ,—প্রতিটি বিষয়ে লেখকের অভিনিবেশের একাগ্রতা সমগ্র রচনাটির মধ্যে একটি সামগ্রিক ঐক্য বিধান করেছে, প্লটটিকে নিখুঁত সম্পূর্ণতা দিয়েছে। এই রচনায় গোরার নায়কত্ব অবিসংবাদী, লেখকের প্রতিটি ঘটনাসন্নিবেশ, তার চরিত্রেব এই উত্তরণকে রূপায়িত করার তাগিদ থেকে সৃষ্ট।

কিন্তু 'চোখের বালি'তে ঠিক এইরকম আঙ্গিকের নিটোলতা বা প্লটরচনার দৃঢ়বদ্ধতা দেখা যায় না। যদিও মহেন্দ্র এখানকার নায়ক, তথাপি বিহারীর প্রতিও লেখকের মনোযোগ নেহাৎ কম নয় এবং বিনোদিনীকে ঘিরে মহেন্দ্র-বিহারীর মানসিক দ্বন্দ্ব-জটিলতা, মায়ের ঈর্ষা এবং আশার সারল্য তাতে আরো বিভিন্নমুখী তাৎপর্য ও মাত্রা যোজনা করেছে। ফলে, একদিকে যেমন চরিত্রের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ এতে প্রাধান্য পেয়েছে, তেমনি অন্যদিকে নায়কের কেন্দ্রীয় গুরুত্ব অনেকখানিই হ্রাস পেয়েছে। আখ্যানের প্রতিটি ঘটনাই তাই একান্তভাবেই নায়ক-নির্ভর বা কেন্দ্রনিবদ্ধ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি এবং উপন্যাসের গঠনরীতির মধ্যে এই ঐক্যগত বিপর্যয় দৃঢ়বদ্ধ প্লটের বদলে অনেকাংশে শিথিল প্লটবিন্যাসের রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই চরিত্রবিশ্লেষণজনিত প্লটের শিথিলতা খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে 'চতুরঙ্গে'র ক্ষেত্রে। গোরা'র পরেই 'চতুরঙ্গ'। 'গোরা'তে গঠনগত দৃঢ়বদ্ধতার চূড়ান্ত সাফল্যের পর 'চতুরঙ্গে'র মধ্যে তা তার কেন্দ্রীয় ঐক্যটি সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলেছে। 'জ্যাঠামশাই, 'শচীশ, 'দামিনী', ও 'শ্রীবিলাস' উপন্যাসের এই চতুরঙ্গে বিধৃত ঘটনাবস্তুটি শচীশের আত্মোপলব্ধির ধারাবাহিক পর্যালোচনার ইতিবৃত্ত হলেও, গঠনগত ঐক্য এখানে অক্ষুণ্ণ থাকেনি। বিদগ্ধ সমালোচক পৌনঃপুনিক বিচার করেও এটিকে 'আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত' না বলে

পারেন নি।[১১] এই অভিমতের নেপথ্যে তাঁর যুক্তিগুলি সর্ববাদীসম্মত না হলেও, একথা স্বীকার্য যে, রচনাটির কাহিনীবৃত্তের গঠন কিছুটা শিথিল, আঙ্গিকের এই পরিবর্তন ঘটেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক শচীশের ব্যক্তিত্বের অস্পষ্টতায় ও কিছুটা ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্নতায়। এক হিসাবে, গোরা ও শচীশ, উভয়েই সমপর্যায়ের মানুষ। জীবনের বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে ফিরে ফিরে উভয়েই সার্থকতার তীর্থে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে ও পেরেছে। আনন্দময়ীর কাছে গিয়ে তাঁকে ভারতবর্ষ বলে চিনে নিয়ে ও সুচরিতার হাত ধরে পরেশবাবুর চরণে প্রণতি জানিয়ে গোরা পৌঁচেছে তার সার্থকতায়। আর ঈশ্বরের যাত্রাপথের বিপরীত দিক দিয়ে যাত্রা শুরু করবার সত্য আবিষ্কার করে শচীশ পৌঁচেছে তার উপলব্ধির সার্থকতায়। কিন্তু তবুও 'গোরা'র ঘটনাবৃত্তের মধ্যে যে সমগ্রতার চেতনা রয়েছে, তা শচীশে নেই। মহাকাব্যিক স্পষ্টতা, সরলতা ও ঋজুতা গোরা চরিত্রের মতো 'গোরা'র আঙ্গিকটিকেও ঐক্যবদ্ধ শিল্পরূপে সমৃদ্ধ করেছে। শচীশের ইঙ্গিতগর্ভ অস্পষ্টতা, সাধনার সাংকেতিক গতিপথ, দামিনী ও শ্রীবিলাসের সঙ্গে তার সম্পর্ক ও ব্যবহারের রহস্যময় দুর্বোধ্যতা—সমস্ত কিছুই যেন এই গ্রন্থটির আঙ্গিককেও অনিরূপিত সমগ্রতায় প্রহেলিকার পর্যায়ে নিয়ে গেছে। এই রচনাটি অখণ্ড ঐক্যের বদলে খণ্ড খণ্ড চিত্ররূপেই আপন সার্থকতা সন্ধান করেছে। এখানে যদিও শচীশের সাধনার ইতিহাসই লেখকের প্রধান উপজীব্য ছিল, তথাপি শ্রীবিলাস চরিত্রের মধ্যেও লেখকের অভিপ্রায় মাঝে মাঝেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সমাহিত হতে চেয়েছে। ফলে, শ্রীবিলাস অনেকাংশেই শচীশের প্রতিস্পর্ধী নায়করূপে, অবশ্যই অনেকখানি Passive, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লেখকের কেন্দ্রীয় কল্পনা এইভাবে খণ্ডিত হওয়ায় রচনার আঙ্গিকেও এই খণ্ডতার রূপ আভাসিত হয়েছে। 'ঘরে বাইরে'তেও এই একই কারণে আঙ্গিকের বিশিষ্টতা বৈচিত্র্যের আড়ালে আপন শিথিলতা গোপন করতে চেয়েছে। 'শেষের কবিতা'য় নায়কচেতনা অনেকখানি একমুখী হলেও, বাক্যবাগীশ নায়ক সর্বকর্মের সঙ্গে পরিপার্শ্বের সঙ্গে প্রত্যক্ষত ও সক্রিয়ভাবে সর্বদা যুক্ত না হওয়ায়, তার গঠনরীতির মধ্যেও কিছুটা শৈথিল্য দেখা গেছে।

তবুও রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে মোটামুটিভাবে গঠনরীতিটি অনেকাংশেই দৃঢ়বদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো বহির্ঘটনাবহুল কাহিনী গ্রন্থন না করলেও, চরিত্রের আন্তরিক বিশ্লেষণ ও তার মানসিক গতিপ্রকৃতির মধ্যে তিনি অনেকখানি শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়েছেন। একমাত্র 'চতুরঙ্গ' ছাড়া আর কোন উপন্যাসে

তিনি নায়ককে প্রতীকধর্মী করে পরিবেশ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন করে ফেলেননি। তাঁর নায়করা মোটামুটিভাবে উদ্যোগী ও সক্রিয়, তাই আঙ্গিকের মধ্যেও ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু 'চোখের বালি'র মধ্যেই উপন্যাসের বিবর্তনের যে অনিবার্য ধারাটি সংগুপ্ত হয়েছিল, অচিরেই তা শরৎচন্দ্রের হাতে তার যথার্থ যাত্রাপথের হদিশ খুঁজে পেয়েছে। উপন্যাসের বহির্বাস্তবতা ও আঁটোসাঁটো গঠনপ্রবণতা অতঃপর অন্তর্বাস্তবতা ও শিথিলতার আঙ্গিককে আয়ত্ত ও আত্মস্থ করেছে।

॥ ৭ ॥

শরৎচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের রূপরীতি তার অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণামের পথে ধাবিত হলো। রবীন্দ্রনাথ চরিত্রবিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিলেও, তাঁর নায়ককে সাধারণতঃ নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চাননি। অবশ্য এ মনোভাব তাঁর যুগ ও ব্যক্তিত্বের মধ্যেই নিহিত ছিল। একদিকে বাংলার নবজাগরণ ও মানুষের নানামুখী ক্রিয়াকাণ্ডের অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে ভিক্টোরীয় যুগের সক্রিয়তা,—দুইয়ে মিলে তাঁর চেতনায় কখনোই নিষ্ক্রিয়তার অবসাদ আনতে পারেনি। তাই বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় যখন মানুষের বিশ্বাসভূমিটি প্রকম্পিত ও ভঙ্গুর হ'তে শুরু করলো, তখনও তিনি মোটামুটিভাবে গতিশীল, কর্মচঞ্চল ও সক্রিয়তার কথা তাঁর রচনায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পরবর্তী সাহিত্যিকেরা, যাঁরা একই সঙ্গে রেনেসাঁস ও ভিকটোরীয় যুগ—উভয়ের প্রসাদ থেকেই বঞ্চিত হয়েছিল, তাদের কাছে জীবন যেন ক্রমশ বর্ণহীন, নিস্তেজ ও বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হলো। চলমান জীবনঘটনার দর্শকসত্তাই তাই তাঁদের রচনার মধ্যে বারবার নতুনজীবনদর্শন রীতিরূপে গৃহীত হলো। ঔদাসীন্য, ভবঘুরেবৃত্তি, আনন্দবেদনার পৃথক প্রেক্ষিতেও ভাবাভিব্যক্তিহীনতা যেন এই পর্বের ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে সমাচ্ছন্ন করে ফেললো। পরিবেশের সঙ্গে বন্ধনহীন, পরিণাম সম্বন্ধে লক্ষ্যহীন, জীবনবৃত্তিতে অনিকেত এই পর্বের নায়কদের বিশিষ্টতা তাই একালের আঙ্গিককেও গভীরভাবে প্রভাবিত করলো। বঙ্কিমচন্দ্রের কেন্দ্রনিবদ্ধ কল্পনা নায়ককে বিন্দু করে যে ঘটনাবৃত্তের পরিধি পরিকল্পনা করেছিল, একালে তা থেকে ঔপন্যাসিকেরা স্খলিত হয়ে গেলেন। পূর্ববর্তী কালে বিচিত্র ঘটনা পরম্পরাকে একের কেন্দ্রবিন্দুতে নিবদ্ধ করে রাখার রীতি ছিল; একালে একের দর্পণে বিচিত্রকে ধরবার চেষ্টাই প্রাধান্য পেল। তাই পূর্ববর্তী ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক যেখানে সর্বোপরি একটি ঐক্যবদ্ধ ঘটনাবৃত্ত গড়ে তুলতে প্রযত্নবান হতেন, এযুগে তার বদলে

টুকরো-টুকরো ঘটনার বৈচিত্র্যেই সমগ্র জীবনটিকে ধরার চেষ্টায় ঘটনাবৃত্ত স্বতই কেন্দ্রবিচ্যুত হয়ে আঙ্গিকে শিথিলতার সৃষ্টি করেছে। এই শ্রেণীর উপন্যাসে ক্রনিকল বা ঘটনাপঞ্জী-রচনাধর্মিতা রীতিটিই যেন বেশী পরিমাণে গৃহীত হয়েছে। ফলে, এখানে বিচিত্র দৃশ্য ও বিচিত্র মানবচরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও, তা অখণ্ড ঐক্যের কোন দৃঢ়বদ্ধ প্লট গড়ে তুলতে পারেনি। একটি চরিত্র, তার জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতার ধারাবাহিকতা, জীবনের চলার পথের বাঁকে বাঁকে বিচিত্র মানবচরিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও অভিজ্ঞতার পরিপুষ্টি, এই ধরণের উপন্যাসে রূপরীতির এক বিশিষ্টতার সৃষ্টি করেছে। শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' এই ধারার যাত্রারম্ভ হয়েছে।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়ক শ্রীকান্ত, তার বাল্যকাল থেকে যৌবনের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চেয়েছে। জীবন তার কাছে চলমান অভিজ্ঞতার এক ধারাবাহিকতায় চরিতার্থ হতে চেয়েছে। ইন্দ্রনাথ, অন্নদাদিদি, অভয়া, সুনন্দা, গহর, কমললতা, রাজলক্ষ্মী প্রভৃতি বিচিত্র চরিত্র তার এই ধারাবাহিক জীবনের পর্বে পর্বে তার জীবনাভিজ্ঞতার পুঁজিটিকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করেছে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, নৌকাযাত্রা, মাছচুরি, শ্মশানে একাকী রাত্রিযাপন, সমুদ্রযাত্রা ও সমুদ্রে ঝড়, দেশান্তরের সমাজ-পরিচয় ইত্যাদি নানা ঘটনা তার জীবনকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করেছে। মানবচরিত্র ও ঘটনা—এই দুইয়ের বৈচিত্র্যের মাঝখানে রয়েছে শ্রীকান্ত। এই চরিত্রগুলি, তাদের আচার-আচরণ, কিংবা বিচিত্র ঘটনাবলী, এরা কিন্তু কোন নিগূঢ় শৃঙ্খলায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠেনি বা একটি ও অপরটির মধ্যে কোন অনিবার্য পারম্পর্যও রক্ষিত হয়নি। এগুলি সবই বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেবলমাত্র সবগুলিই শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতার এক্তিয়ারভুক্ত বলেই একাধারে সন্নিবেশিত হয়েছে। গঠনরীতির এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেই সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে, "উপন্যাসের নিবিড় অবিচ্ছিন্ন ঐক্য ইহার নাই; ইহা কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ের বিচ্ছিন্ন পরিচ্ছেদের সমষ্টি।" (১২) গ্রন্থনরীতির এই শিথিলতার মূল কারণটি নিহিত রয়েছে নায়কচরিত্রের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। শ্রীকান্ত নিজেকে কখনো বলেছে ভবঘুরে, কখনো তার জীবন-পরিক্রমাকে উপমিত করেছে উপগ্রহের সঙ্গে, কখনো বা তার সামগ্রিক কার্যকলাপ ও জীবনভাবনার মধ্যে একটি অনির্দিষ্ট অনিয়মের স্বরূপই দেখতে পেয়েছে। সবমিলিয়ে সে যে জীবনরূপটিকে ব্যক্ত করেছে, তা উদাসীন ও অনাসক্ত, নিরুদ্যম ও চিন্তাপ্রবণ, নিষ্ক্রিয় ও দ্রষ্টাস্বভাবী। চরিত্রটির, যাকে

গ্রন্থের নায়করূপে গ্রহণ করা সমীচীন, তার স্বভাব ও কর্মের এই বিশিষ্টতাই উপন্যাসের আঙ্গিক রচনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং নিষ্ক্রিয় নায়কের হাত ধরে বাংলা উপন্যাসে শিথিলপ্লট উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটেছে।

উপন্যাসের প্লট-পরিকল্পনায় মূল কাহিনী ও শাখাকাহিনীগুলির একটি অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র থাকে। Causality বা কার্যকারণের এক নিগূঢ় ঐক্যসূত্রে একাধিক গল্পকাহিনী প্লটে সংগঠিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' প্রভৃতি উপন্যাসে গঠনরীতির এই দৃঢ়সংবদ্ধতা দেখা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' তার বিপুল ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে অসংখ্য উপ-ও শাখা কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে, কিন্তু একমাত্র শ্রীকান্তের অভিজ্ঞতায় তাদের সঞ্চয় ও একত্র অবস্থিতি ছাড়া ঐক্যের আর কোনো প্রমাণ বা পরিচিতি নেই। শ্রীকান্তও যেন সবকিছুর মধ্যেই আপন স্বভাবের অন্তর্নিহিত উদাসীনতায় নিরপেক্ষ থাকতে চেয়েছে ও বিচিত্র ঘটনারাজির দৃশ্যপর্যায়কে সে যেন দর্শকের দূরত্ব থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেমাত্র, তার সঙ্গে নিবিড় ও অঙ্গাঙ্গী সংযোগসূত্র রাখতে পারেনি বা রাখতে চায়নি। উপন্যাসের যে স্বাভাবিক বিবর্তনধারা দৃঢ়বদ্ধ প্লটের আঙ্গিক থেকে ক্রমশঃ শিথিল-প্লটের আঙ্গিকের দিকে প্রবাহিত হয়, অন্যান্য দেশের মতো বাংলা উপন্যাসেও সেই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। আর এই বিবর্তনের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে ঔপন্যাসিক-দৃষ্টি ও মনোযোগ যে ক্রমশঃ বহির্ঘটনার বাস্তবতা থেকে অন্তর্ঘটনার বাস্তবতার পথে পরিচালিত হয়, বাংলা উপন্যাসে তারও স্বাভাবিক পথরেখাটি সুচিহ্নিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু উপন্যাসের নায়ক। জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে সক্রিয় সম্পর্কস্থাপন উপন্যাসের গোড়ার যুগে গঠনরীতির মধ্যে একটি গভীর ঐক্য গড়ে তুলেছিল। বঙ্কিমের নায়ক এই স্বভাবের সঙ্গে ট্র্যাজেডি নাটকের বৈশিষ্ট্য অঙ্গীকৃত করে গঠনের চমকপ্রদ ঐক্য-সংগঠনে সক্ষম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ অন্তর্বিশ্লেষণে মনোযোগী হলেও, তাঁর নায়কেরাও আপেক্ষিক ভাবে পরিবেশ ও ঘটনার সঙ্গে সক্রিয় সংযোগে যুক্ত ছিল। তাই বিশ্লেষণের আধিক্য থাকলেও, উপন্যাসের খণ্ডাংশ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড বৈচিত্র্য, মোটামুটি একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ পেয়েছিল। শরৎচন্দ্রে এসে এই রীতি বদলে যায় এবং বাংলা উপন্যাসের গঠনরীতিতে শিথিলতা একটি অখণ্ড গল্প ঐক্যের বদলে খণ্ড খণ্ড গল্পের বৈচিত্র্য, উপন্যাসের নতুন আদর্শ ও রূপের প্রবর্তন করে। শরৎচন্দ্রীয় নায়কের অনিকেত উদ্দেশ্যহীনতাই যেন

প্রতীকিত হয়েছে এই ধরণের প্লট-সংগঠনে; যা আঁটোসাঁটো বাঁধনে নয়, শিথিল এলোমেলো ভঙ্গিতেই যুগের চরিত্রটিকে পুরোপুরি স্পর্শ ও আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

॥ ৮ ॥

শরৎচন্দ্রের হাতেই, তাঁর নির্দেশিত পথেই যে বাংলা উপন্যাস তার পরবর্তী যাত্রাপথটি খুঁজে পেয়েছিল,[১৩] তা একালের উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করলেই যথার্থতঃ উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে। শরৎচন্দ্র পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে একমাত্র তারাশঙ্করের একক ও নিঃসঙ্গ ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, বাকি সমগ্র উপন্যাসে শরৎচন্দ্রীয় রীতির আঙ্গিকভাবনার চিহ্নই চোখে পড়ে। কল্লোল যুগের মুখপাত্র লেখক অচিন্ত্যকুমার তাঁর 'বেদে' উপন্যাস রচনায় বিদেশী লেখক হামস্যুনের প্রভাবের কথা ঘোষণা করলেও, 'শ্রীকান্তে'র আদর্শই তাতে অধিক পরিমাণে পরিলক্ষ্য করা যায়। আহ্লাদী, আশমানী, মুক্তা, মৈত্রেয়ী, প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত নায়কের বাল্য কৈশোর ও যৌবনের অভিজ্ঞতার প্রসার শ্রীকান্তেরই সমধর্মী। এই রীতি প্রতিফলিত হয়েছে বিভূতিভূষণ বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়।

আরো একটি বিষয় অবশ্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশের দশকের জীবনাভিজ্ঞতা বাঙালী সাহিত্যিকদের ছোটগল্প লেখাতেই অধিক পরিমাণে প্রণোদিত করেছিল। অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র বা শৈলজানন্দ, এঁরা সকলেই ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অধিক সিদ্ধ হয়েছেন। জীবনকে দেখার ভঙ্গিটাই এযুগে বদলে গিয়েছিল। একটি অখণ্ড ধারাবাহিকতার চেয়ে জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের প্রতি একালের সাহিত্যিকেরা কৌতূহলী ছিলেন বেশী পরিমাণে। তাই শরৎচন্দ্রের রচনায় আঙ্গিকের যে রীতি, যে খণ্ড খণ্ড কাহিনীর বিচিত্র চিত্রময়তার বিন্যাসপ্রবণতা সূচিত হয়েছিল, তা একালের কথাসাহিত্যিকদের হাতে আরো পরিপূর্ণতা পেল। একালের কথাসাহিত্যিকেরা এই রীতিতে তাঁদের মানসপ্রবণতার উপযুক্ত প্রকাশক্ষেত্র খুঁজে পেলেন আর উপন্যাসের অখণ্ড ঐক্যবদ্ধতার বদলে ঘটলো খণ্ড খণ্ড গল্পাংশের একত্রীকরণ; জ্যামিতিক নিষ্ঠা নয়, চরিত্রসৃষ্টির বিশিষ্ট অভিমুখিতার ওপর নির্ভরশীল হয়েই এই পর্বের ঔপন্যাসিকেরা তাঁদের কাহিনীগ্রন্থনে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

বিভূতিভূষণের অপু 'পথের পাঁচালী'-'অপরাজিতে'র কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক। তার জন্মপূর্ব সময় থেকে শুরু করে, তার জন্ম, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্বের সূচনাপর্ব পর্যন্ত বিবৃত এই কাহিনীতে অসংখ্য গল্প-সম্ভার

পরিবেশিত হয়েছে। স্থান থেকে স্থানান্তরে এবং কাল থেকে কালান্তরে বিধৃত এই জীবনবৃত্তান্ত কোন অখণ্ড প্লটের নিটোলতা আমাদের উপহার দিতে পারেনি। কাহিনীর নায়ক অপু এই বিচিত্র ঘটনাপর্যায়ের কৌতূহলী ও বিস্মিত দর্শকমাত্র। এক একটি ঘটনা ও চরিত্রের সম্মুখীন হয়ে সে জীবনের এক একটি ঘাটে পা রেখেছে, আর এইভাবেই ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘট ভরে ভরে সে পৌঁছে গিয়েছে তার অপরাজিত জীবনরহস্যের সাগর মোহানায়। প্রকৃতির কাছে জীবনের পাঠ গ্রহণ করা এই চরিত্রটি আগুন্ত, তাই প্রকৃতির মতোই মুক্ত ও বাধাবন্ধহারা স্বভাবের পরিচয় দিয়ে গেছে। আঙ্গিকের মধ্যেও এই মুক্ত বাধাবন্ধহীন স্বভাব আঁটোসাঁটো গঠনের পরিবর্তে শিথিল-প্লটের উপস্থাপনা করেছে। লেখকের লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে এই অসংলগ্নতা গঠনরীতির মধ্যেও অসংলগ্নতা এনেছে। টলস্টয়ের 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচক যা বলেছেন, তাতেই এই ধরণের উপন্যাসের চরিতার্থতা সন্ধান করা চলে। অবশ্য একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, টলস্টয়ের রচনায় বিস্তার, গভীরতা ও ব্যাপ্তি বিভূতিভূষণের চেয়ে অনেক ব্যাপক। তিনি বলেছেন,

"Tolstoy describes only a few generations, but the emphasis of his imagination makes the endless cycle of generation unroll in our imagination ; and we see human life as birth, growth and decay, a process perpetually repeated. This then is the frame-work, ideal and actual, of the chronicle ; its frame-work of universality"[১৪]

ইন্দির ঠাকরুণের মৃত্যু, নিশ্চিন্দিপুরের জীবনের একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি, অপুর জন্ম, বাল্য ও কৈশোর, দুর্গা, হরিহর, সর্বজয়ার মৃত্যু, অপুর যৌবন, বিবাহ, অপর্ণার মৃত্যু ও কাজলের জন্ম, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাসঞ্চয়, কাজলের মধ্যে বালক-অপুর পুনঃপ্রকাশ, নিশ্চিন্দিপুরে প্রত্যাবর্তন, নিরুদ্দেশ-যাত্রা—'the cycle of birth and growth, death and birth again',— মানবজীবনের এই ধারাবাহিক ইতিহাসই পরিবেশিত হয়েছে, যেখানে নায়ক আপেক্ষিক ভাবে নিষ্ক্রিয় ও দ্রষ্টাস্বভাবী হওয়ায় অনিবার্যভাবেই তার গ্রন্থনে শিথিলতা দেখা দিয়েছে।

'পুতুলনাচের ইতিকথা'তেও নায়ক শশী ডাক্তারের স্বভাবে এই নিষ্ক্রিয়তা অধিক পরিমাণে দেখা গেছে। গাওদিয়া গ্রামের সীমিত ক্ষেত্রে জীবনের বিচিত্র রহস্য ও কৌতূহল তাকে বারবার বিচলিত ও চিন্তিত করেছে। অসংখ্য মানুষ তাদের বিচিত্র জীবন ও সমস্যার সে সম্মুখীন হয়েছে, কিন্তু আপন

স্বভাববৈশিষ্ট্যে সে তাদের সক্রিয় অংশীদারত্ব অর্জন করতে পারেনি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিন্দু ও নন্দ এবং মতি ও কুমুদের কাহিনী। বিচিত্র গল্পের বিচ্ছিন্ন চমৎকারিত্ব সৃজিত হলেও, বৃত্তধর্মী উপন্যাসের সামগ্রিকতা ও সর্বাঙ্গীণতা এতে দেখা দেয়নি। এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করেই সমালোচক বলেছেন, "উপন্যাসের নায়ক শশীর জীবনে যে কয়েকটি সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, তাহাদের প্রভাব যেন অনেকটা অসংলগ্ন বলিয়াই মনে হয়। এই প্রভাবের ফলে তাহার মনে বিশেষ কোন ছাপ পড়ে নাই; রেখাগুলি বিচ্ছিন্নই রহিয়া গিয়াছে, ঐক্যে সংগত হয় নাই।"[১৫] এই অসংলগ্ন বিচ্ছিন্নতার মধ্যে কাহিনীর গ্রন্থনবৈশিষ্ট্য অনিবার্যভাবেই শিথিল হয়ে গেছে, আঙ্গিককে আর এক ধাপ অভিব্যক্তির পথে পরিচালিত করে দিয়েছে। যে বিশিষ্ট জীবনবোধ এখানে শশীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে, তাতে সামগ্রিক ও সর্বজনীন স্বভাবের বদলে স্থানিক ও সাময়িক অভিজ্ঞতাই অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। উপন্যাসের গঠনগত বিবর্তনের ধারায় যাকে 'পিরিয়ড নভেল' বলা হয়েছে, এতে যেন তারই সূচনা ধরা পড়েছে। এ ধরণের উপন্যাস সম্পর্কে বলা হয়েছে,

> "It does not try to show us human truth valid for all time, it is content with a society of a particular stage of transition, and characters which are only true in so far as they are representatives of that society"[১৬]

তিরিশের দশকে উপন্যাসের আঙ্গিকে এই লক্ষণীয় পরিবর্তনের সূচনা বিদেশী ঔপন্যাসিক, বিশেষতঃ মার্সেল প্রুস্ত ও জেমস জয়েসের রচনার প্রভাবে আরো অন্তরঙ্গ-বিশ্লেষণধর্মী ও চেতনাপ্রবাহী রীতি আয়ত্ত করে উপন্যাসের আঙ্গিককে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। গোপাল হালদারের 'একদা' একদিনের কাহিনী, ধূর্জটিপ্রসাদের 'অন্তঃশীলা'য় মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী খগেনবাবুর অন্তর্মানসের অন্তঃশীল স্বরূপসন্ধান। আঙ্গিকের এই বিচিত্র অভিব্যক্তি সর্বাপেক্ষা চরিতার্থতা খুঁজেছে বনফুলের রচনায়। তাঁর 'জঙ্গমে' শ্রীকান্তীয় রীতি গৃহীত হলেও, 'মৃগয়া'য় কবিতা-আখ্যান ও নাটকের সমাহারে উপন্যাস লেখার চেষ্টায় তা তার সম্ভাবনার অনন্ত দিগন্তরেখাটিকে উন্মোচিত করতে চেয়েছে।

তারাশঙ্কর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অনেকটাই ঐতিহ্যাশ্রয়ী। তাঁর রচনায় মহাকাব্যিক বিশালতা ও নাটকীয় ঐক্য নায়কের সংহত কেন্দ্রে গল্পগুলিকে দৃঢ়ভাবে সংগ্রন্থিত করেছে। শিবনাথের বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত জীবন তার মা, পিসীমা, মাস্টারমশাই, আনন্দমঠ, আঙ্কল টম্স কেবিন ও ফরাসী বিপ্লবের

ইতিহাস, সেবাকার্য, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ও গান্ধীজীর আদর্শ সমস্তই অচ্ছেদ্য সংলগ্নতায় শিবনাথকে আঁকড়ে থেকেছে। বলা যায়, শিবনাথ মুহূর্তের জন্যও পরিবেশ ও প্রতিবাসীদের থেকে নিজেকে নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যে দূরে সরিয়ে রাখেনি। তাই তার সদাজাগ্রত সহযোগ ও সক্রিয় কর্মচাঞ্চল্যে সে সবকটি ঘটনার কেন্দ্রবিন্দুরূপে কাহিনীবৃত্তের পরিধিকে সমদূরত্ব ও সমগুরুত্ব দিয়ে তার গঠনরূপটির অখণ্ড ঐক্যটিকে অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হয়েছে। তারাশঙ্করের এই ব্যতিক্রান্ত নায়কই বাংলা উপন্যাসের গঠনরীতির স্বাভাবিক ধারায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে উপন্যাসের নায়কের বিবর্তনধারা ও তার গঠনরীতির স্বাভাবিক বিকাশের পথরেখাটির নিয়মটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপ্রমাণিত করেছে।

উৎস-নির্দেশ ঃ—

১। Walter Allen—The English Novel.
২। ঐ
৩। E M. Forster—Aspects of the Novel.
৪। ঐ
৫। Edwin Muir—Structure of Novel.
৬। অন্নদাশংকর রায়—সত্যাসত্য—প্রত্যাহৃত ভূমিকা।
৭। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই-(২য়)
৮। Edwin Muir—Structure of Novel.
৯। ডঃ সুকুমার সেন—বা-সা-ই-(২য়)
১০। রবীন্দ্রনাথ—চোখেরবালি-সূচনা।
১১। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
১২। ঐ
১৩। ঐ
১৪। Edwin Muir—Structure of Novel.
১৫। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—ব-সা-উ-ধা।
১৬। Edwin Muir—Structure of Novel.

নির্ঘণ্ট